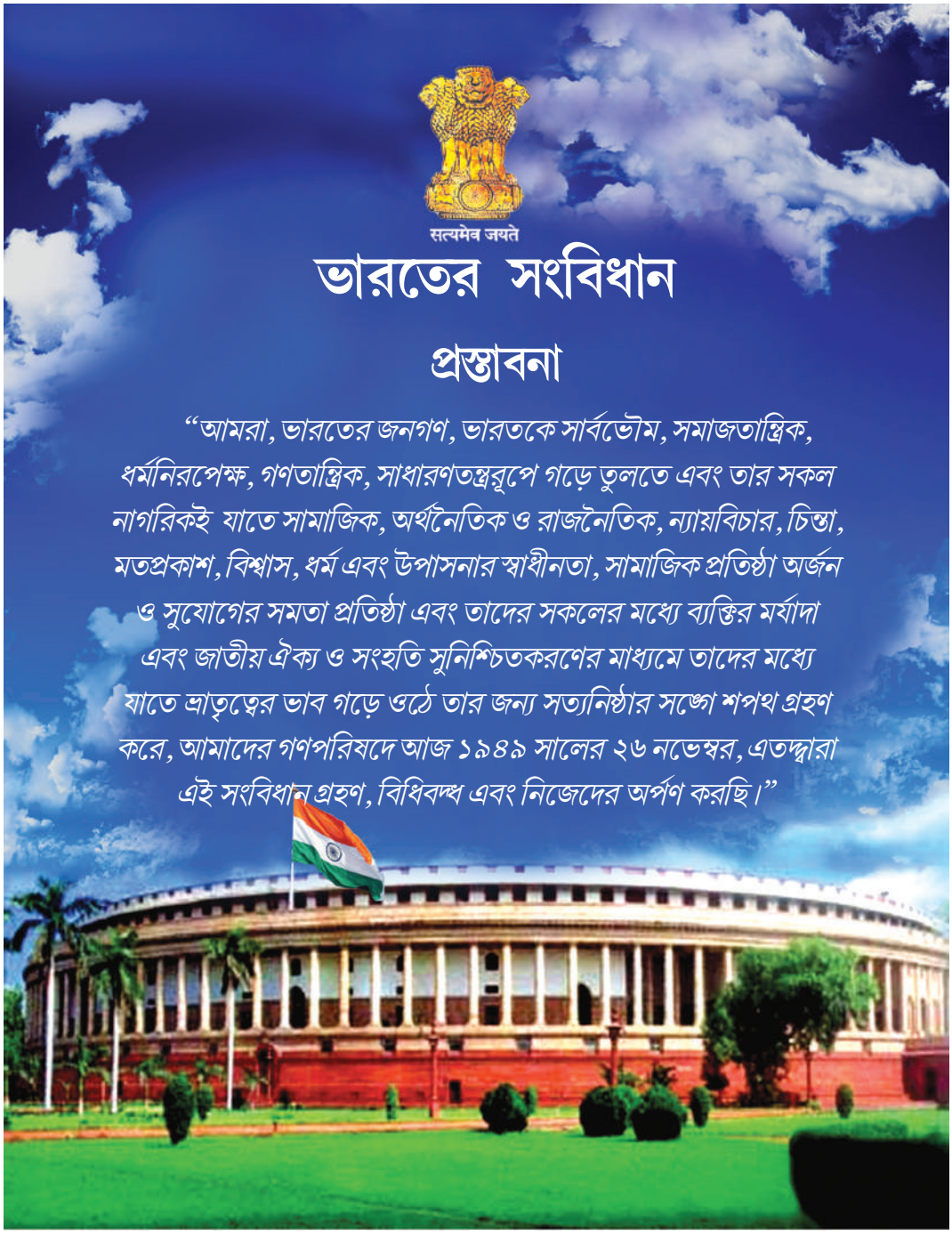

सत्यमेव जयते

ভারতের সংবিধান

প্রস্তাবনা

"আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গো শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

Constitution of India

Part IV A (Article 51 A)

Fundamental Duties

It shall be the duty of every citizen of India —

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

*** (k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.**

Note: The Article 51A containing Fundamental Duties was inserted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 (with effect from 3 January 1977).

**(k) was inserted by the Constitution (86th Amendment) Act, 2002 (with effect from 1 April 2010).Constitution of India.*

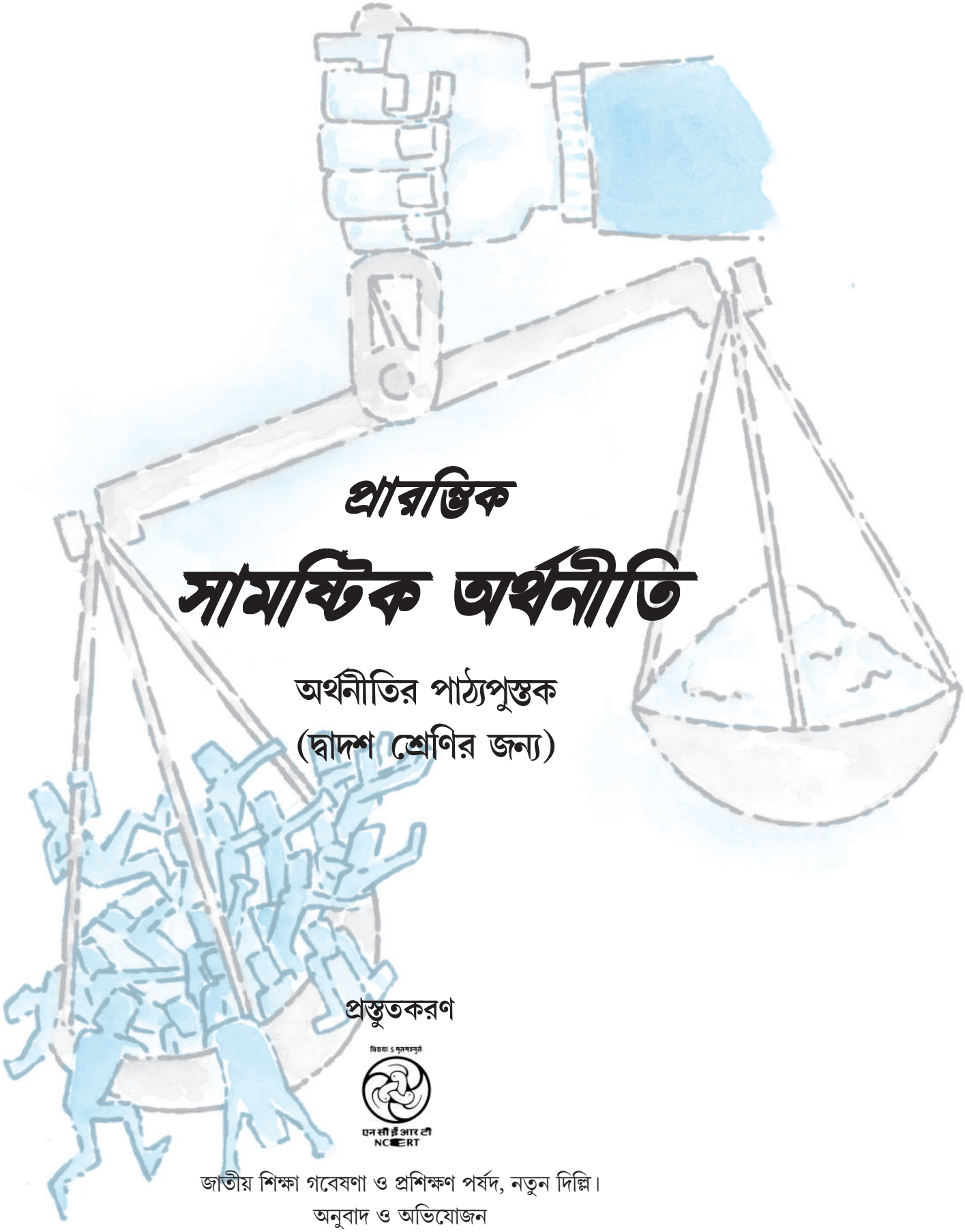

প্রারম্ভিক
সামষ্টিক অর্থনীতি

অর্থনীতির পাঠ্যপুস্তক
(দ্বাদশ শ্রেণির জন্য)

প্রস্তুতকরণ

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, নতুন দিল্লি।
অনুবাদ ও অভিযোজন
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা সরকার।

এন সি ই আর টি
অনুমোদিত
বাংলা সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ :
মার্চ, ২০২০

© এন সি ই আর টি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

অর্থনীতি
দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই
(এন সি ই আর টি-র ***Introductory Macroeconomics***
পাঠ্যবইয়ের ২০১৮ সালের অনূদিত সংস্করণ)

প্রকাশক : অধিকর্তা,
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা
ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা

মূল্য : ৭৫ টাকা

মুদ্রণ :
সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা-৭২

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস
প্রিয়াংকা দেবনাথ
রামু দেব
পরিতোষ মজুমদার

ভূমিকা

২০০৬ সাল থেকে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

রাজ্যের বিদ্যালয়স্তরে উন্নত ও সমৃদ্ধতর পাঠ্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের প্রচেষ্টায় প্রথম থেকে অষ্টম, নবম ও একাদশ শ্রেণির জন্য ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের (এন সি ই আর টি) পাঠ্যপুস্তকসমূহ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০১৯ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং এ বছর ওইসব পুস্তকগুলোর পুনর্মুদ্রণ করা হল। পাশাপাশি দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনার দায়িত্বও রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ পালন করে আসছে।

বিশাল এই কর্মকাণ্ডে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাবিদ, অনুবাদক, অনুলেখক, মুদ্রণকর্মী ও শিল্পীরা আমাদের সঙ্গে থেকে নিরলসভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করেছেন তাদের সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশিত এই পাঠ্যপুস্তকটির উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ও গুণীজনের মতামত ও পরামর্শ বিবেচিত হবে।

আগরতলা
মার্চ, ২০২০

উত্তম কুমার চাকমা
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা

উপদেষ্টা

ড. অর্ণব সেন, সহঅধ্যাপক, এন ই আর আই ই, শিলং

ড. অরূপ কুমার সাহা, সহঅধ্যাপক, আর আই ই, ভুবনেশ্বর

পাঠ্যপুস্তকটি যাঁরা অনুবাদ করেছেন :

ড. অভিজিৎ সরকার, সহ অধ্যাপক

ড. মনিদীপ রায়, সহ অধ্যাপক

শ্রী সঞ্জীব বণিক, সহ অধ্যাপক

শ্রী গৌতম রায় বর্মন, শিক্ষক

শ্রী রাকেশ ঘোষ, শিক্ষক

শ্রী শান্তনু প্রসাদ দাশ, শিক্ষক

ভাষা-পরিমার্জনায়

শ্রী গৌতম রুদ্র পাল

শ্রীমতি এমেলী নাগ

Foreword

The National Curriculum Framework (NFC) 2005, recommends that children's life at school must be linked to their life outside the school. This principle marks a departure from the legacy of bookish learning which continues to shape our system and causes a gap between the school, home and community. The syllabi and textbooks developed on the basis of NCF signify an attempt to implement this basic idea. They also attempt to discourage rote learning and the maintenance of sharp boundaries between different subject areas. We hope these measures will take us significantly further in the direction of a child-centred system of education outlined in the National Policy on Education (1986).

The success of this effort depends on the steps that school principals and teachers will take to encourage children to reflect on their own learning and to pursue imaginative activities and questions. We must recognise that, given space, time and freedom, children generate new knowledge by engaging with the information passed on to them by adults. Treating the prescribed textbook as the sole basis of examination is one of the key reasons why other resources and sites of learning are ignored. Inculcating creativity and initiative is possible if we perceive and treat children as participants in learning, not as receivers of a fixed body of knowledge.

These aims imply considerable change in school routines and mode of functioning. Flexibility in the daily time-tables is as necessary as rigour in implementing the annual calendar so that the required number of teaching days are actually devoted to teaching. The methods used for teaching and evaluation will also determine how effective this textbook proves for making children's life at school a happy experience, rather than a source of stress or problem. Syllabus designers have tried to address the problem of curricular burden by restructuring and reorienting knowledge at different stages with greater consideration for child psychology and the time available for teaching. The textbook attempts to enhance this endeavour by giving higher priority and space to opportunities for contemplation and wondering, discussion in small groups, and activities requiring hands-on experience.

The National Council of Educational Research and Training (NCERT) appreciates the hardwork done by the textbook development committee responsible for this textbook. We wish to thank the Chairperson of the advisory group in Social Sciences, Professor Hari Vasudevan, and the *Chief Advisor* for this textbook, Professor Tapas Majumdar, for guiding the work of this committee. Several teachers

contributed to the development of this textbook; we are grateful to their principals for making this possible. We are indebted to the institutions and organisations which have generously permitted us to draw upon their resources, material and personnel. We are especially grateful to the members of the National Monitoring Committee, appointed by the Department of Secondary and Higher Education, Ministry of Human Resource Development under the Chairpersonship of Professor Mrinal Miri and Professor G.P. Deshpande, for their valuable time and contribution. As an organisation committed to systemic reform and continuous improvement in the quality of its products, NCERT welcomes comments and suggestions which will enable us to undertake further revision and refinement.

Director
National Council of Educational
Research and Training

New Delhi
16 February 2007

Textbook Development Commitee

Chairperson, Advisory Committee For Social Science Textbooks at the Higher Secondary Level

Hari Vasudevan, *Professor,* Department of History, University of Calcutta, Kolkata

Chief Advisor

Tapas Majumdar, *Professor Emeritus of Economics,*
Jawaharlal Nehru University, New Delhi.

Advisor

Satish Jain, *Professor,* Centre for Economics Studies and Planning, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Members

Debarshi Das, *Lecturer,* Department of Economics, Punjab University, Chandigarh

Saumyajit Bhattacharya, *Senior Lecturer,* Department of Economics, Kirorimal College, University of Delhi, New Delhi

Sanmitra Ghosh, *Lecturer*, Department of Economics, Jadavpur University, Kolkata

Malbika Pal, *Senior Lecturer*, Department of Economics, Miranda House, University of Delhi, New Delhi

Member-Coordinator

Jaya Singh, *Lecturer,* Economics, Department of Education in Social Sciences, NCERT, New Delhi

Acknowledgement

The National Council of Educational Research and Training acknowledges the invaluable contribution of academicians and practising school teachers for bringing out this textbook. We are grateful to Subrato Guha, *Assistant Professor*, Jawaharlal Nehru University, for going through our manuscript and suggesting relevant changes. We thank Sunil Ashra, *Associate Professor*, Management Development Institute, Gurgaon, for his contribution. We also thank our colleagues Neeraja Rashmi, *Reader*, Curriculum Group; M.V. Srinivasan, Ashita Raveendran, Pratima Kumari, *Lecturers*, Department of Education in Social Sciences and Humanities, (DESSH), for their feedback and suggestions.

We would like to place on record the precious advise of (Late) Dipak Banerjee, *Professor* (Retd.), Presidency College, Kolkata. We could have benefited much more of his expertise had his health permitted.

The practising school teachers have helped in many ways. The council expresses its gratitude to S.K. Mishra, *PGT* (Economics), Kendriya Vidyalaya, Uttarkashi, Uttarakhand; Ambika Gulati, *Head*, Department of Economics, Sanskriti School; B.C. Thakur, *PGT* (Economics), Government Pratibha Vikas Vidyalaya, Surajmal Vihar; Ritu Gupta, *Principal*, Sneh International School, Rashmi Sharma, *PGT* (Economics), Kendriya Vidyalaya, JNU Campus, New Delhi.

We also thank Savita Sinha, *Professor* and *Head*, DESSH for her support.

Special thanks are due to Vandana R.Singh, *Consultant Editor,* for going through the manuscript.

The council gratefully acknowledges the contributions of Dinesh Kumar, *In-charge,* Computer Station; Amar Kumar Prusty, *Copy Editor,* in shaping this book. The contribution of the Publication Department in bringing out his book is duly acknowledged.

This textbook has been reviewed with the support of Archana Aggarwal, *Assistant Professor*, Hindu College; Malabika Pal, *Associate Professor*, Miranda House; Lokendra Kumawat, *Assistant Professor*, Ramjas College; T. M. Thomas, *Associate Professor*, Deshbandhu College, Delhi School of Arts and Commerce and Rashmi Sharma, *Assistant Professor*, (DCAC). Their contributions are duly acknowledged.

The council is also thankful to Tampakmayum Alan Mustofa, *JPF*; Farheen Fatima, and Amjad Husain, *DTP Operators*, in shaping this textbook.

সূচিপত্র

1. ভূমিকা 1

1.1 সামষ্টিক অর্থবিদ্যার উদ্ভব 5

1.2 সামষ্টিক অর্থনীতির বর্তমান বই প্রসঙ্গে 6

2. জাতীয় আয়ের হিসাব 9

2.1 সামাজিক অর্থনীতির কিছু মৌলিক ধারণা 9

2.2 আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ এবং জাতীয় আয় হিসাব করার পদ্ধতিসমূহ : 14

2.2.1 উৎপাদন বা মূল্য সংযোজন পদ্ধতি 17

2.2.2 ব্যয় পদ্ধতি 21

2.2.3 আয় পদ্ধতি 22

2.2.4 উপকরণ ব্যয়, মূল দাম এবং বাজার দাম 24

2.3 সামষ্টিক অর্থনীতির কিছু বিষয় 25

2.4 আর্থিক এবং প্রকৃত জিডিপি 29

2.5 জিডিপি এবং কল্যাণ 30

3. অর্থ এবং ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা 36

3.1 অর্থের কাজ 36

3.2 অর্থের চাহিদা এবং অর্থের জোগান 37

3.2.1 অর্থের চাহিদা 37

3.2.2 অর্থের যোগান 37

3.3 ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা কর্তৃক অর্থ সৃষ্টি 39

3.3.1 একটি কাল্পনিক ব্যাঙ্কের ব্যালেন্সশিট 40

3.3.2 ঋণ সৃষ্টির সীমা এবং অর্থগুণক 40

3.4 অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণকারী নীতিসমূহ 42

4. আয় ও নিয়োগ নির্ধারণ 53

4.1 সামগ্রিক চাহিদা ও তার উপাদানসমূহ 53

4.1.1 ভোগ 54

4.1.2 বিনিয়োগ 56

4.2 দুই ক্ষেত্রবিশিষ্ট মডেলে আয় নির্ধারণ 56
4.3 স্বল্পকালে ভারসাম্য আয় নির্ধারণ 57
4.3.1 স্থির দামস্তরে সামষ্টিক ভারসাম্য 57
4.3.2 আয় এবং উৎপাদনের উপর সামগ্রিক চাহিদার স্বয়ম্ভূত পরিবর্তনের প্রভাব 60
4.3.3 গুণক প্রক্রিয়া 61
4.4 আরো কিছু ধারণা 64

5. সরকারি বাজেট এবং অর্থব্যবস্থা 66

5.1 সরকারি বাজেট — রূপরেখা এবং এর প্রকারভেদ 66
5.1.1 সরকারি বাজেটের লক্ষ্য 67
5.1.2 আয়ের শ্রেণিবিভাগ 68
5.1.3 ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ 69
5.2 ভারসাম্যযুক্ত, উদ্বৃত্ত এবং ঘাটতি বাজেট 70
5.2.1 সরকারি ঘাটতির পরিমাপ 71

6. মুক্ত অর্থব্যবস্থা সমষ্টিগত অর্থনীতি 85

6.1 লেনদেন উদ্বৃত্ত 86
6.1.1 চলতি খাত 86
6.1.2 মূলধনী খাত 88
6.1.3 লেনদেন ব্যালেন্সে ঘাটতি ও উদ্বৃত্ত 88
6.2 বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বাজার 91
6.2.1 বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার 91
6.2.2 বিনিময় হার নির্ধারণ 92
6.2.3 নমনীয় এবং স্থির মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থার সুফল ও কুফল 95
6.2.4 নিয়ন্ত্রণাধীন পরিবর্তনীয় ব্যবস্থা 95

শব্দকোষ 105

অধ্যায় 1

ভূমিকা

ব্যষ্টিক অর্থনীতির প্রাথমিক বিষয়গুলোর সাথে ইতোমধ্যেই তোমাদের পরিচিতি ঘটেছে। সামষ্টিক অর্থনীতির সাথে ব্যষ্টিক অর্থনীতির পার্থক্যগুলো, যা তোমরা কম বেশি জেনেছো, সহজভাবে উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে এই অধ্যায়ের শুরু করা হয়েছে।

তোমাদের মধ্যে যারা পরবর্তী সময়ে উচ্চশিক্ষায় অর্থনীতি নিয়ে আরো পড়াশোনা করে বিশেষজ্ঞ হতে চাও তারা আজকালকার অর্থনীতিবিদরা সামষ্টিক অর্থবিদ্যার যে জটিল বিশ্লেষণগুলো ব্যবহার করছেন, সেগুলো সম্পর্কে জানতে পারবে। একটি দেশের নিয়োগের অবস্থার কী সার্বিকভাবে উন্নতি হচ্ছে অথবা অর্থনীতির কয়েকটি ক্ষেত্রে উন্নতি হচ্ছে অথবা অবনতি ঘটছে? একটি অর্থব্যবস্থার ভালো বা মন্দ অবস্থার নির্ণায়ক যুক্তিসঙ্গত সূচক সমূহ কোন্‌গুলো হবে? এগুলো হল বিভিন্ন প্রশ্নাবলি যেগুলো আমাদের সামগ্রিকভাবে একটি অর্থব্যবস্থার স্বাস্থ্য সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে শেখায়। এই সকল প্রশ্নগুলোর বিহিত করা হয় সামষ্টিক অর্থনীতির বিভিন্ন স্তরে।

এই বইয়ে তুমি সামষ্টিক অর্থনীতির পর্যালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি প্রাথমিক নীতির সাথে পরিচিত হবে। যতটা সম্ভব সরল ভাষায় এই নীতিগুলোর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জটিল বিষয়ের সাথে পাঠকের পরিচয় ঘটাতে বুনিয়াদী বীজগণিতের ব্যবহার করা হয়েছে।

যদি আমরা সামগ্রিকভাবে একটি দেশের অর্থনীতি পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখতে পাবো যে, অর্থনীতির সকল দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন স্তর সমবেতভাবে পরিবর্তিত হওয়ার স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যদি খাদ্যশস্যের উৎপাদনের বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় তাহলে সাধারণত একইসাথে শিল্পজাত দ্রব্যসমূহের বিভিন্ন বিভাগগুলোতেও অনুরূপভাবে বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদনের উত্থান বা পতনের ঘটনাও ঘটতে দেখা যায়। আমরা এটিও লক্ষ করি যে, বিভিন্ন উৎপাদনের এককে নিয়োগের স্তরের বৃদ্ধি অথবা হ্রাসের ঘটনাও একসাথে ঘটে।

একটি অর্থনীতির বিভিন্ন উৎপাদনের এককগুলোতে যদি সামগ্রিক বা সম্মিলিত উৎপাদন স্তর, দামস্তর অথবা নিয়োগের স্তরের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে তাহলে সম্পূর্ণ অর্থনীতির বিশ্লেষণের কাজটা তুলনামূলকভাবে সহজ হয়। উপরে উল্লিখিত চলকগুলোকে নিয়ে আলোচনাকালে আমরা যদি আলাদা আলাদা (অসমষ্টিগতভাবে) করে আলোচনা করতাম তাহলে আমাদের অর্থনীতির মধ্যে উৎপাদিত সকল দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাসমূহের প্রতিনিধিস্বরূপ

একটি দ্রব্যকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হত। এই প্রতিনিধিত্বকারী দ্রব্যটির উৎপাদনের একটি স্তর থাকবে যা সকল দ্রব্য ও সেবার উৎপাদনের স্তরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। একইভাবে, প্রতিনিধিত্বকারী দ্রব্যটির দাম ও নিয়োগের স্তর থেকে অর্থনীতির সাধারণ দাম ও নিয়োগ স্তরের চিত্র পাওয়া যাবে।

কেবলমাত্র একটি কাল্পনিক দ্রব্যের উপর আলোকপাত করে এবং দ্রব্যটির ক্ষেত্রে কি ঘটছে তার প্রেক্ষাপটে সাধারণত সামষ্টিক অর্থনীতির বিশ্লেষণ করা হয়। এক্ষেত্রে দেখা হয়, কীভাবে বৈশিষ্ট্য সমূহের (যাদের 'চলক' বলা হয়) যেমন দাম, সুদের হার, মজুরির হার, মুনাফার সাথে দেশের মোট উৎপাদন স্তর এবং কর্মসংস্থানের স্তর সম্পর্ক-বদ্ধ হয়। এই ধরনের সরলীকরণের প্রচেষ্টার ফলে আমরা অনেক বাস্তব পণ্যদ্রব্যের বাজারের ক্রয় বিক্রয়ের সময়কার ঘটনাবলি অনুধাবন করা থেকে বিরত থাকি। এর কারণ হল, আমরা সাধারণভাবে একটি পণ্যের ক্ষেত্রে দাম, সুদ, মজুরি এবং মুনাফার ভিত্তিতে অন্যান্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে কি ঘটতে পারে তা অনুমান করে নিই। বিশেষভাবে, যখন এই বৈশিষ্ট্যসমূহের দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে, যেমন দাম, ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার সময় (যাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়) অথবা কর্মসংস্থান এবং উৎপাদনের স্তর নীচে নেমে যাওয়ার সময় (মন্দার দিকে এগিয়ে চলছে) এই সকল চলকের গতির অভিমুখ প্রতিটি পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে এককভাবে যা হয় সামগ্রিক অর্থনীতির চলকদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা কম বেশি ঘটতে দেখা যায়।

আমরা নীচের আলোচনায় দেখতে পাবো যে, কখনো-কখনো আমরা কেন এই সরলীকৃত বিশ্লেষণ থেকে বিচ্যুত হয়ে সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতির বিশ্লেষণ করেছি। কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে অর্থনীতির দুইটি ক্ষেত্রের (উদাহরণস্বরূপ, কৃষি ও শিল্প) মধ্যেকার সম্পর্ক (অথবা এমনকি তাদের মধ্যে বৈরিতার সম্পর্ক রয়েছে) অথবা বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলোর (যেমন, পারিবারিক ক্ষেত্র, ব্যবসায়িক ক্ষেত্র এবং সরকার যা একটি গণতান্ত্রিক কাঠামোতে রয়েছে) মধ্যে সম্পর্ক আমাদেরকে অর্থনীতির বিভিন্ন ঘটনাগুলোকে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। যেখানে সমগ্র অর্থনীতিকে আলোচনায় টানলে বিষয়গুলো এতটা স্পষ্ট হয় না।

বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী থেকে দৃষ্টি সরিয়ে প্রতিনিধিত্বকারী দ্রব্যের উপর দৃষ্টিপাত করা সুবিধাজনক হতে পারে। এই প্রক্রিয়াতে, আমরা প্রত্যেকটি দ্রব্যের কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনের শর্তসমূহ ভিন্ন প্রকৃতির হয়। অথবা, যদি একটি বিভাগকে, যেমন শ্রমিককে সব ধরনের শ্রমিকের প্রতিনিধি হিসাবে বিচার করি তবে আমরা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার ও একাউন্টটেন্টের কাজের মধ্যে প্রভেদ করতে পারব না। সুতরাং, অনেকক্ষেত্রে, দ্রব্যের একটি প্রতিনিধিত্বকারী বিভাগের পরিবর্তে (অথবা শ্রম, অথবা উৎপাদন প্রযুক্তি) আমরা অল্প পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য নিতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, অর্থব্যবস্থায় উৎপাদিত সমস্ত রকমের দ্রব্যের জন্য প্রতিনিধিরূপে তিনটি সাধারণ প্রকৃতির দ্রব্য নেওয়া যেতে পারে ' কৃষিজাত দ্রব্য, শিল্পজাত দ্রব্য এবং সেবাসমূহ। এই সমস্ত দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদন প্রযুক্তি থাকতে পারে এবং দামও বিভিন্ন হতে পারে। সামষ্টিক অর্থনীতি সবসময় এটি বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা করে, বিভিন্ন দ্রব্যের স্বতন্ত্র উৎপাদন স্তর, দাম এবং নিয়োগস্তর কীভাবে নির্ধারিত হয়।

এখানের এই আলোচনা থেকে এবং ব্যষ্টিক অর্থনীতি সম্পর্কে তোমার পূর্ব পাঠ থেকে, তুমি হয়তো বুঝতে শুরু করেছ কীভাবে সামষ্টিক অর্থনীতি থেকে ব্যষ্টিক অর্থনীতি পৃথক হয়। সংক্ষেপে পুনরায় স্মরণ করলে দেখতে পাবে, ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে তুমি স্বতন্ত্র 'অর্থনৈতিক এজেন্ট' (নীচের বাক্স লক্ষ কর) নিয়ে আলোচনা করেছ এবং দেখবে যে, এই এজেন্টসমূহের কর্ম প্রণোদনের প্রকৃতির মাধ্যমে এইগুলো পরিচালিত হয়। এগুলো হল 'মাইক্রো' (যার অর্থ হল ক্ষুদ্র) এজেন্ট যেমন-ভোক্তারা চেষ্টা করে প্রদেয় আয় ও রুচির মধ্যে তাদের পছন্দের সর্বোচ্চ

দ্রব্যের সম্মিলিত ক্রয় করতে এবং উৎপাদকেরা চেষ্টা করে তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্য থেকে মুনাফা সর্বোচ্চ করতে। এক্ষেত্রে দ্রব্য উৎপাদনের খরচ যতটা সম্ভব কম রেখে বাজারের বিক্রয়মূল্য যতটা সম্ভব বাড়াতে চায় উৎপাদকেরা। অন্যভাবে বলা যায়, ব্যষ্টিক অর্থনীতি স্বতন্ত্র বাজারের চাহিদা ও যোগানের বিশ্লেষণ করে এবং এক্ষেত্রে 'আর্থিক ভূমিকা পালনকারী বা প্লেয়ারস' অথবা 'সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরাও' স্বতন্ত্র প্রকৃতির হয় (ক্রেতা অথবা বিক্রেতা এমনকি কোম্পানিসমূহও) যাদেরকে দেখা যায় মুনাফা সর্বোচ্চ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে (উৎপাদকরূপে বা বিক্রেতারূপে) এবং নিজস্ব তৃপ্তি বা কল্যাণের স্তরে (ভোক্তা হিসেবে) পৌঁছতে চাইছে। এমনকি একটি বৃহৎ কোম্পানিও সেই অর্থে 'ব্যষ্টিক' যে তার নিজস্ব অংশীদারদের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য কাজ করে যেটা সামগ্রিকভাবে দেশের স্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত নাও হতে পারে। ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে সামষ্টিক বা ম্যাক্রো (যার অর্থ 'বৃহদ') ঘটনাসমূহ, যেগুলো সমগ্র অর্থনীতির উপর প্রভাব ফেলে, যেমন মুদ্রাস্ফীতি অথবা বেকারত্ব, এগুলোর হয়তো উল্লেখ করা হয় না। অথবা ধরে নেওয়া হয় এগুলো অপরিবর্তিত রয়েছে। এই বিষয়গুলো চলক নয়, যা স্বতন্ত্র ক্রেতা বা বিক্রেতা পরিবর্তন করতে পারে। ব্যষ্টিক অর্থনীতি ও সামষ্টিক অর্থনীতির নৈকট্য তখন দেখা যায় যখন অর্থব্যবস্থায় প্রত্যেক বাজারে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য থাকে অর্থাৎ অর্থব্যবস্থায় সাধারণ ভারসাম্য পরিলক্ষিত হয়।

আর্থিক এজেন্ট

আর্থিক ইউনিট বা আর্থিক এজেন্ট বলতে আমরা বুঝি, ওই সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যারা আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। এই এজেন্ট সমূহের মধ্যে ভোক্তাও থাকতে পারে যে সিদ্ধান্ত নেবে, কি এবং কতটা ভোগ করা হবে। তারা দ্রব্য ও সেবার উৎপাদকও হতে পারে, তারা সিদ্ধান্ত নেবে কি এবং কতটা পরিমাণ উৎপাদন করা হবে। এই এজেন্ট সমূহের মধ্যে সরকার, কর্পোরেশন, ব্যাঙ্কের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোও থাকতে পারে যারা বিভিন্ন আর্থিক সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করে যেমন কতটা অর্থ ব্যয় করা হবে, ঋণে কতটা সুদের হার নির্ধারণ করা হবে, কতটা কর আরোপ করা হবে ইত্যাদি।

সামগ্রিকভাবে অর্থনীতি যে সকল পরিস্থিতি সমূহের সম্মুখীন হয় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করে। **অ্যাডাম স্মিথ,** আধুনিক অর্থনীতির জনক, এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, যদি প্রত্যেক বাজারের ক্রেতা এবং বিক্রেতারা কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে অর্থনীতিবিদদের আলাদাভাবে দেশের সার্বিক সম্পদ ও কল্যাণ সাধনে চিন্তাভাবনার প্রয়োজন হত না। কিন্তু অর্থনীতিবিদরা ক্রমান্বয়ে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে যে, তারা আরো অগ্রসর দৃষ্টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন।

অর্থনীতিবিদরা প্রথমে দেখতে পেয়েছেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে, বাজারের অস্তিত্ব ছিল না কিংবা অস্তিত্বের উপস্থিতি সম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য ক্ষেত্রে, বাজারের অস্তিত্ব রয়েছে তা সত্ত্বেও চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য স্থাপনে বাজার ব্যর্থ হয়। তৃতীয়ত এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল, বিরাট সংখ্যক অবস্থাতে সমাজ (বা রাষ্ট্র, অথবা জনগণ, সম্পূর্ণরূপে) কিছু গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক লক্ষ্য নির্ধারণ করে স্বার্থপরহীনভাবে (যেমন নিয়োগ, প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে) যার জন্য আর্থিক এজেন্ট সমূহের কিছু সিদ্ধান্তের কারণে ব্যষ্টিক অর্থনীতির কিছু সিদ্ধান্তের সম্মিলিত প্রক্রিয়ার ফলাফলের সংশোধন করতে হয়। এই উদ্দেশ্যে সামষ্টিক অর্থনীতিবিদদের বাজারে কর আরোপের প্রভাব এবং অন্যান্য বাজেট সংক্রান্ত নীতি, অর্থের যোগানের পরিবর্তনের নীতি, সুদের হার, মজুরি, নিয়োগ এবং উৎপাদন বিষয় সম্পর্কিত বাজারের প্রতিক্রিয়া অধ্যয়ন করতে হয়। বস্তুত,

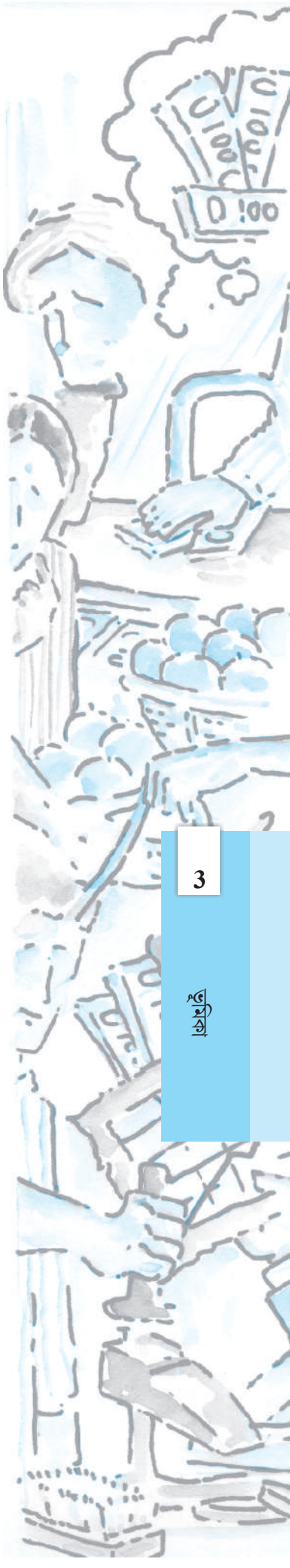

এডাম স্মিথ

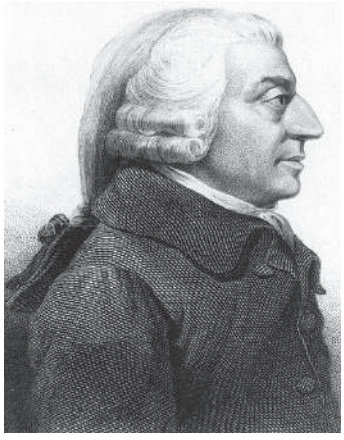

এডাম স্মিথকে অর্থনীতির জনক হিসাবে গণ্য করা হয় (ওই সময়ে বিষয়টি রাজনৈতিক অর্থনীতি হিসাবে পরিচিত ছিল)। তিনি ছিলেন স্কটল্যান্ডের বাসিন্দা ও গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি প্রথাগতভাবে দার্শনিক ছিলেন। তার যুগান্তকারী কাজটি হল — *An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776) যাকে এই বিষয়ের উপর প্রথম সুসংহত পুস্তক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বইটির একটি অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'কসাই, সুরা-প্রস্তুতকারী এবং রুটি প্রস্তুতকারীর দয়ালুতার উপর আমাদের নৈশ আহারের আশা আমরা করি না। বরং তাদের নিজ স্বার্থেই আমাদের নৈশ আহার আমরা আশা করি। তাদের মানবতার প্রতি আবেদন থাকে না বরং আমাদের আবেদন থাকে তাদের আত্মপ্রেমের প্রতি। আমরা তাদের কাছে আমাদের প্রয়োজনীয়তার কথা বলি না বরং তাদের সুবিধার কথা বলি।' স্মিথের এই বক্তব্যকে মুক্ত বাজার অর্থনীতির স্বপক্ষে সওয়াল হিসেবে প্রায়ই উল্লেখ করা হয়। স্মিথের পূর্বে ফ্রান্সের ফিজিওক্রেটিসরা রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রধান চিন্তক ছিলেন।

সামষ্টিক অর্থনীতির গভীরে ব্যষ্টিক অর্থনীতির শেকড় ছড়িয়ে রয়েছে। কারণ সামষ্টিক অর্থনীতিতে বাজারগুলোর চাহিদা ও যোগান শক্তির সম্মিলিত প্রভাবসমূহ অনুধাবন করা হয়। যদিও, অতিরিক্ত হিসেবে, সামষ্টিক অর্থনীতি সেই সকল নীতিসমূহ নিয়ে আলোচনা করে যেগুলো এই শক্তিসমূহকে সংশোধন করার লক্ষ্যে কাজ করে যা বাজারের বাইরের সামাজিক পছন্দগুলোকে অনুসরণ করে। ভারতের মতো উন্নয়ণশীল দেশে বেকারত্ব দূর করতে কিংবা বেকারত্ব হ্রাস করতে, সমস্ত নাগরিকের জন্য শিক্ষা এবং উন্নত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ বাড়াতে, সুশাসন প্রদান করতে দেশের জন্য পর্যাপ্ত প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে এবং এই জাতীয় আরো অনেক বিষয়ে এধরনের পছন্দকে অনুসরণ করতে হয়। সামষ্টিক অর্থনীতিতে দুইটি সরল বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলো উপরের উল্লেখিত অবস্থাগুলোকে সহজভাবে বিহিত করতে পারে। নীচে এই বিষয়গুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

প্রথমত, সামষ্টিক অর্থবিদ্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী (বা নির্ণয়কারী) কারা? সামষ্টিক অর্থবিদ্যার নীতিগুলো রাষ্ট্র স্বয়ং রূপায়ণ করে অথবা বিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহ যেমন ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (RBI), ভারতীয় সিকিওরিটি এবং বিনিময় বোর্ড (SEBI) এবং এই ধরনের অন্যান্য সংস্থাসমূহ কার্যকর করে। বৈশিষ্ট্যসূচকভাবে, এই ধরনের প্রত্যেকটি সংস্থার একটি বা একাধিক সামজিক লক্ষ্য থাকে এবং লক্ষ্য পূরণের কাজ আইনের নির্ধারিত চৌহদ্দিতে অথবা ভারতীয় সংবিধান মেনে করা হয়। এই লক্ষ্যগুলো ব্যক্তিগত আর্থিক এজেন্টের লক্ষ্য নয় যারা ব্যক্তিগত লাভালাভ অথবা কল্যাণ সর্বোচ্চায়ণ করতে চায়। এই কারণে, সামষ্টিক অর্থবিদ্যার এজেন্টরা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নির্ণয়কারী থেকে ভিন্ন হয়।

দ্বিতীয়ত, সামষ্টিক অর্থবিদ্যার সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারীরা কী করতে সচেষ্ট হয়? স্পষ্টতই, তাদেরকে প্রায়শই অর্থনৈতিক লক্ষ্যকে ছাপিয়ে যেতে হয় এবং জনগণের প্রয়োজনে অর্থনৈতিক সম্পদকে সরাসরি নিয়োজিত করতে হয় যা উপরের সূচীতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই কাজকর্মগুলো স্বতন্ত্র ব্যক্তি-স্বার্থ পূরণের লক্ষ্যে পরিচালিত হয় না। এইগুলোর রূপায়ণে সার্বিকভাবে দেশ ও জনগণের কল্যাণ সাধিত হয়।

1.1 সামষ্টিক অর্থবিদ্যার উদ্ভব

ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ **জন মেনিয়ার্ড কেইন্সের** প্রসিদ্ধ বই দ্যা জেনারেল থিওরি, অফ এমপ্লয়মেন্ট, ইন্টারেস্ট এন্ড মানি, 1936 সালে প্রকাশিত হওয়ার পর অর্থবিদ্যার পৃথক শাখা হিসাবে সামষ্টিক অর্থবিদ্যার উদ্ভব হয়। কেইন্সের পূর্বে অর্থবিদ্যায় যে চিন্তাধারা প্রাধান্য পেত তা হল, সমস্ত শ্রমিকেরা যারা কাজ করতে প্রস্তুত, তারা কাজ খোঁজে পাবে এবং উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলোতে পূর্ণ ক্ষমতায় উৎপাদনের অবস্থা বিরাজ করবে। এই চিন্তাধারায় অনুসারীরা ধ্রুপদি ঘরনার অর্থনীতিবিদ বলে পরিচিত হত।

জন মেনিয়ার্ড কেইন্স

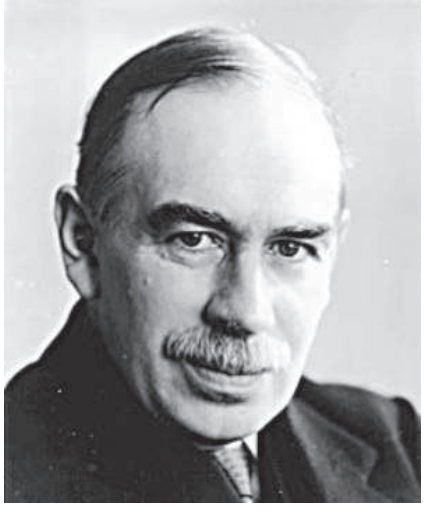

ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জন মেনিয়ার্ড কেইন্স 1883 সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কিঙ্গাস কলেজ, কেম্ব্রিজে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে কেম্ব্রিজের ডিন হিসাবে নিযুক্ত হন। অর্থনীতিতে তাঁর প্রখর বুদ্ধিমত্তা ছাড়াও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে কুটনীতিবিদ হিসেবেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থ 'ইকোনমিক কন্সিকোয়েন্স অফ দ্যা পীস' (1919)-এ, তিনি যুদ্ধে শান্তি চুক্তি ভেস্তে যাবার ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। তাঁর বই "জেনারেল থিওরি অফ এমপ্লয়মেন্ট, ইন্টারেস্ট এন্ড মানি' (1936), হল বিংশ শতাব্দীর লেখা অর্থনীতির উপর একটি যুগান্তকারী বই। তিনি বৈদেশিক মুদ্রার ফাটকা কারবারে দূরকল্পনায় পারদর্শী ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, 1929 সালের **মহামন্দা** এবং পরবর্তী বছরগুলোতে ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার দেশগুলোতে উৎপাদন এবং নিয়োগস্তরের মারাত্মক অবনমন হয়েছিল। এর প্রভাব বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর উপরও পড়েছিল। বাজারে দ্রব্যের চাহিদা কমে যাওয়ায় বহু কারখানায় উৎপাদন মুখ থুবড়ে পড়েছিল। শ্রমিকরা কাজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, 1929 থেকে 1933 সালে **বেকারত্বের হার** 3 শতাংশ থেকে বেড়ে পৌঁছায় 25 শতাংশে (বেকারত্বের হার হল, কাজ করছে না এবং কাজের সন্ধান করে চলছে এমন লোকজনের সংখ্যাকে কর্মরত লোকসংখ্যা ও কর্মের সন্ধানকারীদের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে পাওয়া ভাগফল।) একই সময়ে ইউ এস এ তে সামগ্রিক উৎপাদন 33 শতাংশ হ্রাস পায়। এই ঘটনা প্রবাহগুলো অর্থনীতিবিদদের অর্থব্যবস্থার কার্যপ্রণালী দিয়ে নতুনভাবে ভাবনাচিন্তা করতে শেখায়। আসল কথা হল, অর্থনীতিতে অনেক সময় দীর্ঘস্থায়ী বেকারত্ব বিরাজ করতে পারে যাদের তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সে দিশায় কেইন্সের সেই বিখ্যাত বইয়ের বক্তব্য তাঁর পূর্ববর্তী অর্থনীতিবিদদের চিন্তাধারার সাথে সাজুয্য ছিল না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে অর্থনীতির কাজকর্মকে সামগ্রিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে এবং অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে বিশ্লেষণ করতে হবে। কেইন্সের এই চিন্তাধারা থেকে সামষ্টিক অর্থনীতির চিন্তাধারার সৌধ গড়ে উঠে।

1.2 সামষ্টিক অর্থনীতির বর্তমান বই প্রসঙ্গে

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, বিষয়টির অধ্যয়নের নেপথ্যে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। আমরা এই বইটিতে, ধনতান্ত্রিক দেশের অর্থব্যবস্থার কার্যপ্রণালী পরীক্ষা করব। একটি ধনতান্ত্রিক দেশের উৎপাদন কর্মকাণ্ড মূলত পুঁজিপতি উদ্যোগীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। কোনো আদর্শ পুঁজিপতি উদ্যোগে এক বা একাধিক সংগঠক থাকে (সংগঠক হল সে সকল ব্যক্তি যারা উৎপাদন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং উৎপাদন প্রতিষ্ঠান/উদ্যোগের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকি বহন করে)। তারা উদ্যোগ কার্য সচল রাখতে নিজেরাই প্রয়োজনীয় পুঁজি জোগায় অথবা তারা মূলধন ধার করতে পারে। উৎপাদন কার্য সম্পাদন করতে তাদের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রয়োজন হয় — প্রাকৃতিক সম্পদ হল উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত একটি উপকরণ (উদাহরণস্বরূপ, কাঁচামাল) এবং কিছু স্থায়ী সম্পদ (যেমন একখণ্ড জমি)। এছাড়াও উদ্যোক্তাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, মানবশ্রম, উৎপাদন কার্য চালানোর জন্য প্রয়োজন হয়। একে শ্রমিক হিসেবে উল্লেখ করা হয়। উৎপাদনের তিনটি উপকরণের (যথা মূলধন, জমি এবং শ্রমিক) সাহায্যে যে দ্রব্য উৎপাদন করা হয় সেটা উদ্যোগী বাজারে বিক্রি করে। দ্রব্য বিক্রয় করে যে অর্থ উপার্জিত হয় তাকে রেভিনিউ বা আয় বলে। এই আয়ের একটি অংশ জমির খাজনা বাবদ প্রদান করা হয়, একটি অংশ মূলধনের সুদ বাবদ প্রদান করা হয় এবং একটি অংশ শ্রমিকের মজুরি হিসেবে প্রদান করা হয়। আয়ের অবশিষ্ট অংশই হল উদ্যোক্তার আয়, যাকে আমরা বলি মুনাফা। প্রায়শই উৎপাদকেরা ভবিষ্যতে নতুন যন্ত্রপাতি অথবা নতুন কারখানা গড়তে এই মুনাফা কাজে লাগায়। ফলশ্রুতিতে উৎপাদনের প্রসার ঘটে। এই ধরনের খরচ যা উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে তাকে **বিনিয়োগ ব্যয়** বলে।

সংক্ষেপে বলা যায়, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা হল সেই ধরনের অর্থব্যবস্থা যেখানে অধিকাংশ আর্থিক কাজকর্মে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যায় (a) উৎপাদনের উপকরণে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে (b) দ্রব্যসামগ্রী বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে উৎপাদিত হয় (c) যে দামে শ্রমের নিয়োগের ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাকে বলে মজুরি হার (মজুরির বিনিময়ে যে শ্রম বেচা-কেনা করা হয় তাকে **মজুরি শ্রম** বলে)।

যদি আমরা উপরে বর্ণিত চারটি বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর দেশগুলোর উপর প্রয়োগ করি তাহলে আমরা দেখব যে, বিগত তিনশত থেকে চারশত বছরের মধ্যে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর আবির্ভাব ঘটেছে। অধিকন্তু, আরো স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, এমনকি বর্তমানে উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার স্বল্প সংখ্যক দেশ ধনতান্ত্রিক দেশে উত্তীর্ণ হতে চলছে। অনেক অনুন্নত দেশে উৎপাদন (বিশেষত কৃষিতে) চাষি পরিবার বর্গের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। মজুরি শ্রমিক কদাচিত ব্যবহার করা হয় এবং পরিবারের সদস্যরা অধিকাংশ সময়ে, নিজেরাই শ্রমিকের কাজকর্ম করে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যেই উৎপাদন সংঘটিত হয় না। এর একটি বড়ো অংশ পরিবারের সদস্যরা ভোগ করে। এই কারণেই একই সাথে অনেক কৃষকের খামারে মূলধনের মজুতের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয় না। এমন অনেক উপজাতি সমাজ রয়েছে, যেখানে জমির ব্যক্তিগত মালিকানা নেই, সমস্ত সম্প্রদায় যৌথভাবে জমির মালিক। এই বইতে আলোচনার সময় এই সমস্ত সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্যগুলো প্রযোজ্য হবে না। যদিও এটি সত্য যে, অনেক উন্নয়নশীল দেশে উৎপাদন এককের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে যেগুলো ধনতান্ত্রিক নীতি অনুসারে সংগঠিত হয়েছে। এই বইয়ে উৎপাদন এককে ফার্ম বলা হয়েছে। কোনো ফার্মের উৎপাদন কার্য পরিচালনার দায়িত্ব উদ্যোক্তা (উদ্যোক্তাদের) হাতে ন্যস্ত থাকে। উদ্যোক্তা বাজার থেকে শ্রমিক নিয়োজিত করে, একইভাবে মূলধন এবং জমির সংস্থান করে। উৎপাদনের এই উপকরণগুলো ভাড়া করার পর উদ্যোক্তা উৎপাদনের কাজ হাতে নেয়। দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন (যাকে আউটপুট বা উৎপাদন বলে উল্লেখ করা হয়) করে সেগুলো বাজারে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করাই উদ্যোক্তার মূল উদ্দেশ্য। এই প্রক্রিয়াতে, সে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করে। উদাহরণস্বরূপ, সে যা উৎপাদন করে তা থেকে যথেষ্ট উচ্চ দাম সে নাও পেতে পারে। আর সেক্ষেত্রে তার মুনাফা কমে আসবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ধনতান্ত্রিক দেশে উৎপাদনের এককগুলো, উৎপাদন প্রক্রিয়া সংগঠিত করে এবং সেই দ্রব্য বাজারে বিক্রি করে আয় উপার্জন করে।

উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশেই, বেসরকারি পুঁজিবাদী ক্ষেত্র ছাড়াও আর একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। রাষ্ট্রের ভূমিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে — আইন প্রণয়ন, আইনের প্রয়োগ করা এবং ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা করা। অনেকক্ষেত্রে, রাষ্ট্র উৎপাদনের কার্য সম্পাদন করে, করারোপ ছাড়াও — সরকারি পরিকাঠামো নির্মাণে, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, পরিচালনা, স্বাস্থ্য পরিষেবা জোগাতে অর্থ ব্যয় করে। কোনো একটি দেশের অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমাদেরকে এই সকল আর্থিক কাজকর্মগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা রাষ্ট্র ও **'সরকার'** একই অর্থে ব্যবহার করব।

অর্থনীতিতে ফার্ম এবং সরকার ছাড়াও যে আরেকটি বড়ো ক্ষেত্র থাকে তাকে আমরা পারিবারিক ক্ষেত্র বলি। পরিবার বলতে আমরা বুঝি একজন ব্যক্তি, যে একা নিজের ভোগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কিংবা একদল ব্যক্তি, যাদের ভোগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত সম্মিলিতাবে ঠিক করা হয়। পরিবার সঞ্চয় করে এবং করও প্রদান করে। এইসব কাজকর্মের জন্য তারা কোথা থেকে অর্থ পায়? আমাদের মনে রাখতে হবে যে, পরিবার লোকজন নিয়ে গঠিত হয়। এই সকল লোকেরা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে এবং মজুরি উপার্জন করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার সরকারি দপ্তরে কাজ করে বেতন পায় অথবা তারা ফার্মের মালিক হয় এবং মুনাফা লাভ করে। বস্তুত, ফার্মগুলো তাদের উৎপাদন যে বাজারে বিক্রি করে, সেখানে যদি না পরিবারের চাহিদা বিরাজ করে, তবে বাজারের কাজকর্ম চলতে পারে না। এছাড়াও, তারা জমি ব্যবহার বাবদ খাজনা অথবা পুঁজি লগ্নী করে সুদ পেয়ে থাকে।

আমরা এ পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে মুখ্য খেলোয়াড়দের বিবরণ দিয়েছি। কিন্তু পৃথিবীর সব দেশই বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত থাকে। **বৈদেশিক ক্ষেত্রটি** হল আমাদের চর্চার চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। বৈদেশিক ক্ষেত্রে দুই ধরনের বাণিজ্য হতে পারে —

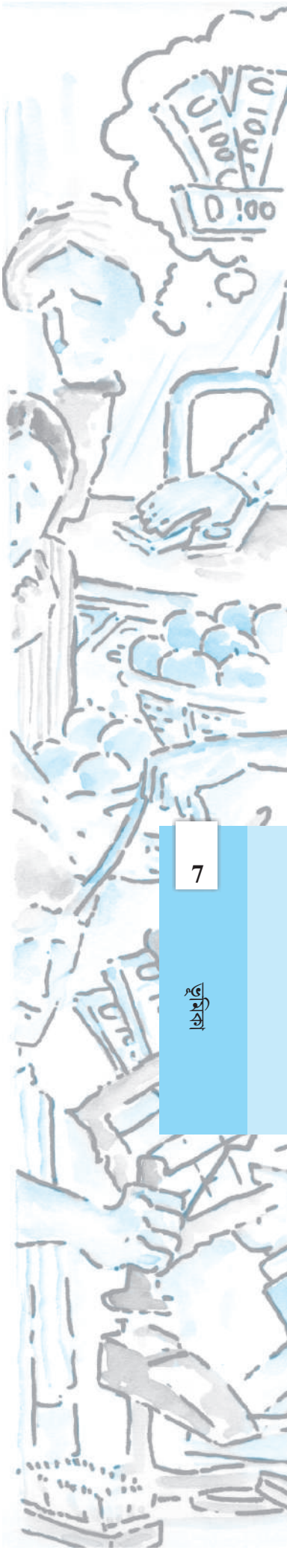

1. যখন কোনো দেশ তার অভ্যন্তরীণ দ্রব্য সামগ্রী বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিক্রি করে, তখন তাকে বলে **রপ্তানি**।
2. যখন কোনো দেশ বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে দ্রব্য ক্রয় করে, তখন তাকে বলে আমদানি। রপ্তানি ও আমদানি ছাড়াও অন্যান্য উপায়ে বিশ্বের বাদ বাকি দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে।
3. বিদেশী দেশগুলো থেকে দেশের অভ্যন্তরে পুঁজির প্রবেশ ঘটতে পারে। অথবা দেশ থেকে পুঁজির বহির্গমন ঘটতে পারে।

সারসংক্ষেপ

সামষ্টিক অর্থনীতিতে সমষ্টিগত চলকগুলো নিয়ে বিচার বিবেচনা করা হয়। এটি অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্কিত বিষয়গুলোকে চর্চার মধ্যে নিয়ে আসে। এই কারণে এটি ব্যষ্টিক অর্থনীতি থেকে ভিন্ন। ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রের কাজকর্ম পর্যালোচনা করে, অনুমান করা হয় যে বাদবাকি অর্থনীতি অপরিবর্তিত আছে। 1930 সালে কেইন্স-এর হাত ধরে পৃথক বিষয় হিসাবে সামষ্টিক অর্থনীতির উদ্ভব ঘটে। উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতির উপর মহামন্দার প্রবল ধাক্কা আছড়ে পড়েছিল যা কেইন্সকে কলম ধরতে অনুপ্রাণিত করেছিল। এই বইটিতে আমরা মূলত ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার কাজকর্ম সম্পর্কে জানতে পারব। সেই কারণেই, সম্ভবত, উন্নয়নশীল দেশের কার্যধারা সম্পূর্ণরূপে মেলে ধরা সম্ভব হয়নি। অর্থনীতির চারটি ক্ষেত্র যথা পরিবার, ফার্ম, সরকার এবং বৈদেশিক ক্ষেত্রের সমন্বয়ে সামষ্টিক অর্থনীতি গঠিত হয়।

মূল ধারণা

সুদের হার	মজুরির হার
মুনাফা	ইকোনমিক এজেন্ট বা এককসমূহ
মহামন্দা	বেকারত্বের হার
উৎপাদনের চারটি উপকরণ	উৎপাদনের উপায়সমূহ
উৎপাদনের উপাদান সমূহ	জমি
শ্রম	মূলধন
উদ্যোগপতি/সংগঠক	বিনিয়োগ ব্যয়
মজুরি-শ্রমিক	ধনতান্ত্রিক দেশ অথবা ধনতন্ত্র
উৎপাদন প্রতিষ্ঠান/ফার্ম	ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রতিষ্ঠান
উৎপাদন	পরিবার
সরকার	বৈদেশিক ক্ষেত্র
রপ্তানি	আমদানি

অনুশীলনী

1. ব্যষ্টিক অর্থনীতি ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য কী?
2. ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
3. সামষ্টিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনীতির প্রধান চারটি ক্ষেত্র বর্ণনা করো।
4. 1929-এর মহামন্দা বর্ণনা করো।

Suggested Readings

1. Bhaduri, A., 1990. *Macroeconomics: The Dynamics of Commodity Production*, pages 1 – 27, Macmillan India Limited, New Delhi.
2. Mankiw, N. G., 2000. *Macroeconomics*, pages 2 – 14, Macmillan Worth Publishers, New York.

অধ্যায় 2

জাতীয় আয়ের হিসাব

এই অধ্যায়ে আমরা একটি সরল অর্থনীতির মৌলিক কার্যকারিতার সাথে পরিচিত হব। 2.1 পরিচ্ছেদে আমরা কিছু প্রাথমিক ধারণা ব্যাখ্যা করব যা নিয়ে আমরা কাজ করব। 2.2 পরিচ্ছেদে আমরা দেখবো কীভাবে একটি অর্থনীতিতে সামগ্রিক আয় সমস্তক্ষেত্রে একটি বৃত্তাকার পথে প্রবাহিত হচ্ছে। এই পরিচ্ছেদেই জাতীয় আয় হিসাবের তিনটি পদ্ধতি ; যেমন উৎপাদন পদ্ধতি, ব্যয় পদ্ধতি এবং আয় পদ্ধতি আলোচনা করা হবে। জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ভাগসমূহ বর্ণনা করা হবে শেষের 2.3 পরিচ্ছেদে। এই পরিচ্ছেদে বিভিন্ন ধরনের দাম সূচক যেমন GDP সংকোচক (GDP deflator), ভোক্তার দাম সূচক (Consumer Price Index), পাইকারি দাম সূচক (Wholesale Price Indices) এবং কোনো একটি দেশের মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ পরিমাপের মাপকাঠি হিসাবে দেশের GDP কে নিলে যে অসুবিধার সম্মুখীন হয় তা আলোচনা করা হবে শেষের অংশে।

2.1 সামাজিক অর্থনীতির কিছু মৌলিক ধারণা

পৃথিবীর কয়েকজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অ্যাডাম স্মিথ হলেন একজন। উনার জনপ্রিয় যুগান্তকারী কাজটি হল — *An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations.* একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সম্পদ কীভাবে সৃষ্টি হয়? কোন্ কারণে দেশগুলো ধনী বা গরিব হয়? অর্থনীতিতে এইগুলো হল কিছু মৌলিক প্রশ্ন। ব্যাপারটা এমন নয় যে, যে সমস্ত দেশ প্রাকৃতিক সম্পদ, খনিজ সম্পদ বা বনজ সম্পদ বা সবচেয়ে উর্বর জমিতে ভরপুর, তারাই সবচেয়ে ধনী দেশ। বাস্তবে সম্পদে সমৃদ্ধ আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকাতেও কিছু দরিদ্রতম দেশ আছে। আবার অনেক সমৃদ্ধ দেশ রয়েছে যাদের সম্পদের অপ্রতুলতা রয়েছে। এমন একটা সময় ছিল যখন প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে কীভাবে দখলে রাখা যায় তা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হত কিন্তু তারপরে এই সম্পদগুলোকে একটি উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রূপান্তর করতে হয়েছিল।

কোনো দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বা কল্যাণ শুধুমাত্র সম্পদের অধিকারের উপর নির্ভর করে না। মূল বিষয় হল কীভাবে এই সম্পদ উৎপাদন প্রবাহ তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় এবং ফলস্বরূপ, কীভাবে এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আয় ও সম্পদ সৃষ্টি হয়।

এখন এই উৎপাদন প্রবাহের উপর মনোনিবেশ করা যাক। উৎপাদনের এই প্রবাহটি কীভাবে শুরু হয়? মানুষ তাদের কর্মশক্তিকে প্রাকৃতিক এবং মানুষ সৃষ্ট পরিবেশের সাথে মিলিয়ে সামাজিক ও প্রযুক্তিগত কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত উৎপাদন প্রবাহ সৃষ্টি করে।

আমাদের আধুনিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে গঠিত ছোটো-বড়ো উদ্যোক্তাদের দ্বারা তৈরি পণ্য ও সেবাসামগ্রী থেকে উৎপাদনের এই প্রবাহ তৈরি হয়। এই উদ্যোক্তারা বড়ো থেকে শুরু করে ছোটো মাপেরও হতে পারে। বড়ো ধরনের উদ্যোক্তারা বিপুল সংখ্যক লোককে কাজে নিয়োজিত করে। কিন্তু দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের পর কী ঘটে? প্রত্যেক উৎপাদকই তাদের দ্রব্যসামগ্রী বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে আসে। সুতরাং, পিন, বোতামের মতো ছোটো দ্রব্য থেকে শুরু করে এরোপ্লেন, মোটরগাড়ী, বড়ো যন্ত্রপাতি, ডাক্তার, আইনজীবি বা আর্থিক পরামর্শদাতা প্রত্যেকের বিক্রয়যোগ্য পণ্য ও সেবা ভোগকারী বা পরিবারের কাছে বিক্রি হয়। আবার ভোক্তা একজন ব্যক্তিও হতে পারে বা উদ্যোগপতিও হতে পারে এবং তারা যে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করল, তা চূড়ান্ত ব্যবহারের জন্য বা পুনরায় উৎপাদনে ব্যবহারের জন্যও ক্রয় করা হতে পারে। যখন পণ্যটি পুনরায় উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় তখন ওই পণ্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে এবং উৎপাদনশীল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্য দ্রব্যে রূপান্তরিত হয়। এইভাবে কার্পাস তুলা উৎপাদনকারী একজন কৃষক এটিকে একটি সুতা কলের কাছে বিক্রি করে যেখানে কার্পাস তুলা সুতায় রূপান্তরিত হয়। পরবর্তিতে সুতা টেক্সটাইল মিলে বিক্রয় করা হয় যা পরবর্তী উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বস্ত্রে রূপান্তরিত হয়। বস্ত্র আবার আরো একটি উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোষাকে রূপান্তরিত হয় যা সর্বশেষে ভোক্তার কাছে চূড়ান্ত ব্যবহারের জন্য বিক্রি করা হয়। এই ধরনের দ্রব্য যা চূড়ান্ত ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত হয়, তা আর কোনো উৎপাদন বা রূপান্তরকরণের কোনো পর্যায়ে ব্যবহৃত হয় না তাকে বলে **চূড়ান্ত দ্রব্য**।

কেন আমরা এই দ্রব্যগুলোকে চূড়ান্ত দ্রব্য বলব? কারণ দ্রব্যটি একবার বিক্রি হয়ে গেলে এটি সক্রিয় অর্থনৈতিক প্রবাহের বাইরে চলে যায়। এটি পরবর্তীকালে আর কোনো উৎপাদকের হাত ধরে রূপান্তরকরণ হবে না। যদিও এটি চূড়ান্ত ক্রেতার ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে রূপান্তর হতে পারে। বাস্তবে এ জাতীয় অনেক চূড়ান্ত দ্রব্য আছে যাদের ভোগের সময় রূপান্তরিত হয়। এইভাবে ভোক্তারা যে চা পাতা ক্রয় করে তা সরাসরি ভোগ করা যায় না — এই চা পাতাগুলোকে চা পান করার উপযোগী করে তুলতে হয় এবং তারপর ভোগ করা যায়। এইভাবে বেশিরভাগ জিনিস আমরা রান্নাঘরে নিয়ে আসি সেগুলো রান্না প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু বাড়ীতে রান্না করা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নয়, যদিও রান্নার সময় দ্রব্যটি রূপান্তরিত হয়। বাড়ীতে রান্না করা জিনিস বাজারে বিক্রি হয় না। যদি একই ধরনের খাবার অথবা চা কোনো রেস্টুরেন্টে তৈরি করা হলে তা মানুষের কাছে বিক্রি করা যাবে। কিছু কিছু জিনিস যেমন, চা পাতা, চূড়ান্ত দ্রব্য হিসাবে গণ্য হবে যা অর্থনৈতিক মূল্য সংযোগ ঘটাতে পারে। এইভাবে দ্রব্যের প্রকৃতি হিসাবে নয়, তার অর্থনৈতিক ব্যবহারের মাধ্যমে চূড়ান্ত দ্রব্য হিসাবে বিবেচিত হয়।

চূড়ান্ত দ্রব্যকে **ভোগদ্রব্য** ও **মূলধনী** দ্রব্য হিসাবে আমরা ভাগ করতে পারি। খাদ্য ও বস্ত্রের মতো দ্রব্য এবং চিত্ত বিনোদনের মতো সেবা যখন চূড়ান্ত ভোগকারীরা ক্রয় করে তাদেরকে ভোগ্য দ্রব্য অথবা ভোক্তার দ্রব্য সামগ্রী বলে। (এটির মধ্যে আরো সেবামূলক দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত আছে যাদের নানা সুবিধা প্রদানের জন্য ভোগ্য পণ্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়।)

অনেক ধরনের দ্রব্য আছে যা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। এগুলো হল যন্ত্রপাতি, মেশিন ইত্যাদি, যেগুলোর মাধ্যমে অন্যান্য দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভবপর হয়। এরা নিজেরা কিন্তু উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রূপান্তরিত হয় না। এগুলো চূড়ান্ত দ্রব্য তবে চূড়ান্ত ভোগ্য পণ্য নয়। অন্যান্য চূড়ান্ত দ্রব্যের মতো তারা যে-কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে উৎপাদনের কাজকে সহায়তা করে। এদ্রব্যগুলো মূলধনের একটি অংশ, উৎপাদনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর মধ্যে একটি, যার জন্য সক্ষম উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ করে এবং তারা ক্রমাগত উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সচল রাখে। এইগুলো মূলধনী দ্রব্য এবং ব্যবহারের ফলে ক্ষয়ক্ষতি হলে মেরামত করা হয় অথবা সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে প্রতিস্থাপন করা হয়। অর্থনীতিতে যে মূলধনের ভাণ্ডার আছে সময়ের সাথে সাথে আংশিক বা পুরোপুরি সংরক্ষণ, রক্ষনাবেক্ষণ এবং পুনর্নবীকরণ করা হয় তার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে আলোচনার ক্ষেত্রে।

আমরা এখানে লক্ষ করি যে, কিছু কিছু দ্রব্য যেমন, টেলিভিশন, মোটরগাড়ি, ঘরের কম্পিউটার — এগুলো চূড়ান্ত ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাদের মূলধনী দ্রব্যের সঙ্গে সংগতি আছে — তাদের একটি বৈশিষ্ট্য হল — এরা চলনশীল দ্রব্য। এটির অর্থ হলো, এই দ্রব্যগুলো তাৎক্ষণিক বা স্বল্পকালীন ভোগের দ্বারা নিঃশেষিত হয় না; খাদ্য ও এমনকি পোশাকের মতো দ্রব্যের তুলনায় তাদের জীবনকাল বেশি। এই দ্রব্যগুলোর সবসময় ব্যবহারের ফলে ক্ষয়ক্ষতিও হয় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেরামত ও প্রতিস্থাপন করার প্রয়োজন হয়। যেমন কিছু কিছু মেশিনের সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনর্নবীকরণের প্রয়োজন হয়। এইজন্য আমরা এই দ্রব্যগুলিকে ভোগকারীর **স্থায়ী অথবা চলনশীল বা কন্‌জিউমার ডিউর‍্যবলস্** দ্রব্যও বলি।

সুতরাং, একটি নির্দিষ্ট সময়কালে অর্থনীতিতে যে সমস্ত চূড়ান্ত দ্রব্য এবং সেবাসামগ্রী উৎপাদিত হয় সেগুলো ভোগ্যপণ্য (কনজিউমার ডিউর‍্যাবলস্ ও কনজিউমার নন-ডিউর‍্যাবলস্ উভয়েই) বা মূলধনী দ্রব্য সামগ্রী হিসাবে বিবেচিত হবে। চূড়ান্ত পণ্য হিসাবে তাদের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াতে আর কোনো রূপান্তর ঘটবে না।

অর্থনীতিতে যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদিত হয় তার একটি বৃহৎ অংশ চূড়ান্ত দ্রব্য বা মূলধনী দ্রব্য হিসাবে বিবেচিত হয় না। উৎপাদকরা এই ধরনের দ্রব্যগুলোকে উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করে। যেমন, স্টীল শিট, মোটরগাড়ী উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং কপার ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন পাত্র তৈরির ক্ষেত্রে। এই দ্রব্যগুলো হল প্রাথমিক বা মাধ্যমিক দ্রব্য। যে সমস্ত পণ্য সামগ্রী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কাঁচামাল বা উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয় এগুলো চূড়ান্ত দ্রব্য নয়।

এখন অর্থনীতির মোট উৎপাদন প্রবাহের সার্বিক ধারণাকে বুঝতে হলে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রীকে পরিমাপ করতে হবে। যদিও উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণগত পরিমাপের মূল্যায়ণ করার ক্ষেত্রে আমাদের একটি সাধারণ পরিমাপ দণ্ডের প্রয়োজন আছে। আমরা কয়েকটন চাল বা মোটরগাড়ি বা মেশিনের সংখ্যার সাথে কয়েক মিটার কাপড় যোগ করতে পারি না। আমাদের সাধারণ পরিমাপ দণ্ড হল টাকা। যেহেতু প্রত্যেকটি দ্রব্য বিক্রি করার জন্য উৎপাদিত হয়, বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মোট আর্থিক মূল্য আমাদের চূড়ান্ত দ্রব্যের পরিমাপের হিসাব দেয়। কিন্তু আমরা শুধুমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্যই পরিমাপ করবো কেন? নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, যে-কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল মাধ্যমিক দ্রব্যসমূহ। এই সকল দ্রব্য উৎপাদনে আমাদের শ্রমশক্তি ও মজুত মূলধনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়োজিত হয়। যদিও, আমরা উৎপাদিত দ্রব্যের আর্থিক মূল্য নিয়ে আলোচনা করছি। তাই আমাদের এটা উপলব্ধি করতে হবে যে, চূড়ান্ত দ্রব্যের দামের মধ্যেই প্রাথমিক বা মাধ্যমিক দ্রব্যের দাম অর্ন্তনিহিত আছে যা চূড়ান্ত দ্রব্যের উৎপাদনের কাজে যুক্ত উপাদান হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। তাদের মূল্য আলাদাভাবে গণনা করা হলে দুইবার গণনায় সমস্যা সৃষ্টি হয়। যেহেতু প্রাথমিক বা মাধ্যমিক দ্রব্য সামগ্রিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পূর্ণ বিবরণ দিতে পারে, সেগুলো গণনা করা আমাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের চূড়ান্ত মানকে অনেকটা বাড়িয়ে তোলে।

এখন **মজুত (stocks)** এবং **প্রবাহের (flows)** ধারণাটি সম্বন্ধে আমরা পরিচিত হব। কোনো কোনো সময় শোনা যায় যে, কোনো একজন লোকের গড় বেতন 10,000 টাকা বা একটি ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন এত টন বা এত টাকা মূল্যের। কিন্তু এগুলো অসমাপ্ত বিবৃতি, কারণ এটি পরিষ্কার না যে ঐ লোকটির আয় বাৎসরিক না মাসিক না দৈনিক এবং অবশ্যই এই বিবৃতির মধ্যে ফাঁক আছে বিশাল। কখনো কখনো, আমরা ধরে নিই যে, সময়কালটি পরিচিত, তাই নির্দিষ্ট সময়কালটির উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই সমস্ত বক্তব্যের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে। অন্যথায়, এই সমস্ত বক্তব্যের কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। এইভাবে আয়, উৎপাদন বা মুনাফা — এই সমস্ত ধারণা সমূহ তখনই যুক্তিযুক্ত হবে যখন কোনো নির্দিষ্ট সময়কাল দেওয়া থাকবে। তাকে বলে প্রবাহ, কারণ এইগুলো সৃষ্টি হয় একটি নির্দিষ্ট সময়কালে। সুতরাং আমাদের একটি নির্দিষ্ট সময়কাল নির্ধারণ করতে হবে এগুলোর একটি পরিমাণগত পরিমাপ পাওয়ার জন্য। যেহেতু, যে-কোনো দেশে বা রাষ্ট্রে একটি বছরে অনেক হিসাব নিকাশ করা হয়, যেমন বার্ষিক মুনাফা, বার্ষিক

উৎপাদন, **প্রবাহ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বর্ণনা করা হয়।**

অপরদিকে, মূলধনী দ্রব্য বা চলনশীল দ্রব্য একবার উৎপাদিত হলে কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শেষ হয় না। মূলধনী দ্রব্যসমূহ বিভিন্ন উৎপাদন কাজে সবসময় ব্যবহৃত হতে থাকে। কোনো একটি ফ্যাক্টরির বিল্ডিং বা মেশিন কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য ব্যবহৃত হয় না। যদি কোনো নতুন মেশিন উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় বা পরবর্তী উৎপাদনের জন্য রেখে দেওয়া হয়, বা কোনো প্রতিস্থাপন করা না হয়, তাকে বলে মজুত। মজুত একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য গণনা করা হয়। আমরা **মজুতের পরিবর্তনকে কোনো এক নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য পরিমাপ করতে পারি**। যেমন, কতগুলো মেশিন এই বছর লাগবে। এই ধরনের মজুতের পরিবর্তন হল প্রবাহ যা একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে পরিমাপ করা যায়। একটি মেশিন, যতক্ষণ না পর্যন্ত এটির ক্ষয় বা ক্ষতি হচ্ছে, ততক্ষণ মূলধনী মজুত হিসাবে অনেক বছরের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু ওই মেশিনটি প্রাথমিক অবস্থায় কেবলমাত্র এক বছরের জন্য মূলধন প্রবাহ হিসাবে চিহ্নিত হয়।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে মজুত ও প্রবাহের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। ধরা যাক, একটি জলের ট্যাঙ্ক টেপের মাধ্যমে জল দিয়ে ভর্তি করা হল। টেপ থেকে প্রতি মিনিটে যে পরিমাণ জল নির্গমন করা হয়, তাকে বলে প্রবাহ। কিন্তু কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে ট্যাঙ্কে যে পরিমাণ জল থাকে তাকে বলে মজুত।

এখন চূড়ান্ত দ্রব্যের পরিমাপের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনায় ফেরা যাক। মূলধনী দ্রব্য দ্বারা যে চূড়ান্ত দ্রব্য উৎপাদিত হয় তা একটি দেশের **স্থূল বিনিয়োগ**[1]। এদের মধ্যে আছে মেশিন, সরঞ্জাম এবং তার ব্যবহার, বিল্ডিং, অফিস, গুদামঘর বা পরিকাঠামোর মধ্যে রাস্তা, ব্রিজ, এয়ারপোর্ট ইত্যাদি। কিন্তু একটি বছরে যে সমস্ত মূলধনী মজুত প্রস্তুত হয় তা পূর্বের মূলধনী মজুতের মধ্যে ধরা হয় না। বর্তমানে মূলধনী দ্রব্যের একটা অংশ আগের থেকেই মজুত থাকে যা মূলধনী দ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ বা প্রয়োজনে বদলানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। কারণ পুরনো মূলধনী দ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হয় সবসময়ই। এই বছর উৎপাদিত মূলধনী দ্রব্যসামগ্রী পূর্বের মূলধনী দ্রব্যের প্রতিস্থাপনের কাজে ব্যবহৃত হয় এবং যে সমস্ত মূলধনী দ্রব্যের মজুত আছে তা থেকে এই বছর যে সমস্ত মূলধনী দ্রব্য উৎপাদিত হয়েছে তা আলাদা নয় এবং এই নতুন মূলধনী দ্রব্যের মূল্য নিট মূলধন হিসাব করার সময় স্থূল মূলধন থেকে বাদ দিতে হয়। মূলধনী দ্রব্যের নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষণ এবং প্রতিস্থাপনের জন্য যে খরচ হয় তা স্থূল বিনিয়োগ থেকে বাদ দেওয়া হলে তাকে বলে **অবচয় (depreciation)**।

সুতরাং, একটি দেশের নতুন মূলধন মজুত নিট বিনিয়োগ বা মূলধন গঠন দ্বারা পরিমাপ করা হয়, যা নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায়,

নিট বিনিয়োগ = স্থূল বিনিয়োগ – অবচয়জনিত ব্যয়।

অবচয়ের ধারণাটি আরো বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। ধরা যাক একটি ফার্ম নতুন একটি মেশিন ক্রয় করার জন্য অর্থ বিনিয়োগ করল। এই মেশিনটি পরবর্তী আরো কুড়ি বছর চলবে কিন্তু তারপর মেশিনটির রক্ষনাবেক্ষণের প্রয়োজন হবে এবং প্রতিস্থাপনের দরকার হবে। আমরা এখন ধরে নিই যে, যদি মেশিনটি প্রতিবছর উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় এবং প্রতি বছর প্রকৃত মূল্যের কুড়ি ভাগের একভাগ করে অবচয় হতে থাকে। সুতরাং কুড়ি বছর পর মেশিনটি পাল্টানোর জন্য বিনিয়োগ দরকার, তাছাড়াও প্রতি বছরই একটা অবচয়জনিত খরচ আছে। এটি হল চিরাচরিত এক ধারণা যেখানে অবচয়ের ধারণাটি ব্যবহৃত হয় এবং

[1]এভাবেই অর্থনীতিবিদরা বিনিয়োগকে সংজ্ঞায়িত করেছে। একে বিনিয়োগের সাধারণ ধারণার সাথে গুলিয়ে ফেললে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে। সাধারণভাবে টাকাকড়ির মাধ্যমে বস্তুগত বা আর্থিক সম্পদ ক্রয় করাকে বিনিয়োগ বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতিবিদদের বিনিয়োগের সংজ্ঞা অনুযায়ী, শেয়ার ক্রয় বা সম্পত্তি ক্রয় বা বিমা পত্র ক্রয় ইত্যাদি বাবদ বব্যহৃত বিনিয়োগ শব্দটি আসলে বিনিয়োগ নয়। এখন আমাদের কাছে, বিনিয়োগ হল মূলধন গঠন, মূলধনী মজুতের মোট বা নিট মূল্য সংযোজন।

এইভাবে একটি মূলধনী দ্রব্যের ভবিষ্যতে আয়ু সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি। যেমন, আমাদের উদাহরণে মেশিনটির আয়ু কুড়ি বছর। সুতরাং অবচয় হল একটি মূলধনী দ্রব্যের[2] রক্ষণাবেক্ষণ ও ক্ষয়ক্ষতি বাবদ বাৎসরিক ব্যয়। অন্যভাবে, বলতে গেলে একটি দ্রব্যের মূল্যকে ওই দ্রব্যের স্বাভাবিক জীবনের[3] সময়সীমা দিয়ে ভাগ করলে অবচয় বাবদ ব্যয় পাওয়া যায়।

এখানে লক্ষনীয় যে, অবচয় বা অবমূল্যায়ণ একটি হিসাবগত ধারণা, প্রকৃত কোনো ব্যয় প্রতিবছর এর জন্য ধার্য করা হয় না। তবুও অবমূল্যায়ণজনিত ব্যয় প্রতিবছর গণনার আওতায় আনা হয়।

এখন আমরা দেশে যে সমস্ত চূড়ান্ত দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদিত হচ্ছে তা আলোচনা করব। এখানে চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে ভোগ্য দ্রব্য সামগ্রী ও মূলধনী দ্রব্য সামগ্রী লক্ষ করা যায়। ভোগ্যপণ্য বলতে একটি দেশের সকল মানুষের ব্যবহৃত ভোগ্য দ্রব্যকে বোঝানো হয়েছে। ভোগ্যপণ্যের ক্রয় নির্ভর করে মানুষের ক্রয়ক্ষমতার উপর এবং এটি নির্ভর করে ভোক্তার আয়ের উপর। চূড়ান্ত দ্রব্যের আর একটি অংশ হল মূলধনী দ্রব্য, যা ব্যবসায়ীরা ক্রয় করে। এই সমস্ত মূলধনী দ্রব্য অন্য মূলধনী দ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ব্যবহার করা হয় অথবা মূলধন মজুত হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়কালে, ধরা যাক এক বছরে, চূড়ান্ত দ্রব্যের মোট উৎপাদন, ভোগে অথবা বিনিয়োগে ব্যবহৃত হতে পারে। এই অর্থ হল, ভোগ ও বিনিয়োগের মধ্যে সমতা বজায় থাকে। অর্থাৎ, অর্থনীতিতে যদি বেশি ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন হয় তবে মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন কম হবে এবং ঘটনাটি বিপরীতভাবেও সত্য হবে।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে অত্যাধুনিক মূলধনী দ্রব্য শ্রমিকের দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করার ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে। চিরাচরিত পদ্ধতিতে তাঁতীদের কোনো একটি শাড়ী বুনতে অনেক সময় প্রয়োজন হয়। কিন্তু উন্নত মানের যন্ত্রপাতির সাহায্যে খুব কম সময়ের মধ্যেই হাজার হাজার কাপড় তৈরি করা যায়। তাজমহল বা পিরামিড তৈরি করতে হাজার হাজার বছর সময় লেগেছে কিন্তু উন্নত মানের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে খুব কম সময়ের মধ্যেই আকাশ ছোঁয়া বিল্ডিং তৈরি করে ফেলা যায়। তাই বিভিন্ন ধরনের নতুন মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন আরো বেশি পরিমাণে ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদন করতে সাহায্য করে।

কিন্তু আমরা কি নিজেদের মধ্যেই বিরোধ তৈরি করছি না? পূর্বে আমরা দেখেছি, কীভাবে দেশের মোট চূড়ান্ত দ্রব্যের একটি বৃহৎ অংশ যদি মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করি, তাহলে স্বভাবতই খুব কম পরিমাণে ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদন করা যাবে। এখন আমরা বেশি পরিমাণে মূলধনী দ্রব্য সঞ্চয় করছি আরো ভোগ্য পণ্য উৎপাদনের জন্য। সুতরাং এখানে কোনো বিরোধিতা নেই। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সময়। কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে যদি বেশি পরিমাণ মূলধনী দ্রব্য উৎপাদিত হয় তবে কম পরিমাণ ভোগ্য পণ্য উৎপাদন করতে হবে। কিন্তু বেশি পরিমাণে মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন করার অর্থ হল ভবিষ্যতে শ্রমিকরা আরো বেশি পরিমাণে মূলধনী যন্ত্রপাতির ব্যবহার করতে পারবে। এর অর্থ হল কোনো একটি দেশে সমপরিমাণ শ্রম নিয়োগ করলে বেশি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এইভাবে মোট উৎপাদনের উপকরণ বৃদ্ধি পাবে যখন মূলধনী দ্রব্য কম উৎপাদিত হবে। যদি মোট উৎপাদন বেশি হয়, তাহলে ভোগ্য পণ্যের পরিমাণও অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে।

এইভাবে অর্থনৈতিক প্রবাহ শুধু চালুই থাকে না, মূলধনী দ্রব্য বেশি উৎপাদিত হলে অর্থনীতিকেও প্রসারিত করে। আমরা এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম তার থেকে আরো একটি বৃত্তাকার প্রবাহ বের করা সম্ভব।

[2]অবচয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না মূলধনের অপ্রত্যাশিত বা হঠাৎ ক্ষয়ক্ষতি অথবা মূলধনের অব্যবহার যা প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা এধরনের অন্যান্য বহিঃস্থ পরিস্থিতির কারণে ঘটে।

[3]এখানে বরং আমরা সহজ সরলভাবে অনুমান করছি যে, সম্পদের প্রাথমিক মূল্যের নিরিখে নির্ধারিত স্থির অবচয়ের হার রয়েছে। আদতে বাস্তব চর্চায় অবচয় নিরূপণের অন্যান্য পদ্ধতিও থাকতে পারে।

আমরা যে সমস্ত দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী নিয়ে আলোচনা করছি, সেগুলো উৎপাদিত হয় বাজারের জন্য। এই সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রয় নির্ভর করে ওই সমস্ত দ্রব্যের চাহিদার উপর যা আবার নির্ভর করে ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতার উপর। একজনের ওই সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করবার মতো ক্ষমতা থাকতে হবে। অন্যথায় বাজারে দ্রব্যটি পাওয়া যাবে না।

আমরা ইতোমধ্যেই আলোচনা করেছি যে, একজনের দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করার সামর্থ জন্মায় আয় থেকে যা সে শ্রমিক হিসেবে উপার্জন করে (মজুরি পায়) অথবা উদ্যোক্তা হিসেবে (মুনাফা লাভ করে) অথবা জমিদার হিসেবে (খাজনা বাবদ আয় থেকে) অথবা মূলধনের মালিক হিসেবে (সুদ পায়) পায়। সংক্ষেপে, উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা বাবদ যে আয় মানুষ উপার্জন করে সেটা দ্রব্য ও সেবার চাহিদা মিটাতে ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং, আমরা একটি বৃত্তাকার প্রবাহ দেখতে পাই যা বাজারের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সহজভাবে বলতে গেলে, উৎপাদন প্রক্রিয়াকে চালু রাখতে গেলে ফার্মের যে উৎপাদনের উপকরণ প্রয়োজন হয় তার জন্য জনসাধারণকে অর্থ প্রদান করতে হয়। তার বিনিময়ে, জনসাধারণ যে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী বাজার থেকে ক্রয় করে তার জন্য জনসাধারণ অর্থ প্রদান করে এবং ফার্মসমূহ যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করে সেটা বিক্রয় করতে পারে।

সুতরাং, ভোগ ও উৎপাদনের মতো সামাজিক কার্যকলাপ একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং তাদের মধ্যে একটি বৃত্তাকার কারণ ও ফলাফল বিদ্যমান আছে। উৎপাদনের কাজে যে সমস্ত উৎপাদনের উপকরণসমূহ জড়িত আছে, উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওই সমস্ত উপকরণগুলোর মধ্যে অর্থের লেনদেন সৃষ্টি হয়। এর ফলে যে আয়ের সৃষ্টি হয় তার মাধ্যমে চূড়ান্ত ভোগপণ্যের ক্রয় করার ক্ষমতা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় এবং ব্যবসায়িক উদ্যোক্তাদের ওই সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি করতে উৎসাহ প্রদান করে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এছাড়াও যে সকল মূলধনী দ্রব্যাদি তৈরি হয় সেগুলো থেকেও উৎপাদকেরা আয় উপার্জনে সমর্থ হয় — যেমন মজুরি, মুনাফা ইত্যাদি।

2.2 আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ এবং জাতীয় আয় হিসাব করার পদ্ধতিসমূহ :

উপরের অংশে সরকার, বৈদেশিক বাণিজ্য ও সঞ্চয় ব্যতিরেকে একটি সাধারণ অর্থনীতি কীভাবে কাজ করে তার সম্বন্ধে একটি প্রারম্ভিক ধারণা পাওয়া গেছে। পরিবারবর্গ ফার্মের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে বলে ফার্মগুলো থেকে তারা আয় উপার্জন করে। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদনের সময় চার ধরনের প্রবাহ সৃষ্টি হয় (ক) মানুষ তার শ্রমের বিনিময়ে মজুরি হিসাবে পারিশ্রমিক পায়, (খ) মূলধন উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে সুদ হিসাবে পুরস্কার পায়, (গ) উদ্যোক্তারা মুনাফা অর্জন করার মধ্য দিয়ে পারিতোষিক পায়, (ঘ) জমি একটি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য খাজনা হিসাবে আয় প্রবাহিত হয় জমির মালিকের কাছে।

এই সরল অর্থনীতিতে পরিবারবর্গ মাত্র একটি উপায়ে তাদের উপার্জিত আয় খরচ করতে পারে — দেশীয় ফার্মগুলো যে সমস্ত পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করে সেই সমস্ত পণ্যসামগ্রীর জন্য মানুষ তাদের অর্থ খরচ করে। অন্যদিকে পরিবারবর্গের আয় হস্তান্তর করার রাস্তা সীমিত; আমরা মনে করতে পারি যে, পরিবারবর্গ সঞ্চয় করে না, তারা সরকারকে কর প্রদান করে না — যেহেতু এখানে কোনো সরকার নেই বলে ধরে নেওয়া হয়েছে এবং এই বন্ধ অর্থনীতিতে যেহেতু কোনো বৈদেশিক বাণিজ্য নেই। সুতরাং মানুষের কোনো আমদানী দ্রব্য ক্রয় করারও সুযোগ নেই। অন্যভাবে বলতে গেলে, উৎপাদনের উপকরণসমূহ তাদের উপার্জন, দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী ক্রয় করতে ব্যবহার করে যা উৎপাদন প্রক্রিয়াকে আরো সম্প্রসারিত করে। অর্থনীতিতে পরিবারবর্গের সামগ্রিক ভোগ ফার্মের

দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর উৎপাদনের সামগ্রিক খরচের সমান হয়। সুতরাং অর্থনীতির সমস্ত আয় উৎপাদকের কাছে বিক্রয় লব্ধ আয় হিসাবে ফিরে আসে। এই অবস্থার মধ্যে কোনো নির্গমন নেই — ফার্মগুলো যে অর্থ উৎপাদনের উপকরণগুলোর মধ্যে বণ্টন করে (উৎপাদনের যে চারটি উপাদান আছে তাদের আর্থিক আয়ের মোট হিসাব) এবং ওই উপাদানগুলোর সামগ্রিক ভোগ ব্যয় থেকে ফার্মের যে আয় হয় তার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না।

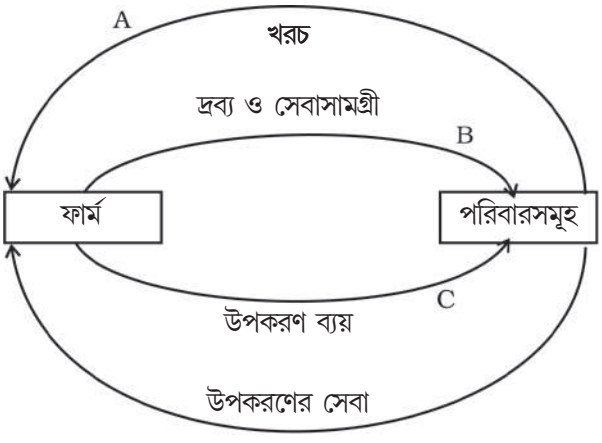

চিত্র 2.1: সরল অর্থনীতিতে আয়ের চক্রাকার প্রবাহ

পরবর্তীকালে ফার্মসমূহ পুনরায় দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন করে এবং উৎপাদনের উপকরণগুলোকে তার নিজ নিজ পারিশ্রমিক প্রদান করে। এই অর্থ আবার দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী ক্রয় করার জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং বছরের পর বছর আমরা একটি দেশের সামগ্রিক আয় কল্পনা করতে পারি যা ফার্ম ও পরিবার — এই দুটি ক্ষেত্রে চক্রাকারভাবে সবার মধ্যে বণ্টিত হয়। এটি 2.1 রেখাচিত্রে পরিবেশন করা হল। ফার্মসমূহের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর জন্য যখন এই অর্থ খরচ হয়, তখন তাকে বলে সামগ্রিক খরচ যা ফার্মের কাছে আয় হিসাবে আসে। খরচ বাবদ মূল্য যখন দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর মূল্যের সমান হয়। আমরা একইভাবে ফার্মের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর সামগ্রিক আর্থিক মূল্যের হিসাব বের করে সামগ্রিক আয় পরিমাপ করতে পারি। উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফলে ফার্ম যে সামগ্রিক রেভিনিউ হাতে পায় সেটা যখন উৎপাদনের উপকরণগুলোর মধ্যে বণ্টন করা হয় তখন তা সামগ্রিক আয়ের রূপ ধারণ করে।

2.1 রেখাচিত্রে সবচেয়ে উপরের তিরটি পরিবার থেকে ফার্মের দিকে মুখ করানো এবং এটি দেখায় যে পরিবারগুলো দ্রব্য ও সেবা সামগ্রী ক্রয় করার জন্য খরচ করছে। দ্বিতীয় তিরটি ফার্ম থেকে পরিবারের দিকে মুখ ঘোরানো এবং এটি দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে, ফার্ম থেকে দ্রব্য ও সেবা সামগ্রী পরিবারগুলোর দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, পরিবারসমূহের দিকে ফার্ম থেকে এই প্রবাহটি চালু রয়েছে, যার জন্য মানুষ বা পরিবারকে খরচ করতে হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে, উপরের দুটো তির দ্রব্যের বাজারকে নির্দেশ করছে। উপরের তির দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর জন্য আর্থিক ব্যয় প্রবাহ এবং নিচের তির উৎপন্ন প্রবাহ নির্দেশ করে, রেখাচিত্রের নিচের দুটো তির উৎপাদনের উপকরণের বাজার নির্দেশ করে। সবচেয়ে নিচের তিরটি পরিবার থেকে ফার্মের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং পরিবারগুলো ফার্মগুলোকে যে সেবা প্রদান করছে তা এই তিরের মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে। পরিবারসমূহের এই শ্রমদানের উপর নির্ভর করে ফার্মসমূহ দ্রব্য ও সেবা সামগ্রী উৎপাদন প্রক্রিয়া চালায়। তার ঠিক উপরের তিরটি ফার্ম থেকে পরিবারের দিকে ধাবিত হয় এবং ফার্মের নিকট পরিবারের এই শ্রমদান এই তিরের মাধ্যমের দেখানো হয় এবং তার বিনিময়ে ফার্মসমূহ পরিবারগুলোকে পারিশ্রমিক দিচ্ছে।

যেহেতু একই পরিমাণ অর্থ চক্রাকার প্রবাহে ঘুরছে এবং সমগ্র দ্রব্য ও সেবা সামগ্রির আর্থিক মূল্যকে নির্দেশ করছে, যদি আমরা একটি বছরের সমস্ত পণ্য সামগ্রীর আর্থিক মূল্যের হিসাব নির্ণয় করতে চাই, আমরা রেখাচিত্রের প্রত্যেকটি রেখা যে প্রবাহ নির্দেশ করছে তার বাৎসরিক মূল্য পরিমাপ করব। ফার্মসমূহ যে সমস্ত চূড়ান্ত পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করেছে তার সামগ্রিক খরচ বাবদ মূল্য হিসাব করে সবচেয়ে উপরের প্রবাহটি A বিন্দুতে পরিমাপ করা যায়। এই পদ্ধতিকে ব্যয় পদ্ধতি বলে। সমস্ত ফার্মসমূহের দ্বারা উৎপাদিত চূড়ান্ত পণ্যসামগ্রীর সামগ্রিক আর্থিক মূল্য হিসাব করে B বিন্দুতে প্রবাহটি পরিমাপ করলে তাকে বলে উৎপাদন পদ্ধতি। C বিন্দুতে সমস্ত উপকরণের অর্জিত আয় যোগ করে পরিমাপ করলে তাকে **আয় পদ্ধতি** বলে।

লক্ষ্যণীয় যে, একটি দেশের সামগ্রিক ব্যয় সমস্ত উৎপাদনের উপকরণের মোট আয়ের (A ও C বিন্দুতে প্রবাহগুলো সমান) সমান হতে হবে। এখন ধরে নেওয়া হল যে-কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়কালে পরিবারবর্গ স্থির করলো যে, তারা ফার্মগুলো দ্বারা উৎপাদিত পণ্যসামগ্রি ক্রয় করবে। কিছু সময়ের জন্য প্রশ্নটি ভুলে যেতে হবে যে, যেখানে তারা তাদের সমস্ত আয়ের সবটাই ইতোমধ্যে খরচ করে ফেলেছে। সেখানে পরিবারগুলো কোথা থেকে টাকা সংগ্রহ করবে এই অতিরিক্ত খরচ মেটানোর জন্য (তারা এই অতিরিক্ত খরচ মেটানোর জন্য ধার করতে পারে)। এখন তারা যদি তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর জন্য আরো খরচ করে, ফার্মগুলো পরিবারবর্গের এই অতিরিক্ত চাহিদা পূরণের জন্য আরো দ্রব্য উৎপাদন করবে। যেহেতু ফার্ম তাদের উৎপাদন আরো বৃদ্ধি করবে সুতরাং ফার্মকে উৎপাদনের উপকরণসমূহ ব্যবহার করার জন্য অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে। এখন প্রশ্ন হল, ফার্ম আর অতিরিক্ত কত টাকা প্রদান করবে? অতিরিক্ত উপকরণ ব্যয় অতিরিক্ত উৎপাদিত দ্রব্য সমূহের আর্থিক মূল্যের সমান হতে হবে। এইভাবে মানুষ বা পরিবারসমূহ ওই অতিরিক্ত খরচ মেটাতে অতিরিক্ত আয় অর্জন করবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, পরিবারগুলো অতিরিক্ত খরচ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে — তাদের প্রয়োজনের বেশিও খরচ করতে পারে এবং অবশেষে তাদের আয় ঠিক ততটুকুই বৃদ্ধি পাবে যতটুকু তাদের অতিরিক্ত খরচ বহন করা দরকার। অন্যভাবে বলতে গেলে, একটি দেশ তার বর্তমান আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কিন্তু এটি করতে গেলে দেশের আয় পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেতে লাগবে যা অতিরিক্ত ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। প্রথমদিকে একে কিছুটা অন্যরকম মনে হতে পারে। কিন্তু আয় যেহেতু চক্রাকারভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। তাই কোনো একটি জায়গায় একটি প্রবাহের উত্থান হলে অন্য সমস্ত ক্ষেত্রেও প্রবাহের উত্থান হবে। এটা হল আরো একটি উদাহরণ যার মাধ্যমে দেখা যায়, কীভাবে একটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের (পরিবার) কাজকর্ম সমগ্র অর্থনীতির কাজকর্ম থেকে ভিন্ন হয়। একটি পরিবারের খরচ নির্ভর করে ওই পরিবারের কোনো এক সদস্যের আয়ের উপর। এটি কোনো সময়েই সম্ভব না যে একজন শ্রমিক যতটুকু খরচ বৃদ্ধি করতে চায় ঠিক ততটুকুই তার আয় বৃদ্ধি পাবে। পরবর্তী অধ্যায়ে কীভাবে বাড়তি সামগ্রিক ব্যয় সামগ্রিক আয়কে পরিবর্তন করে সে সম্বন্ধে আরো বেশি সময় খরচ করব পরবর্তী অধ্যায়ে।

খুব সহজ সরলভাবে একটি অর্থনীতির চিত্রটি উপরের অংশে বর্ণিত হল। এই ধরনের ব্যাখ্যা যা একটি কাল্পনিক অর্থনীতির কার্যকারিতাকে তুলে ধরে তাকে **সামষ্টিক অর্থনৈতিক মডেল** বলে। এটি সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, কোনো একটি মডেল হুবহু একটি অর্থনীতিকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। যেমন, আমাদের মডেলে ধরে নেওয়া হয়েছে যে পরিবারসমূহ সঞ্চয় করে না। এখানে কোনো সরকারের উপস্থিতি নেই, অন্যান্য দেশের সঙ্গে কোনো বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করা হয়নি। যাই হোক, মডেল কোনো একটি অর্থনীতির প্রত্যেক মিনিটের খবরাখবর উল্লেখ করতে চায় না — তাদের উদ্দেশ্য হল একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কিছু প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যকে সকলের সামনে তুলে ধরা। কিন্তু আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যে, মডেলকে সরলভাবে উপস্থাপন করার সময় যাতে অর্থনীতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলোকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা না হয়। অর্থনীতির বিষয়সমূহ অনেক মডেল দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয় যা এই বইতে কিছু কিছু বর্ণনা করা হবে। একজন অর্থনীতিবিদের কাজ হল কোন্ কোন্ মডেলগুলো বাস্তব জীবন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে ব্যবহার করা যাবে তার ছক কষা।

আমরা যদি উপরে বর্ণিত সরল মডেলটিকে পরিবর্তন করি তাহলে — কি মৌলিক ধারণার কোনো পরিবর্তন হবে? সাধারণত এটি দেখা যায় যে, মৌলিক ধারণার কোনো পরিবর্তন হয় না। কোনো অর্থনীতির অবস্থান যতই জটিল হোক না কেন, দ্রব্য সামগ্রীর বাৎসরিক উৎপাদনের হিসাব প্রত্যেক পদ্ধতিতে একই হবে।

আমরা দেখেছি যে, কোনো এক অর্থনীতির সমগ্র দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর আর্থিক মূল্য তিনটি পদ্ধতিতে হিসাব করা হয়। আমরা এখন এই হিসাবসমূহের বিভিন্ন ধাপগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

2.2.1 উৎপাদন বা মূল্য সংযোজন পদ্ধতি

উৎপাদন পদ্ধতিতে এক বছরে যে সমস্ত পণ্য ও সেবাকার্য উৎপাদন হয় তার আর্থিক মূল্য আমরা হিসাব করি (একটি বছরকে সময়ের একক ধরে নিয়ে)। কীভাবে আমরা হিসাব করব? আমরা কি দেশের সমস্ত ফার্মসমূহ যে সমস্ত পণ্য ও সেবা সামগ্রী উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্যগুলোকে যোগ করব? নিম্নের উদাহরণটি থেকে বোঝার চেষ্টা করো।

ধরা যাক, দেশে শুধুমাত্র দুজন উৎপাদক আছে — একজন গম উৎপাদক (কৃষক) এবং আর একজন পাউরুটি উৎপাদক (বেকারির মালিক)। গম উৎপাদক গম উৎপাদন করে এবং উৎপাদনে শ্রমিকের কায়িক শ্রম ছাড়া আর কোনো উৎপাদনের উপকরণের প্রয়োজন হয় না। গম উৎপাদক গমের কিছুটা অংশ বেকারির কাছে বিক্রয় করে। বেকারিরও গম ছাড়া আর কোনো উপকরণের প্রয়োজন হয় না পাউরুটি তৈরি করতে। ধরা যাক, কোনো এক বছরে কৃষক যে পরিমাণ গম উৎপাদন করেছে তার আর্থিক মূল্য 100 টাকা। কৃষক তার মধ্য থেকে 50 টাকায় গম বিক্রয় করল বেকারির কাছে। পাউরুটি উৎপাদক পাউরুটি উৎপাদন করার জন্য সেই বছর সম পরিমাণের গমই ব্যবহার করে 200 টাকার মূল্যের পাউরুটি উৎপাদন করল। তাহলে প্রশ্ন হল দেশে মোট উৎপাদনের আর্থিক মূল্য কত? যদি আমরা সহজভাবে সমস্ত ক্ষেত্রের উৎপাদন মূল্যকে যোগ করি তাহলে সেই অনুসারে 200 টাকার (পাউরুটির উৎপাদন মূল্য) সঙ্গে 100 টাকা (শ্রমিকের উৎপাদন মূল্য) যোগ করতে হবে এবং উত্তর হবে 300 টাকা। কিন্তু দেশের সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর আর্থিক মূল্য কি 300 টাকা? তা কিন্তু নয়। একটি ধারণার মাধ্যমে এটা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কৃষক যে 100 টাকায় গম উৎপাদন করেছে তার জন্য অন্য কারোর সাহায্য নিতে হয়নি। তাহলে এই 100 টাকার সবটাই কৃষকের অবদান। কিন্তু বেকারির জন্য এই ধারণাটা ঠিক নয়। বেকারির পাউরুটি উৎপাদন করার জন্য 50 টাকার গম কিনতে হয়েছে। সুতরাং 200 টাকায় যে পাউরুটি উৎপাদিত হয়েছে তার সবটাই বেকারির অবদান নয়। বেকারির নিট অবদানের হিসাব করার ক্ষেত্রে কৃষক থেকে যে আর্থিক মূল্যের গম ক্রয় করতে হয়েছে তা বিয়োগ করতে হবে। যদি আমরা তা না করি তাহলে "দ্বৈত গণনাজনিত ভুলের" সম্ভাবনা থেকে যাবে। কারণ, 50 টাকার আর্থিক মূল্যের গম দুবার গণনা করা হবে। প্রথমতঃ কৃষকের উৎপাদিত দ্রব্যের একটা অংশ ধরা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ বেকারি যে পাউরুটি তৈরি করেছে তার মধ্যে গমের যে অন্তর্নিহিত মূল্য আছে তাও হিসাবের মধ্যে ধরা হয়েছে।

অতএব, বেকারির নিট অবদান হল 200 টাকা – 50 টাকা = 150 টাকা। এইভাবে দেশের মোট পণ্য ও সেবা সামগ্রীর আর্থিক মূল্য হল 200 টাকা (কৃষকের নিট অবদান) + 150 টাকা (বেকারির নিট অবদান) = 250 টাকা।

ফার্মের নিট অবদানকে বলা হয়, **মূল্য সংযোজন (value added)**। আমরা দেখেছি যে, ফার্ম যে সমস্ত কাঁচামাল অন্য ফার্ম থেকে ক্রয় করে যা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়, ওই সমস্ত পণ্যসামগ্রীকে বলে অন্তবর্তী দ্রব্য বা মধ্যবর্তী দ্রব্য। সুতরাং, একটি ফার্মের মূল্য সংযোজন হল ফার্মের উৎপাদন মূল্য — ফার্মের ব্যবহৃত অন্তবর্তী দ্রব্যের আর্থিক মূল্য। ফার্ম যে মূল্য সংযোজন করে তা চারটি উৎপাদনের উপকরণে যথা — শ্রম, মূলধন, উদ্যোক্তা ও জমি — এর মধ্যে ভাগ করে দেয়। সুতরাং, ফার্মের মূল্য সংযোজনের সঙ্গে মজুরি, সুদ, মুনাফা এবং খাজনা যোগ করতে হয়। মূল্য সংযোজন হল একটি প্রবাহী উপাদান।

সারণি 2.1: উৎপাদন, অন্তবর্তী দ্রব্য ও মূল্য সংযোজন।

	কৃষক	*বেকারি*
মোট উৎপাদন	100	200
অন্তবর্তী দ্রব্যের ব্যবহার	0	50
মূল্য সংযোজন	100	200 – 50 =150

আমরা উপরের উদাহরণটি 2.1 নং সারণির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে পারি।

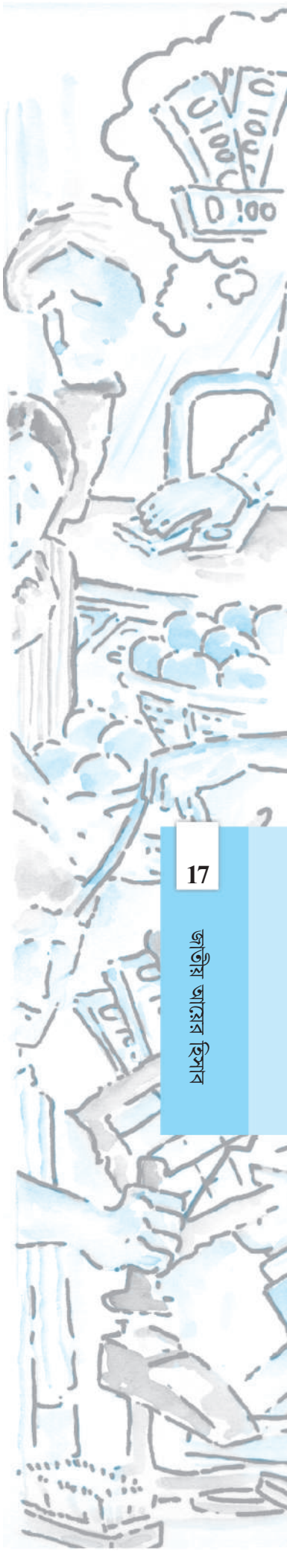

এখানে সমস্ত চলকগুলো টাকার অংকে প্রকাশ করা হল। এখানে যে সমস্ত চলকগুলো তালিকাতে দেখানো হল সেগুলোকে মূল্যায়ন করার জন্য সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীর বাজারদর নেওয়া যেতে পারে। উদাহরণে আমরা আরো চলক ব্যবহার করতে পারি উৎপাদনের চেইনে তাহলে উদাহরণটিকে আরো বাস্তববাদী এবং জটিল হবে। উদাহরণস্বরূপ, কৃষকরা সার বা কীটনাশক ব্যবহার করে গম উৎপাদন করে। এই উপকরণের মূল্য গম থেকে তৈরি উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য থেকে বাদ দিতে হয়। অথবা বেকারির লোকেরা রেস্টুরেন্টে যে পাউরুটি বিক্রি করে তার মূল্য সংযোজন গণনার ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী বা অন্তবর্তী দ্রব্যের (পাউরুটি) মূল্য বাদ দিতে হয়।

আমরা ইতোমধ্যে অবচয়ের ধারণাটি সম্পর্কে অবগত হয়েছি, যাকে স্থির মূলধনের ভোগও বলা যেতে পারে। মূলধন যেহেতু উৎপাদনের কাজে লাগে, সুতরাং, উৎপাদকের মূলধনের মূল্য স্থির রাখার জন্য প্রতিস্থাপনকারী বিনিয়োগ করতে হয়। এই প্রতিস্থাপনের জন্য বিনিয়োগ হল মূলধনের অবচয়। যদি আমরা মূল্য সংযোজনে অবচয় যোগ করি তখন আমরা **স্থূল মূল্য সংযোজন (Gross Value Added)** পাই। স্থূল মূল্য সংযোজন থেকে অবচয় বাবদ ব্যয় বাদ দিলে **নিট মূল্য সংযোজন (Net Value Added)** পাওয়া যায়। স্থূল মূল্য সংযোজনের মতো নিট মূল্য সংযোজনে মূলধন বাবদ ব্যয় অন্তর্ভুক্ত হয় না। যেমন ধরা যাক, একটি ফার্ম বছরে 100 টাকায় পণ্য উৎপাদন করে। ওই বছর মাধ্যমিক বা মধ্যবর্তী পণ্যের জন্য 20 টাকা ব্যয় হয় এবং মূলধন বাবদ ব্যয় হয় 10 টাকা। ফার্মের স্থূল মূল্য সংযোজন হল 100 টাকা – 20 টাকা – 10 টাকা = 70 টাকা প্রতি বছর।

লক্ষণীয় যে, মূল্য সংযোজন গণনা করার সময় ফার্মের উৎপাদন ব্যয়কে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। কিন্তু ফার্ম তার উৎপাদনের সবটাই বিক্রি নাও করতে পারে। এইক্ষেত্রে বছরের শেষে কিছু দ্রব্য অবিক্রিত অবস্থায় মজুত থেকে যায়। উল্টোদিকে এটাও হতে পারে যে উৎপাদনের প্রথম দিকে কিছু দ্রব্য অবিক্রিত অবস্থায় থাকতে পারে। এই বছর এরকমও হতে পারে যে উৎপাদন কিছু কম হল। কিন্তু বছরের প্রথম দিকে যে মজুত ছিল তার থেকে বাজারের চাহিদাকে মেটানো যেতে পারে। কোনো ফার্মের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে সব পণ্য অবিক্রিত অবস্থায় থেকে যায় সেটার ব্যাখ্যা আমরা কীভাবে করব? এটাও মনে রাখতে হবে যে, একটি ফার্ম অন্য ফার্ম থেকে কাঁচামাল ক্রয় করতে পারে। কাঁচামালের যতটুকু উৎপাদনের কাজে ব্যবহার হয় তাকে মধ্যবর্তী বা মাধ্যমিক দ্রব্য বলে। যে অংশটুকু উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় না সেগুলোর কী হবে?

অর্থনীতিতে যে সমস্ত চূড়ান্ত দ্রব্য বা অর্ধ-চূড়ান্ত বা কাঁচামাল ফার্মের নিকট বছরের পর বছর ধরে অবিক্রিত অবস্থায় পরে থাকতে দেখা যায় সেই সমস্ত পণ্যসামগ্রীকে **ইনভেন্টরি (inventory)** বা মজুত বলা হয়। ইনভেন্টরি একটি মজুত চলক। বছরের প্রথম দিকে এর একটি মূল্য থাকে। বছরের শেষের দিকে এর মূল্য বেশিও হতে পারে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ইনভেন্টরির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। ইনভেন্টরির মূল্য বছরের শেষে হ্রাস পেলে ইনভেন্টরির পরিমাণ হ্রাস পাবে। সুতরাং, আমরা মনে করতে পারি যে, একটি ফার্মের একটি বছরে ইনভেন্টরির পরিবর্তন ≡ একটি বছরে ফার্মের উৎপাদন – ওই বছরে ফার্মের বিক্রয়।

এই '≡' চিহ্নটিকে অভিন্নতা বলা হয়। এটা সর্বদা কোনো সমীকরণের ডানদিকে বা বাদিকে যে চলকগুলো তাকে তার সাপেক্ষে গঠিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা লিখতে পারি $2 + 2 \equiv 4$, কারণ এটি সর্বদাই সত্যি। কিন্তু আবার আমরা লিখতে পারি $2 \times x = 4$ এটার কারণ x -এর একটি নির্দিষ্ট মানের 2 বার গুণ করলে 4 হয়। (যখন $x = 2$)। x-এর অন্য মানের জন্য হবে না, আমরা লিখতে পারি না $2 \times x \equiv 4$।

লক্ষণীয় বিষয় হল যে, যেহেতু ফার্মের উৎপাদন ≡ মূল্য সংযোজন + ফার্মে যেসব মধ্যবর্তী দ্রব্যে ব্যবহার করেছে – ওই বছরে ফার্ম যে সমস্ত দ্রব্য বিক্রি করেছে।

উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক একটি ফার্মের বছরের প্রথমদিকে 100 টাকার দ্রব্য অবিক্রিত অবস্থায় মজুত ছিল। এই বছর ফার্মটি 1000 টাকার দ্রব্য উৎপাদন করল এবং 800 টাকার দ্রব্য বিক্রি করল। সুতরাং, উৎপাদন ও

বিক্রির মধ্যে ব্যবধান হল 200 টাকা। সুতরাং ইনভেন্টরির পরিমাণ হল 200 টাকা এটির সঙ্গে 100 টাকার ইনভেন্টরি যোগ করলে বছরের শেষে এর পরিমাণ হয় 100 টাকা + 200 টাকা = 300 টাকা। উল্লেখ্য যে, ইনভেন্টরির পরিমাণ বছরের পর বছর পরিবর্তন হয়। সুতরাং, এটি একটি **প্রবাহী চলক**।

ইনভেন্টরিকে মূলধন হিসাবেও গণ্য করা হয়। ফার্মের অতিরিক্ত মূলধনের মজুতকে **বিনিয়োগ** বলে। সুতরাং, ফার্মের ইনভেন্টরির পরিবর্তনকে বিনিয়োগ হিসাবে ধরা হয়। তিন ধরনের বিনিয়োগ হতে পারে। প্রথমতঃ ফার্মের বছরের পর বছর ইনভেন্টরির মূল্যের যে বৃদ্ধি হয় তা ফার্মের বিনিয়োগ ব্যয় হিসাবে ধরা হয়। দ্বিতীয়তঃ দ্বিতীয় ধরনের বিনিয়োগ হল স্থির ব্যবসায়িক বিনিয়োগ যা ফার্মের মেশিন, ফ্যাক্টরি, বিল্ডিং এবং ফার্মগুলোর সমস্ত যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। সর্বশেষে বিনিয়োগটি হল বসতি নির্মাণের জন্য বিনিয়োগ যা বসবাসের ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করে।

ইনভেন্টরির পরিবর্তন পরিকল্পিত বা অপরিকল্পিত হতে পারে। বিক্রির অপ্রত্যাশিত হ্রাসের ফলে ফার্মের অবিক্রিত দ্রব্যের মজুত সৃষ্টি হয় যা আগে থেকে বোঝা যায় না। সুতরাং, এখানে **অপরিকল্পিত ইনভেন্টরি জমতে থাকে**। বিপরীত দিকে, যদি অপ্রত্যাশিতভাবে বিক্রির পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তখন **অপরিকল্পিতভাবে ইনভেন্টরির জমা অংশ নিঃশেষ হয়ে যায়**।

নিম্নের উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হল। ধরা যাক, একটি ফার্ম শার্ট উৎপাদন করে এর ফার্মের বছরটি 100টি শার্টের ইনভেন্টরি দিয়ে শুরু হল। আগামী বছর 1000 টি শার্ট উৎপাদন করল। ধরা যাক, বছরের শেষে ইনভেন্টরির পরিমাণ হবে 100। দেখা গেল যে, এই বছর শার্ট বিক্রি অপ্রত্যাশিতভাবে কমে গেল এবং মাত্র 600টি শার্ট বিক্রি হল। এর অর্থ হল, ফার্মের কাছে 400টি শার্ট অবিক্রিত অবস্থায় রয়ে গেল। সুতরাং, ফার্মের কাছে 400 + 100 = 500 টি শার্ট অবিক্রিত অবস্থায় রয়ে গেল। এই উদাহরণে 400টি শার্ট যা ইনভেন্টরি হিসাবে রয়ে গেল তা হল অপরিকল্পিত ইনভেন্টরি জমা থাকায় হিসাব। যদি অন্যদিকে, বিক্রয় যদি 1000-এর উপর হয় তাহলে অপরিকল্পিত ইনভেন্টরির পরিমাণ হ্রাস পাবে। যেমন, যদি 1050টি শার্ট বিক্রি হয়, তখন উৎপাদনের শুধুমাত্র 1000 শার্টই বিক্রি হবে না। ফার্ম তার ইনভেন্টরি থেকে আরো 50টি শার্টও বিক্রি করতে পারবে। এই ইনভেন্টরি থেকে যে 50টি শার্ট অপ্রত্যাশিতভাবে হ্রাস পেল তা অপ্রত্যাশিত ইনভেন্টরি নিঃশেষ হওয়ার উদাহরণ।

পরিকল্পিত ইনভেন্টরির জমে থাকা বা নিঃশেষ হওয়ার উদাহরণ কি হতে পারে? ধরা যাক, ফার্ম ইনভেন্টরি 100 থেকে 200 শার্ট বৃদ্ধি করতে চায় এই বছর। পূর্বের 1000 শার্ট বিক্রির পরিকল্পনা অনুযায়ী ফার্ম 1000 + 100 = 1,100 শার্ট উৎপাদন করল। যদি 1000 শার্ট সবটাই বিক্রি হয় তখন ফার্মের ইনভেন্টরির বৃদ্ধির পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। নতুন ইনভেন্টরির মজুতের পরিমাণ ধরা যাক, 200টি শার্ট যা ফার্মের আগের থেকেই পরিকল্পনা ছিল। ইনডেন্টরির এই বৃদ্ধি হল পরিকল্পিত ইনভেন্টরির জমার একটি উদাহরণ। অন্যদিকে, যদি ফার্মের ইনভেন্টরির পরিমাণ 100 থেকে 25 করা হয় তখন ফার্ম 1000 – 75 = 925টি শার্ট প্রস্তুত করবে। এর কারণ হল, ফার্ম ইনভেন্টরির 100টি শার্ট থেকে 75টি শার্ট বিক্রি করার পরিকল্পনা করল যাতে বছরের শেষে ইনভেন্টরির পরিমাণ 100 – 75 = 25-এ এসে দাঁড়ায়। যদি ফার্মটি ঠিকঠিকই 1000টি শার্ট বিক্রি করতে পারে তাহলে ফার্মটির পরিকল্পনা অনুযায়ী 25টি শার্ট ইনভেন্টরি হিসাবে রেখে দিতে পারবে।

ইনভেন্টরির পরিকল্পিত ও অপরিকল্পিত পরিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে গেলে আরো অনেক কিছু বলতে হবে, যা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে ব্যাখ্যা করা যাবে।

ইনভেন্টরির পরিবর্তনের জ্ঞান থেকে আমরা লিখতে পারি।

ফার্ম i -এর স্থূল মূল্য সংযোজন $(GVAi) \equiv i$ ফার্মের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর স্থূল আর্থিক মূল্য (Qi)

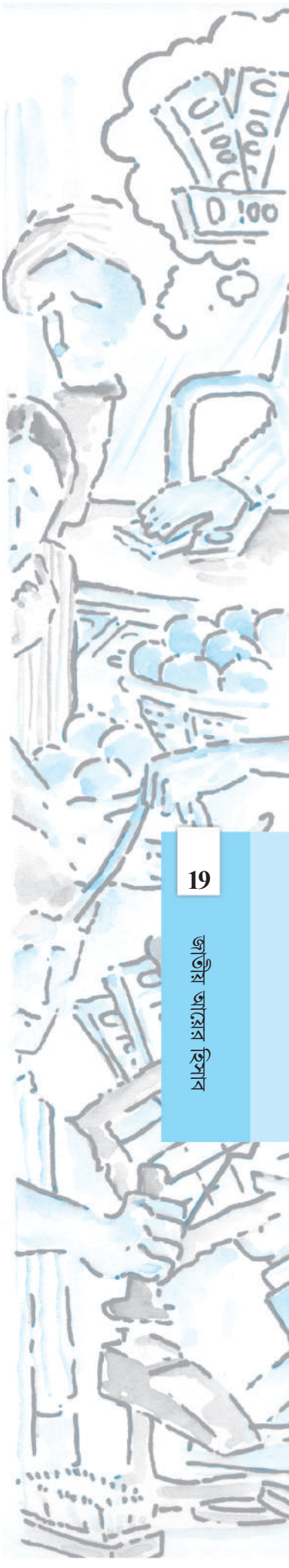

– ফার্ম যে মধ্যবর্তী দ্রব্য ব্যবহার করেছে তার আর্থিক মূল্য (Zi)

অর্থাৎ, $GV\ Ai \equiv$ ফার্মের বিক্রয়মূল্য (Vi) + ইনভেন্টরির পরিবর্তনের মূল্য (Ai) – ফার্মের মধ্যবর্তী দ্রব্যের মূল্য (Zi) (2.1)

(2.1) নং সমীকরণটি নিম্নলিখিতভাবে নির্ণয় করা যেতে পারে : কোনো একটি বছরে একটি ফার্মের ইনভেন্টরির পরিবর্তন ≡ একটি বছরে ফার্মের উৎপাদন – ওই বছরে ফার্মের বিক্রয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, ফার্মের বিক্রির মধ্যে শুধুমাত্র দেশীয় ক্রেতাদের কাছে দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি করাকে বোঝায় না, বিদেশের ক্রেতাদের কাছেও বিক্রি করাকে বোঝায় (রপ্তানি)। এটা মনে রাখতে হবে যে, উপরের আলোচ্য সমস্ত চলকগুলোই প্রবাহী চলক। স্বভাবতই এইগুলো বছরে হিসাব করা হয়। সুতরাং, প্রতি বছর প্রবাহগুলোর মূল্য পরিমাপ করা হয়।

i ফার্মের নিট মূল্য সংযোজন $\equiv GVAi - i$ ফার্মের অবচয় (Di)

যদি কোনো একটি দেশের একটি বছরে সমস্ত ফার্মের স্থূল মূল্য সংযোজন যোগ করি, তাহলে আমরা ওই বছরের সমস্ত দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর মোট আর্থিক মূল্য পরিমাপ করতে পারি (ঠিক যেমন আমরা গম-পাউরুটির উদাহরণটির ক্ষেত্রে দেখেছিলাম)। এই ধরনের হিসাবকে বলে **স্থূল জাতীয় উৎপাদন (GDP)**। সুতরাং, GDP ≡ অর্থনীতিতে সমস্ত ফার্মের স্থূল মূল্য সংযোজনের যোগফল

$$\equiv GVA_1 + GVA_2 + \ldots.. + GVA_N$$

সুতরাং,

$$\text{GDP} \equiv \sum_{i=1}^{N} GVA_i \qquad (2.2)$$

এই, $\sum$ চিহ্নটি যোগফল বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। ধরা যাক, তিনজন ছাত্রের পকেটে যথাক্রমে 200 টাকা, 250 টাকা এবং 350 টাকা আছে। আমরা বলতে পারি, যদি i -তম ছাত্রের X_i নগদ অর্থ থাকে। তখন, $X_1 = 200, X_2 = 250, X_3 = 300$। পকেটের মোট নগদ অর্থ হবে $X_1 + X_2 + X_3$। যোগফলের চিহ্নটিকে সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা যায় যে : $X_1 + X_2 + X_3$ কে লেখা যায় $\sum_{i=1}^{3} X_i$, যার অর্থ হল, তিনজনের প্রত্যেকের যথাক্রমে X -এর তিনটি মান যাকে এবং তিনজনের হাতের মোট টাকাকে X এর মানের যোগফলকে প্রকাশ করে। অর্থবিদ্যায় আমরা যখন সামগ্রিকভাবে আলোচনা করি তখন এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, একটি দেশে 1000 জন ভোক্তা আছে। যাদের ভোগ ব্যয় $c_1, c_2, \ldots., c_{1000}$। যোগফলের এই চিহ্নটি আমাদের সংক্ষিপ্ত আকারে লিখতে সাহায্য করে। আমরা যেহেতু 1 থেকে 1000 জন প্রত্যেকের ভোগ ব্যয়ের আর্থিক মূল্য যোগ করতে চাই, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির (i) ভোগব্যয়ের আর্থিক

মূল্য যদি c_i ধরা হয়, তাহলে সামগ্রিক ভোগব্যয় হবে $C = \sum_{i=1}^{1000} c_i$

সাধারণত, 1 থেকে n সংখ্যক লোকের x_i দ্রব্যের মোট যোগফলকে প্রকাশ করা যায় নিম্নলিখিতভাবে : $\sum_{i=1}^{n} x_i$.

2.2.2 ব্যয় পদ্ধতি (Expenditure Method)

GDP হিসাব করার আরেকটি বিকল্প পদ্ধতি হল উৎপাদনের চাহিদার দিকটি বিবেচনা করা। এই পদ্ধতি ব্যয় পদ্ধতি হিসাবেও পরিচিত। কৃষক-বেকারির উদাহরণটি যা আমরা প্রথমে আলোচনা করেছি। সেইভাবে দেশের সামগ্রিক দ্রব্য সামগ্রীর আর্থিক মূল্য ব্যয় পদ্ধতিতে নিম্নলিখিতভাবে হিসাব করতে পারি। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক ফার্মের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর চূড়ান্ত খরচ যোগ করা হয়। চূড়ান্ত খরচের হিসাব নির্ণয় করার সময় মধ্যবর্তী দ্রব্যের খরচ অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। বেকারি কৃষক থেকে যে 50 টাকার গম ক্রয় করে, তা ফার্মের মধ্যবর্তী দ্রব্যের জন্য খরচ হিসাবে বিবেচিত হয়। সুতরাং এটি চূড়ান্ত খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না। সুতরাং, প্রতি বছর দেশের সামগ্রিক দ্রব্যের চূড়ান্ত মূল্য হল 200 টাকা (বেকারির চূড়ান্ত ব্যয়) + 50 টাকা (কৃষকের চূড়ান্ত ব্যয়) = 250 টাকা।

ফার্ম i -এর চূড়ান্ত ব্যয় হিসাব করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয় : (a) ফার্ম যে সমস্ত দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন করে তার চূড়ান্ত ভোগ ব্যয়কে C_i দ্বারা চিহ্নিত করা হল। সাধারণত দেখা যায় যে, পরিবারই (ভোগ) ব্যয়ের জন্য বেশি খরচ করে। তবে এরও কিছু ব্যতিক্রম আছে যখন ফার্মগুলো তাদের অভ্যাগত অথবা তাদের শ্রমিকদের ভোগের জন্য খরচ করে। (b) ফার্ম i থেকে অন্য ফার্মগুলো যে মূলধনী দ্রব্য ক্রয় করে তার জন্য চূড়ান্ত বিনিয়োগ ব্যয় (I_i)। লক্ষণীয় যে, মধ্যবর্তী দ্রব্যের খরচ যেন GDPতে অন্তর্ভুক্ত না হয় এবং বিনিয়োগ জনিত ব্যয় GDPতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। কারণ, বিনিয়োগজনিত দ্রব্য ফার্মের কাছে থাকে, অন্যদিকে মধ্যবর্তী দ্রব্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিঃশেষ হয়ে যায়। (c) সরকার i ফার্মের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা সামগ্রী ক্রয় করতে খরচ করে। আমরা একে G_i দ্বারা প্রকাশ করি। লক্ষণীয় বিষয় যে সরকারের চূড়ান্ত খরচের মধ্যে ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় অন্তর্ভুক্ত হয়। (d) i ফার্ম বিদেশে দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি করে যে রপ্তানি আয় উপার্জন করে তাকে X_i দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

সুতরাং, i ফার্মের মোট আয় উপার্জনকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে লিখতে পারি :

$RV_i \equiv$ ফার্ম i মোট ভোগব্যয়, বিনিয়োগ ব্যয়, সরকারি ব্যয় এবং মোট রপ্তানির যোগফল বাবদ যা সংগ্রহ করে

$$\equiv C_i + I_i + G_i + X_i$$

যদি অর্থনীতিতে N সংখ্যক ফার্ম থাকে তখন সমস্ত ফার্মগুলোর হিসেবকে যোগ করে পাই,

$\sum_{i=1}^{N} RV_i \equiv$ অর্থনীতিতে সমস্ত ফার্মের মোট প্রাপ্ত ভোগ ব্যয়, বিনিয়োগ ব্যয়, সরকারি ব্যয় ও রপ্তানি মূল্যের যোগফল

$$\equiv \sum_{i=1}^{N} C_i + \sum_{i=1}^{N} I_i + \sum_{i=1}^{N} G_i + \sum_{i=1}^{N} X_i \qquad (2.3)$$

ধরা যাক, দেশের সামগ্রিক ভোগ ব্যয় হল C। লক্ষণীয় যে, C -এর একটি অংশ ভোগ্য দ্রব্য আমদানিতে ব্যয় হয়। সুতরাং, $C = \sum_{i=1}^{N} C_i + C_m$ । ধরা যাক, C_m হল ভোগ্য দ্রব্যের আমদানিজনিত ব্যয়। সুতরাং,

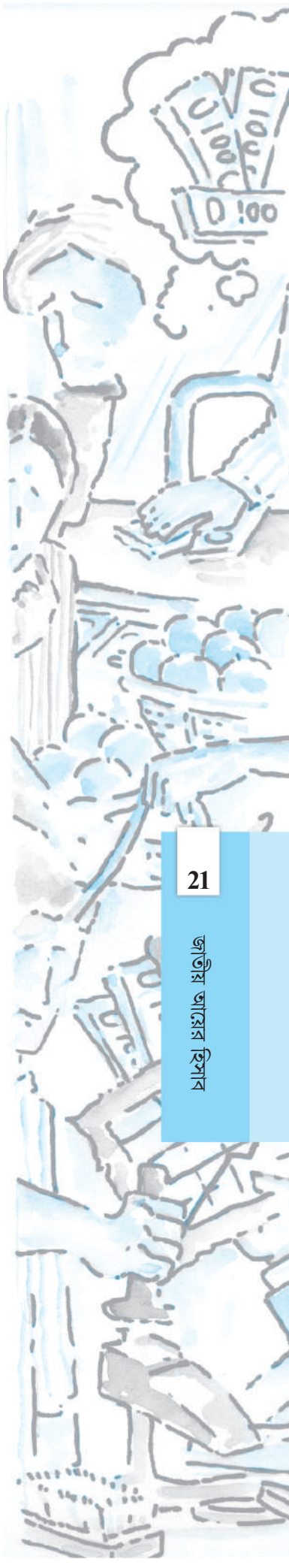

$C - C_m$ হল সামগ্রিক ভোগ ব্যয়ের একটা অংশ যা দেশীয় ফার্মের জন্য ব্যয় করা হয়। একইরকমভাবে $I - I_m$ হল সামগ্রিক চূড়ান্ত বিনিয়োগ ব্যয়ের একটি অংশ যা দেশীয় ফার্মের জন্য ব্যয় হয়, যেখানে I হল দেশের সামগ্রিক চূড়ান্ত বিনিয়োগ ব্যয়ের আর্থিক মূল্য এবং এর একটি অংশ বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য ব্যয় হয়। একইরকমভাবে $G - G_m$ হল সামগ্রিক চূড়ান্ত সরকারি ব্যয়ের একটা অংশ যা দেশীয় শিল্পের জন্য ব্যয় হয়। এখানে G হল দেশের সামগ্রিক সরকারি ব্যয় এবং তার মধ্যে G_m আমদানির জন্য ব্যয়কে নির্দেশ করে।

সুতরাং, $\sum_{i=1}^{N} C_i \equiv$ দেশের সকল ফার্মের চূড়ান্ত ভোগ ব্যয়ের যোগফল $\equiv C - C_m$; $\sum_{i=1}^{N} I_i \equiv$ দেশের অর্থনীতির সকল ফার্মের চূড়ান্ত বিনিয়োগ ব্যয়ের যোগফল $\equiv I - I_m$; $\sum_{i=1}^{N} C_i \equiv$ অর্থনীতির সকল ফার্মের চূড়ান্ত সরকারি ব্যয়ের যোগফল $\equiv G - G_m$. এইগুলো (2.3) সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$\sum_{i=1}^{N} RV_i \equiv C - C_{\mathrm{m}} + I - I_{\mathrm{m}} + G - G_{\mathrm{m}} + \sum_{i=1}^{N} X_i$$

$$\equiv C + I + G + \sum_{i=1}^{N} X_i - (C_{\mathrm{m}} + I_{\mathrm{m}} + G_{\mathrm{m}})$$

$$\equiv C + I + G + X - M$$

এখানে, $X \equiv \sum_{i=1}^{N} X_i$ হল অর্থনীতিতে রপ্তানির জন্য বিদেশীদের সামগ্রিক ব্যয়। $M \equiv C_{\mathrm{m}} + I_{\mathrm{m}} + G_{\mathrm{m}}$ হল অর্থনীতির সামগ্রিক আমদানিজনিত ব্যয়।

আমরা জানি, GDP $\equiv$ দেশের সকল ফার্মের চূড়ান্ত ব্যয়।

অন্যভাবে বলা যায়,

$$\text{GDP} \equiv \sum_{i=1}^{N} RV_i \equiv C + I + G + X - M \qquad (2.4)$$

(2.4) নং সমীকরণের মাধ্যমে GDP কে ব্যয় পদ্ধতিতে পরিমাপ করা যায়।

এটি উল্লেখ করতে হবে যে, সমীকরণের ডানদিকের চলকগুলোর মধ্যে বিনিয়োগজনিত ব্যয় (I) সবচেয়ে অস্থিতিশীল।

2.2.3 আয় পদ্ধতি

আমরা আগেই দেখেছি যে, উৎপাদনের উপকরণগুলো একত্রে যে আয় উপার্জন করে তা দেশের চূড়ান্ত ব্যয়ের যোগফলের সমান হয় (চূড়ান্ত ব্যয় হল চূড়ান্ত দ্রব্যের জন্য খরচ। এখানে মধ্যবর্তী দ্রব্যের জন্য যে ব্যয় হয় তা আয় পদ্ধতিতে গণনায় আসে না)। একটি সাধারণ ধারণা থেকে বোঝা যায় যে সমস্ত ফার্মগুলো যে আয় উপার্জন করে তা সমস্ত উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে বেতন, মজুরি, সুদ ও খাজনা হিসাবে বণ্টিত হয়। ধরা যাক, একটি অর্থনীতিতে M সংখ্যক কিছু পরিবার আছে। W_i হল কোনো একটি বছরে i-তম পরিবারের স্থূল মুনাফা হল P_i । সুদকে In_i ও খাজনাকে R_i দ্বারা প্রকাশ করা হল। সুতরাং,

$$\text{GDP} \equiv \sum_{i=1}^{M} W_i + \sum_{i=1}^{M} P_i + \sum_{i=1}^{M} In_i + \sum_{i=1}^{M} R_i \equiv W + P + In + R \qquad (2.5)$$

এখানে, $\sum_{i=1}^{M} W_i \equiv \mathrm{W}$, $\sum_{i=1}^{M} P_i \equiv \mathrm{P}$, $\sum_{i=1}^{M} In_i \equiv \mathrm{In}$ এবং $\sum_{i=1}^{M} R_i \equiv \mathrm{R}$.

(2.2), (2.4) এবং (2.5) সমীকরণ তিনটিকে একসাথে নিয়ে পাই

$$\text{GDP} \equiv \sum_{i=1}^{N} GV A_i \equiv C + I + G + X - M \equiv W + P + In + R \qquad (2.6)$$

(2.6) নং সমীকরণে I হল ফার্মগুলোর পরিকল্পিত ও অপরিকল্পিত বিনিয়োগ ব্যয়ের সমন্বয়।

(2.2), (2.4) এবং (2.6) সমীকরণগুলো একই চলকের অর্থাৎ GDP-র, বিভিন্ন রূপরেখা যা 2.2 রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি।

একটি গাণিতিক উদাহরণের সাহায্যে আমরা দেখে নেব কীভাবে GDP হিসাব করার তিনটি পদ্ধতি একই উত্তর দেয়।

উদাহরণ : ধরা যাক, A এবং B দুটি ফার্ম আছে। ধরা যাক, ফার্ম A কোনো ধরণের কাঁচামাল ব্যবহার করে না এবং 50 টাকার তুলা উৎপাদন করে। A তুলা বিক্রি করে B-এর নিকট এবং B এই তুলা দিয়ে বস্ত্র উৎপাদন করে। B এই বস্ত্র বাজারে মানুষের কাছে 200 টাকা দিয়ে বিক্রি করে।

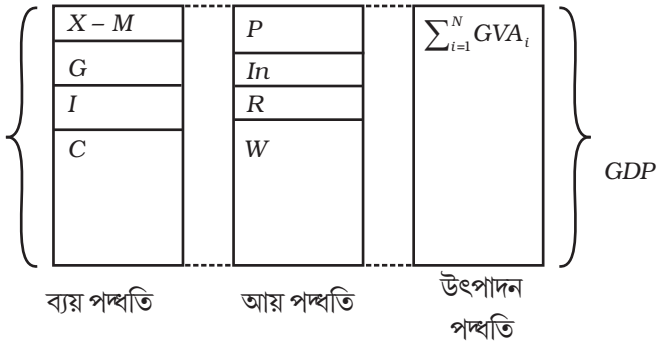

চিত্র 2.2: GDP হিসাব করার তিনটি পদ্ধতির রেখাচিত্রের সাহায্যে উপস্থাপন।

1. উৎপাদনের ধাপে GDP বা মূল্য সংযোজন পদ্ধতি :

আমরা জানি, মূল্য সংযোজন (VA) = বিক্রয় – মাধ্যমিক দ্রব্য

সুতরাং,

$$VA_A = 50 - 0 = 50$$
$$VA_B = 200 - 50 = 150$$

সুতরাং, $GDP = VA_A + VA_B = 200.$

সারণি **2.2:** ফার্ম **A** ও **B**-এর মধ্যে **GDP**-র বণ্টন

	ফার্ম A	ফার্ম B
বিক্রয়	50	200
মধ্যবর্তী দ্রব্যের ভোগ	0	50
মূল্য সংযোজন	50	150

2. বিন্যস্তকরণের ধাপে বা ব্যয় পদ্ধতিতে GDP :

আমরা জানি GDP = চূড়ান্ত ভোগের যোগফল বা অন্তিম ব্যবহারের জন্য দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর জন্য ব্যয়। উপরের উদাহরণে, চূড়ান্ত ব্যয় হলো ভোক্তার বস্ত্রের জন্য ব্যয়। সুতরাং, GDP = 200।

3. বণ্টনের পর্যায়ে GDP বা আয় পদ্ধতি :

ফার্ম A ও B-এর দিকে আবার ফিরে দেখা যেতে পারে।

ফার্ম A যে 50 টাকা পেল, তার থেকে 20 টাকা শ্রমিকের মজুরি প্রদান করা হল এবং মুনাফা হিসাবে 30 টাকা রেখে দিল। একইভাবে, ফার্ম B শ্রমিকের মজুরি বাবদ 60 টাকা খরচ করল এবং 90 টাকা মুনাফা হিসাবে রেখে দিল।

সারণি **2.3:** ফার্ম **A** ও **B**-এর উপকরণের আয় বণ্টন

	ফার্ম A	ফার্ম B
মজুরিসমূহ	20	60
মুনাফাসমূহ	30	90

মনে করি, আয় পদ্ধতিতে GDP = উৎপাদনের সমস্ত উপকরণের আয় যা মোট মজুরির (A ও B ফার্মের সমস্ত শ্রমিকের) এবং মোট মুনাফার (A ও B ফার্মের) সমান[4], অর্থাৎ, 80 + 120 = 200।

2.2.4 উপকরণ ব্যয়, মূল দাম এবং বাজার দাম

ভারতে জাতীয় আয় হিসাব করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হল উৎপাদন ব্যয়ে GDP পরিমাপ (GDP at factor cost)। ভারত সরকারের সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল অফিস (CSO) উপকরণ ব্যয়ে এবং বাজার মূল্যে GDP-এর হিসাব করে। 2015 সালের জানুয়ারি মাসের সংশোধনীতে CSO উপকরণ ব্যয়ে GDP-এর পরিবর্তে মূল দামে GVA এবং বাজার দামে GDP কে হিসাব করা হয়েছে এবং এখন এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসাব পদ্ধতি বলে বিবেচিত হচ্ছে।

GVA -এর ধারণাটি আগেই আলোচিত হয়েছে। দেশে যে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয় তার মূল্য থেকে মাধ্যমিক দ্রব্যের ব্যবহারের জন্য যে ব্যয় হয় তা বাদ দিলে GVA পাওয়া যায় (দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের জন্য যে দ্রব্য ব্যবহৃত হয় এবং যা চূড়ান্ত ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয় না)। এখানে আমরা মূল দামের বিষয়টি আলোচনা করব। উপকরণ ব্যয়, মূল দাম এবং বাজার দামের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা **নিট উৎপাদন শুল্ক** (উৎপাদন শুল্ক - উৎপাদনের ভর্তুকি) এবং নিট উৎপাদিত **দ্রব্য** শুল্ক (দ্রব্যে শুল্ক - দ্রব্যে ভর্তুকি)-এর পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে উৎপাদন শুল্ক এবং ভর্তুকি দেওয়া-নেওয়া নির্ভর করে উৎপাদনের উপর। উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। যেমন, জমি থেকে রাজস্ব সংগ্রহ, স্ট্যাম্প ও রেজিস্ট্রেশন ফি। অন্যদিকে, দ্রব্যের প্রতি এককের উপর ভিত্তি করে উৎপাদিত দ্রব্যের শুল্ক এবং ভর্তুকি নির্ধারিত হয়, যেমন আবগারি শুল্ক, সেবা কর, আমদানি ও রপ্তানি কর ইত্যাদি। উৎপাদনের উপকরণের জন্য যে ব্যয় হয় তা কেবলমাত্র উপকরণ ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত এটার মধ্যে কোনো রকম কর যুক্ত হয় না। উপকরণ ব্যয়ের যোগফল থেকে মোট ভর্তুকি বাদ দিলে বাজার দাম জানা যায়। উৎপাদন ভর্তুকি বাদ দিয়ে উৎপাদন শুল্ক বা রাজস্ব মূল দামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় কিন্তু উৎপাদিত দ্রব্য কর (ভর্তুকির পরিমাণ বাদ দিয়ে) মূল দামের মধ্যে যুক্ত হয় না। সুতরাং, বাজার দাম জানতে গেলে উৎপাদিত দ্রব্যের কর মূল দামের সঙ্গে যোগ করতে হয়।

আগেই বলা হয়েছে, তখন CSO মূল দাম থেকে GVA কে অব্যাহতি দিয়েছে। সুতরাং এটার মধ্যে নিট উৎপাদন শুল্ক যুক্ত হয় কিন্তু নিট উৎপাদিত দ্রব্য শুল্ক যুক্ত হয় না। বাজার দামে GDP-এর পরিমাপ করার সময় আমাদের মূল দামে GVA-এর সঙ্গে নিট উৎপাদিত দ্রব্য শুল্ক যোগ করতে হয়। সুতরাং,

উপকরণ ব্যয়ে GVA + নিট উৎপাদন শুল্ক = মূল দামে GVA

মূল দামে GVA + নিট উৎপাদিত দ্রব্যের কর = বাজার দামে GVA।

এই অধ্যায়ের শেষে 2.5 নং সারণিতে বাজার দামে GDP এবং মূল দামে GVA -এর চিত্রটি পেশ করা হল, যেখানে 2.6 নং সারণিতে ব্যয়ের দিক থেকে GDP -এর গঠন দেখানো হল।

[4] এই উদাহরণে, আমরা খাজনা ও সুদরূপে ফ্যাক্টর পেমেন্টগুলো হিসাবের বাইরে রেখেছি। কিন্তু এর প্রভাবে মৌলিক ফলাফলে কোনো পার্থক্য হবে না। এর কারণ হল, মজুরি প্রদানের পর ফার্মের অবশিষ্ট মূল্য সংযোজন খাজনা, সুদ এবং মুনাফার (সম্মিলিতভাবে অপারেটিং সারপ্লাস বলে) মধ্যে বণ্টিত হবে।

2.3 সামষ্টিক অর্থনীতির কিছু বিষয়

দেশের অভ্যন্তরে একটি নির্দিষ্ট সময়ে (বছরে) যে সকল দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদিত হয় তা মোট দেশীয় উৎপাদন (Gross Domestic Product) দ্বারা পরিমাপ করা হয়। তবে উৎপাদনের সবটাই দেশের সমস্ত নাগরিকের নাও হতে পারে। যেমন, দেশের এক নাগরিক যে সৌদি আরবে কাজ করে সেটি তার নিজস্ব মজুরি বা আয় এবং এটা সৌদি আরবের GDP তে অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু তিনি একজন ভারতীয় নাগরিক। বিদেশে ভারতীয়দের উপার্জন বা ভারতীয় মালিকানাধীন উৎপাদন কোথায় যোগ হবে তা জানার কোনো উপায় আছে কি? সাম্যতা বজায় রাখার জন্য আমরা বিদেশীদের আয়, যারা আমাদের দেশে কাজ করে বা বিদেশীরা যারা বিভিন্ন উৎপাদনের উপকরণের মালিক এবং তার জন্য যে আয় উপার্জন করে, তা আমরা জাতীয় আয়ের হিসাব থেকে বাদ দিই। যেমন, কোরিয়ার মালিকানাধীন হুণ্ডাই গাড়ি কারখানা যে মুনাফা অর্জন করে তা ভারতের GDP গণনা করার সময় হিসাব থেকে বাদ দিতে হয়। সামষ্টিক অর্থনীতির এই যোগ ও বিয়োগের হিসাবকে মোট জাতীয় উৎপাদন (**Gross National Product**) বলে। সুতরাং,

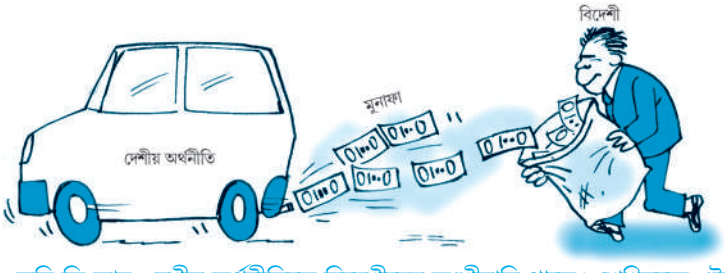

তুমি কি জান, দেশীয় অর্থনীতিতে বিদেশীদের অংশীদারি থাকে। শ্রেণিকক্ষে এই বিষয়ে আলোচনা করো।

GNP ≡ GDP + দেশের যে সমস্ত উৎপাদনের উপকরণ বিদেশে নিয়োজিত হয়ে আয় উপার্জন করে — দেশের অভ্যন্তরে বিদেশীরা যে আয় উপার্জন করে।

সুতরাং, GNP ≡ GDP + বিদেশ থেকে নিট উপকরণ আয়

(বিদেশ থেকে নিট উপকরণ আয় = দেশের যে সমস্ত উৎপাদনের উপকরণ বিদেশ থেকে আয় উপার্জন করে — দেশের অভ্যন্তরে বিদেশীরা যে আয় উপার্জন করে)।

আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি যে, মূলধনের একটা অংশ বছরে ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ব্যয় হয়। এই ক্ষয়ক্ষতি পূরণ বাবদ ব্যয়কে অবচয়জনিত ব্যয় (depreciation) বলে। স্বভাবতই, অবচয়জনিত ব্যয় কারোর আয় হতে পারে না। যদি আমরা GNP থেকে অবচয়জনিত ব্যয় বাদ দিই তাহলে যে আয় পাওয়া যায় তাকে নিট দেশীয় উৎপাদন (**Net National Product** বা **NNP**) বলে। এইভাবে লেখা যায়,

NNP ≡ GNP – অপচয়জনিত ব্যয়।

এইটি উল্লেখ করতে হবে যে, সমস্ত চলকই বাজার দামে হিসাব করা হয়। উপরের ধারণা থেকে আমরা বাজার দামে NNP-এর হিসাব নির্ণয় করতে পারি। কিন্তু বাজার দামের মধ্যে **পরোক্ষ কর** অন্তর্ভুক্ত থাকে। যখন দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর উপর পরোক্ষ কর আরোপিত হয় তখন ওই সমস্ত জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি পায়। পরোক্ষ কর সরকারের হাতে চলে যায়। NNP -এর সেই অংশটি যা উৎপাদনের উপকরণ থেকে আদায় করা হয় তা গণনা করতে আমাদের বাজার মূল্যে NNP থেকে পরোক্ষ কর বাদ দিতে হয়। ঠিক একই রকম ভাবে, সরকার কিছু দ্রব্যের দামের উপর **ভর্তুকি** চাপিয়ে দেয় (ভারতে পেট্রোলের উপর সরকার অনেক কর চাপায়, যেখানে রান্নার গ্যাসের ক্ষেত্রে ভর্তুকি দেওয়া হয়)। সুতরাং বাজার দামে NNP -এর সঙ্গে ভর্তুকি যোগ করা হয়। এটাকে বলে উপকরণ ব্যয়ে নিট জাতীয় উৎপাদন (**Net National Product at factor cost** বা **National Income**)।

সুতরাং, উপকরণ ব্যয়ে NNP ≡ জাতীয় আয় (NI) ≡ বাজার মূল্যে NNP – নিট পরোক্ষ কর (নিট পরোক্ষ কর ≡ পরোক্ষ কর – ভর্তুকি)।

আমরা জাতীয় আয়ের হিসাবকে আরো ছোটো ছোটো ভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি। এখন আমরা জাতীয় আয়ের ওই অংশটি নিয়ে আলোচনা করব যা পরিবারবর্গ উপার্জন করে। আমরা তাকে **ব্যক্তিগত আয় (Personal Income বা PI)** বলব। প্রথমতঃ জাতীয় আয়ের একটা অংশ যা ফার্ম এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো উপার্জন করে, যাদের মুনাফা উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে বণ্টন করা হয় না তাকে **অবণ্টিত মুনাফা (Undistributed Profits বা UP)** বলা হয়। PI-এর মান নির্ণয় করার সময় NI থেকে UP বাদ দিতে হয়। যেহেতু UP পরিবারের মধ্যে বণ্টিত হয় না। অনুরূপভাবে, কর্পোরেট রাজস্ব বা শুল্ক ফার্মের উপার্জনের উপর আরোপিত হয় এবং NI থেকে বাদ দিতে হয়। কারণ এটিও পরিবারের হাতে পৌঁছায় না। অন্যদিকে, পরিবারগুলো ব্যক্তিগত মালিকানায় ফার্ম বা সরকারকে ঋণ দিয়ে সাহায্য করেছিল, তার বিনিময়ে পরিবারগুলো সুদ উপার্জন করে এবং উল্টোদিকে পরিবারকেও ফার্ম ও সরকারকে সুদ প্রদান করতে হয় যদি পরিবারগুলো ফার্ম ও সরকার থেকে ঋণ নিয়ে থাকে। সুতরাং পরিবারগুলো ঋণের বিনিময়ে ফার্ম ও সরকারকে যে সুদ দিয়েছিল সেটা আমাদের বাদ দিতে হয়। পরিবারগুলো সরকার ও ফার্ম থেকে যে হস্তান্তর আয় অর্জন করে (যেমন : পেনশন, স্কলারশিপ, পুরস্কার) যা পরিবারের নিজস্ব আয়ের সঙ্গে যোগ করতে হয়।

এইভাবে, ব্যক্তিগত আয় (PI) ≡ NI – অবণ্টিত মুনাফা **– পরিবার যে সুদ প্রদান করে – কর্পোরেট শুল্ক + ফার্ম ও সরকার থেকে হস্তান্তর আয় যা পরিবারে আসে।**

যাই হোক, পরিবারকে তাদের ব্যক্তিগত আয় থেকে কর দিতে হয়। যদি আমরা ব্যক্তিগত কর (যেমন : আয়কর) এবং অ-কর প্রদানসমূহ (যেমন : ফাইন) ব্যক্তিগত আয় থেকে বাদ দিলে ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয় পাওয়া যায়। এইভাবে আমরা পাই,

ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয় (PDI) ≡ PI – ব্যক্তিগত কর প্রদান – অ-কর দেনা।

ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয় সামগ্রিক আয়ের একটা অংশ যা পরিবারগুলোর নিকট থাকে। তারা এই আয়ের একটা অংশ ভোগ করার জন্য রেখে দেয় এবং বাকিটা সঞ্চয় করে। 2.3 রেখাচিত্রে আমরা সামষ্টিক অর্থনীতির কিছু কিছু বিশিষ্ট চলকের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

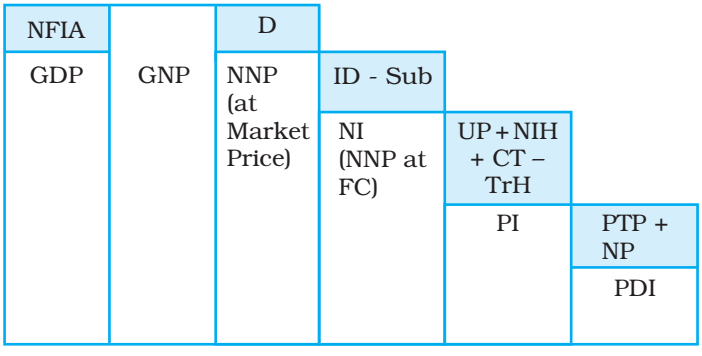

চিত্র 2.3: সামগ্রিক আয়ের বিভিন্ন উপভাগগুলোর রেখাচিত্রের মাধ্যমে বর্ণনা। NFIA: বিদেশ থেকে নিট উপকরণ আয়, D: অবচয়জনিত ব্যয়, ID: পরোক্ষ কর, Sub: ভর্তুকি, UP: অবণ্টিত মুনাফা, NIH: পরিবারগুলোকে নিট সুদ প্রদান, CT: কর্পোরেট কর, TrH: পরিবারগুলোর হস্তান্তর পাওনা, PTP: ব্যক্তিগত কর প্রদান, NP: অ-কর পেমেন্ট।

জাতীয় ব্যয়যোগ্য আয় এবং বেসরকারি আয়

এই সকল সামষ্টিক অর্থনীতির চলকগুলো ছাড়াও ভারতে আরো কিছু সামগ্রিক আয়ের ভাগ আছে, যেগুলো জাতীয় আয়ের হিসাব করতে ব্যবহৃত হয়।

- **জাতীয় ব্যয়যোগ্য আয়** = বাজার দামে নিট জাতীয় উৎপাদন + বহির্বিশ্ব থেকে অন্যান্য হস্তান্তর পাওনা।

দেশের নিয়ন্ত্রণে যে সমস্ত দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী আছে তার একটি হিসাব পাওয়া যায় জাতীয় ব্যয়যোগ্য

আয়ের ধারণা থেকে। বাকি দেশ থেকে যা হস্তান্তর পাওনা হিসাবে পাওয়া যায় তার মধ্যে আছে উপহার, সাহায্য ইত্যাদি।

- **বেসরকারি আয়** = বেসরকারি ক্ষেত্রে উপকরণ আয় থেকে অর্জিত নিট দেশজ উৎপাদন + জাতীয় ঋণে সুদ + বিদেশ থেকে নিট উপকরণ আয় + সরকার থেকে বর্তমান হস্তান্তর আয় বাবদ পাওনা + বিদেশ থেকে অন্যান্য নিট হস্তান্তর আয় বাবদ পাওনা।

সারণি 2.4: মৌলিক জাতীয় আয়ের সমষ্টিসমূহ[5]

1.	**বাজার দামে মোট দেশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product at Market Prices (GDP_{MP})**	• একটি বছরে একটি দেশের অভ্যন্তরে যে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা উৎপাদিত হয় বাজার দামে তার আর্থিক মূল্যকে GDP বলে। • দেশের জনসাধারণ বা দেশে কর্মরত বিদেশী নাগরিকরা যে সমস্ত দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন করে তা জাতীয় আয়ের হিসাবের সময় অন্তর্ভুক্ত করতে হয় এবং সেই উৎপাদন দেশজ কোনো স্থানীয় বা বিদেশে অবস্থিত কোম্পানির অধীনে হতে হবে। • সকল দ্রব্য সামগ্রী বাজার দামে মূল্যায়ন করতে হবে $GDP_{MP} = C + I + G + X - M$
2.	**উপকরণ দামে GDP (GDP at Factor Cost (GDP_{FC})**	• বাজার দামে মোট দেশজ উৎপাদন থেকে নিট উৎপাদন কর বাদ দিলে উপকরণের দামে GDP পাওয়া যায়। • বাজার দাম বলতে সেই দামকে বোঝায় যা ভোগকারীরা প্রদান করে। বাজার দামে উৎপাদন কর ও ভর্তুকি যোগ করা হয়। উপকরণ ব্যয় বলতে উৎপাদকরা উৎপন্ন দ্রব্যের যে মূল্য পায় তাকে বোঝায়। সুতরাং, বাজার দাম থেকে নিট পরোক্ষ কর বাদ দিলে উপকরণ ব্যয় পাওয়া যায়। একটি দেশের অভ্যন্তরে এক বছরে উৎপাদিত সকল প্রকার দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য পরিমাপ করা হয়। $GDP_{FC} = GDP_{MP} - NIT$
3.	**বাজার দামে নিট দেশজ উৎপাদন (Net Domestic Product at Market Prices বা NDP_{MP})**	• বর্তমান GDP -এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে একটি দেশ কতখানি খরচ করবে তা হিসাব করার জন্য নীতি নির্ধারকরা এই উপায়কে ব্যবহার করে। যদি একটি দেশ মূলধন বাবদ যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা যদি পুনরুদ্ধার না করতে পারে তাহলে GDP হ্রাস পায়। $NDP_{MP} = GDP_{MP} - Dep.$
4.	**উপকরণ ব্যয়ে NDP (Net Domestic Product at Factor Cost বা NDP_{FC})**	• দেশের অন্তর্গত উৎপাদনের উপকরণগুলো মজুরি, মুনাফা, খাজনা ও সুদ ইত্যাদি বাবদ যে আয় উপার্জন করে তাকে উপকরণ ব্যয়ে NDP বলে। $NDP_{FC} = NDP_{MP}$ – নিট উৎপাদিত দ্রব্যে শুল্ক – নিট উৎপাদন শুল্ক।

[5]অন্যান্য সংস্থার অংশীদারিত্বে রাষ্ট্রসংঘের ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টস (SNA2008) পদ্ধতির প্রয়োগ করে পৃথিবীর দেশগুলো এখন নতুন সমষ্টিগত পরিমাণ নির্ধারণ করছে। ভারতবর্ষ কয়েক বছর আগে এই সমষ্টিগত পরিমাণে বদল আনে।

5.	বাজার দামে মোট জাতীয় উৎপাদন (**Gross National Product at Market Prices** বা **GNP_{MP}**)	• সাধারণত এক বছরে দেশের জনসাধারণ যে সমস্ত দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্যকে GNP_{MP} বলে এবং বাজার দামে তা পরিমাপ করা হয়। • দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে বসবাসকারী সকল নাগরিক দ্বারা উৎপাদিত পণ্য ও সেবার আর্থিক মূল্যকে GNP বলা হয়। • সবকিছু বাজার দামে পরিমাপ করা হয়। $GNP_{MP} = GDP_{MP} + NFIA$
6.	উপকরণ ব্যয়ে **GNP** (**GNP at Factor Cost** বা **GNP_{FC}**)	• সাধারণত এক বছরে দেশের উৎপাদনের উপকরণগুলো দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করে তার বিনিময়ে যা উপার্জন করে তার আর্থিক মূল্যকে GNP_{FC} দ্বারা পরিমাপ করা হয়। $GNP_{FC} = GNP_{MP}$ – নিট উৎপাদিত কর – নিট উৎপাদন কর
7.	বাজার দামে নিট জাতীয় উৎপাদন (**Net National Product at Market Prices** বা **NNP_{MP}**)	• কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশ কতটুকু ভোগ করতে পারে তা পরিমাপ করা হয় এর দ্বারা। NNP_{MP} দেশে বা বিদেশে যে উৎপাদন সংগঠিত হয় তা পরিমাপ করে। $NNP_{MP} = GNP_{MP}$ – অবচয়জনিত ব্যয় $NNP_{MP} = NDP_{MP} + NFIA$
8.	উপকরণ ব্যয়ে **NNP** (**NNP at Factor Cost** বা **NNP_{FC}**) অথবা জাতীয় আয় (**NI**)	• একটি দেশে সাধারণত 1 বছরে উৎপাদনের উপকরণগুলো মজুরি, মুনাফা, খাজনা এবং সুদ বাবদ আয়সমূহ যোগ করলে উপকরণ ব্যয়ে NNP পাওয়া যায়। • এটি হল জাতীয় উৎপাদন এবং শুধুমাত্র দেশের সীমানার মধ্যেই যে উৎপাদন হতে হবে তা নয়। উৎপাদনের উপকরণ থেকে নিট দেশজ আয়ের সঙ্গে বিদেশ থেকে নিট উপকরণজনিত আয়কে যোগ করলে জাতীয় আয় পাওয়া যায়। $NI = NNP_{MP}$ – নিট উৎপাদিত শুল্ক – নিট উৎপাদন শুল্ক $= NDP_{FC} + NFIA = NNP_{FC}$
9.	বাজার দামে **GVA** (**GVA at Market Prices**)	• বাজার দামে GDP।
10.	মূল দামে **GVA** (**GVA at basic prices**	• GVA_{MP} - নিট উৎপাদন কর
11.	উপকরণ ব্যয়ে **GVA** (**GVA at factor cost**)	• মূল দামে GVA - নিট উৎপাদন কর

2.4 আর্থিক এবং প্রকৃত জিডিপি

এই আলোচনার সকল ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে, পণ্য ও সেবা সামগ্রির দাম স্থির আছে। যদি দাম পরিবর্তনশীল হয় তাহলে GDP-এর তুলনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। যদি আমরা পরপর দুটি বছরের GDP কে তুলনা করি এবং যদি দেখি যে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় পরবর্তী বছরের GDP দ্বিগুণ, তাহলে আমরা বলতে পারি যে দেশের উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে গেছে। কিন্তু এটা সম্ভব হয় তখনই যখন সমস্ত দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর দামস্তর দ্বিগুণ হয়ে যায় এই দুবছরের মধ্যে, যেখানে উৎপাদনের পরিমাণ একই রয়ে গেছে।

সুতরাং, বিভিন্ন দেশের মধ্যে GDP তুলনা করতে গিয়ে বা একই দেশের বিভিন্ন সময়ে GDP তুলনা করতে গিয়ে চলতি বাজার দামে GDP কে মূল্যায়ন করা ঠিক হবে না। সেই ক্ষেত্রে আমরা **প্রকৃত GDP** -এর সাহায্য নিই। প্রকৃত GDP নির্ণয় করার ক্ষেত্রে পণ্য ও সেবাসামগ্রীকে **স্থির দামে** মূল্যায়ন করা হয়। দামস্তর স্থির রেখে যদি **প্রকৃত** GDP পরিবর্তিত হয় তাহলে আমরা বুঝে নেব যে, উৎপাদনের পরিমাণ বা মাত্রার পরিবর্তিত হয়েছে। অপরদিকে, **আর্থিক GDP**-এর ক্ষেত্রে GDP-র মূল্য প্রচলিত বাজার দামে পরিমাপ করা হয়। যেমন, ধরা যাক, দেশে কেবলমাত্র পাউরুটি উৎপাদন হয়। 2000 সালে 100টি পাউরুটি তৈরি করা হয়েছে এবং প্রতি পাউরুটি দাম ছিল 10 টাকা। প্রচলিত বাজার দামে GDP 1000 টাকা। 2001 সালে একই দেশ 110টি পাউরুটি উৎপাদন করেছে যেখানে প্রতি পাউরুটির মূল্য ছিল 15 টাকা। সুতরাং, 2001 সালে আর্থিক GDP 1650 টাকা (=110টি পাউরুটি × 15 টাকা)। 2000 সালের দামস্তর দ্বারা 2001 সালের প্রকৃত GDP (2000 সালকে ভিত্তি বছর ধরে) ধারায় 110 × 10 টাকা = 1,100 টাকা।

আর্থিক ও প্রকৃত GDP -এর অনুপাতের ধারণা থেকে দেখা যায়, কীভাবে দাম **ভিত্তি বছর** (যে বছরের দামস্তর প্রকৃত GDP গণনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়) থেকে চলতি বছরে অগ্রসর হয়। চলতি বছরের প্রকৃত ও আর্থিক GDP গণনা করার ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ স্থির ধরে নেওয়া হয়। সুতরাং, যদি এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে তাহলে সেটা শুধুমাত্র ভিত্তি বছর ও চলতি বছরের দামস্তরের পরিবর্তনের জন্য হয়। আর্থিক ও প্রকৃত GDP-এর অনুপাতকে দামের সূচক বলে অভিহিত করা হয়। তাকে **GDP Deflator** বলে। এইভাবে, যদি GDP কে আর্থিক GDP ধরা হয় এবং gdp কে প্রকৃত GDP হিসাবে ধরা হয়, তখন

GDP deflator হবে = $\frac{\text{GDP}}{\text{gdp}}$ ।

কোনো কোনো সময় ডিফ্লেটরকে শতাংশ হারেও উল্লেখ করা হয়। এইক্ষেত্রে, ডিফ্লেটর = $\frac{\text{GDP}}{\text{gdp}} \times 100\%$। পূর্বের উদাহরণে, GDP ডিফ্লেটর = $\frac{1,650}{1,100}$ = 1.50 (শতাংশ হারে এটা দাঁড়ায় 150 শতাংশ)। উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে, 2001 সালে যে পাউরুটি উৎপাদিত হয়েছে তার দাম 2000 সালে যে পাউরুটি উৎপাদিত হয়েছে তার দাম 2000 সালের দামের চেয়ে 1.5 শতাংশ বেশি। অর্থাৎ পাউরুটির দাম 10 টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে 15 টাকা হয়ে গেছে। GNP ডিফ্লেটর এর ধারণাটি GDP ডিফ্লেটরের মতোই।

একটি দেশের দামের পরিবর্তনকে পরিমাপ করার অন্য আরেকটি উপায় হল ভোক্তার দামসূচক বা CPI। ভোক্তার যে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে তাদের দাম সূচককে **ভোক্তার দামসূচক** বলে। CPI সাধারণতঃ শতাংশ হারে বর্ণনা করা হয়। ধরা যাক, দুটি বছরের মধ্যে একটি হল ভিত্তি বছর এবং আরেকটি হল চলতি বছর। ধরা যাক, এক ঝুড়ি দ্রব্যের ক্রয়মূল্যকে ভিত্তি বছরের হিসাবে গণনা করা হল। আবার একই দ্রব্যের ক্রয়মূল্যকে চলতি বছরের হিসাবেও গণনা করি। তখন আমরা পরেরটিকে পূর্বের শতাংশ হারে ব্যাখ্যা করতে পারি। এর থেকে আমরা চলতি বছরের সাথে সাথে ভিত্তি বছরের দামসূচক নির্ধারণ করতে পারি। ধরা যাক, একটি দেশে দুটি দ্রব্য উৎপাদন হয় : চাউল এবং বস্ত্র। একজন ভোক্তা বছরে 90 কেজি চাউল এবং 5টি বস্ত্র ক্রয় করে। ধরা যাক, 2000 সালে প্রতি কেজি চালের মূল্য 10 টাকা এবং একটি বস্ত্রের মূল্য 100 টাকা। সুতরাং, 2000 সালে

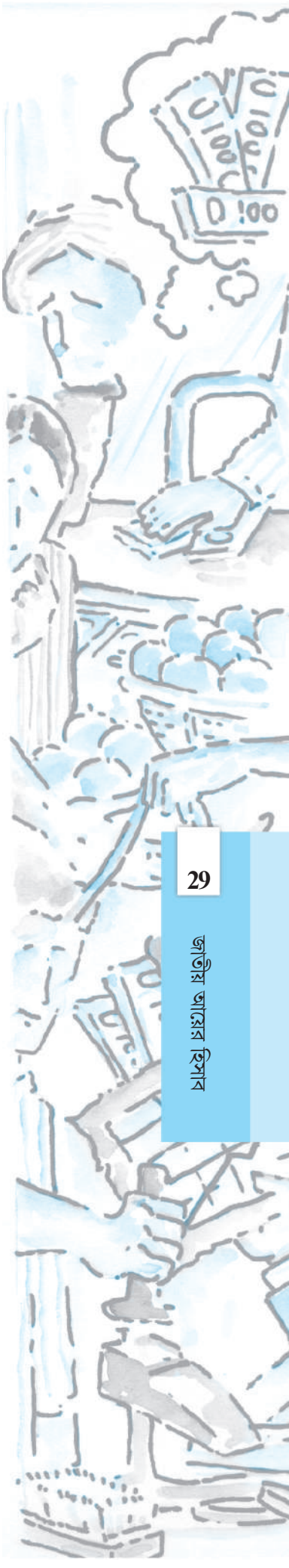

ভোক্তাকে 10 টাকা × 90 কেজি = 900 টাকা ব্যয় করতে হয় চালের জন্য। ঠিক একই রকমভাবে, সে 100 টাকা × 5টি বস্ত্র = 500 টাকা বছরে খরচ করে বস্ত্র ক্রয় করার জন্য। দুটিকে যোগ করলে পাই 900 টাকা + 500 টাকা = 1,400 টাকা।

এখন ধরা যাক, 2005 সালে প্রতি কেজি চাল এবং বস্ত্রের দাম বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে 15 টাকা এবং 120 টাকা হল। সুতরাং একই পরিমাণ চাল ও বস্ত্র ক্রয় করতে ভোক্তাকে খরচ করতে হয় যথাক্রমে 1,350 টাকা এবং 600 টাকা (পূর্বের মতো গণনা করলে)। তখন যোগফল গিয়ে দাঁড়ায় 1,350 টাকা + 600 টাকা = 1,950 টাকা। সুতরাং, CPI হবে $\frac{1,950}{1,400} \times 100 = 139.29$ (প্রায়)।

এটি মনে রাখতে হবে যে, অনেক দ্রব্যের দুই ধরনের দাম থাকে। একটি হল খুচরো মূল্য যা ভোক্তারা প্রকৃতই ব্যয় করে। আরেকটি হল পাইকারি দাম, যে মূল্যে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়। ব্যবসায়িকরা যে পরিমাণ মার্জিন রাখে তার ভিত্তিতে খুচরো ও পাইকারি দামের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। যে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী খুব বেশি পরিমাণে বাণিজ্য হয় (যেমন কাঁচামাল বা অর্ধসমাপ্ত পণ্য) সেগুলো সাধারণ ভোক্তারা ক্রয় করে না। CPI-এর মতো পাইকারি মূল্যের সূচককে **পাইকারি মূল্যের সূচক** বলা হয়। আমেরিকার মতো দেশগুলোতে এটাকে বলে উৎপাদক দাম সূচক। লক্ষণীয় যে, CPI (এবং অনুরূপভাবে WPI) GDP ডিফ্লেটর থেকে ভিন্ন হয়। তার কারণ

1. ভোক্তারা যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করে তা দেশের সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদনকে নির্দেশ করে না। GDP ডিফ্লেটর সেটা ব্যাখ্যা করে।
2. ভোক্তারা যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করে তার মূল্য CPI-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং এটার মধ্যে আমদানি দ্রব্যের দাম অন্তর্ভুক্ত থাকে। GDP ডিফ্লেটর এইসব আমদানি দ্রব্যের দামকে অন্তর্ভুক্ত করে না।
3. CPI-এর মধ্যে ভার স্থির ধরা হয় — কিন্তু প্রত্যেক দ্রব্যের উৎপাদন অনুযায়ী GDP ডিফ্লেটর ভিন্ন হয়।

2.5 জিডিপি এবং কল্যাণ

কোনো দেশের GDP কে ওই দেশের লোকদের কল্যাণের সূচক হিসাবে নেওয়া যেতে পারে? যদি একজন লোকের আয় বেশি হয় তাহলে সে বেশি পরিমাণে পণ্যও সেবাসামগ্রী ক্রয় করতে পারে এবং তার জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। সুতরাং তার আয়স্তরকে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির একক হিসাবে ধরা যেতে পারে। GDP হল কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণতঃ এক বছর) দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যে সমস্ত পণ্য ও সেবা সামগ্রী উৎপাদিত হয় তার আর্থিক মূল্য এবং এটা মানুষের নিকট আয় হিসাবে বণ্টিত হয়। সুতরাং আমরা একটি দেশের মানুষের কল্যাণ বৃদ্ধির সূচক হিসাবে GDP-এর উচ্চহারকে ধরে নিতে পারি (দামস্তরের পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে আর্থিক GDP-এর পরিবর্তে প্রকৃত GDP কে আমরা নিতে পারি)। কিন্তু অন্ততপক্ষে তিনটি বিষয় আছে যার জন্য উপরিউক্ত বক্তব্য সঠিক না।

1. **GDP-এর বণ্টন — বণ্টনে কতটা সমতা রয়েছে :** দেশের GDP বৃদ্ধি পেলেই মানুষের কল্যাণ বৃদ্ধি পায় না, কারণ GDP বৃদ্ধি পেলে তা শুধুমাত্র কিছু মুষ্টিমেয় লোকের হাতে বণ্টিত হয়। বাকীদের কাছে GDP-এর খুব কম অংশই বণ্টিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক, 2000 সালে কোনো একটি দেশে 100 জন মানুষ আছে এবং প্রত্যেকের আয় 10 টাকা। সুতরাং ওই দেশের GDP 1000 টাকা (আয় পদ্ধতি অনুযায়ী)। 2001 সালে ধরা যাক, ওই একই দেশে 90 জন মানুষ আছে যাদের প্রত্যেকের আয় 9 টাকা এবং বাকী 10 জনের প্রত্যেকের আয় 20 টাকা। ধরা যাক, ওই দুটি সময়কালে পণ্য ও সেবা সামগ্রীর দামস্তরের কোনো পরিবর্তন হয়নি। 2001 সালে দেশের GDP ছিল 90 × (9 টাকা) + 10 × (20 টাকা) = 810 টাকা + 200 টাকা = 1,010 টাকা। লক্ষ্যণীয় যে, 2000 সালের তুলনায় 2001 সালে GDP -এর পরিমাণ 10 টাকা বেশি। এটি ঘটার কারণ হল, যখন দেশের 90

শতাংশ মানুষের প্রকৃত আয় 10 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে (10 টাকা থেকে 9 টাকা হয়েছে) সেখানে মাত্র 10 শতাংশ লোকের আয় 100 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (10 টাকা থেকে 20 টাকা)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, GDP বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই কিন্তু 90 শতাংশ মানুষের কোনো লাভ হয়নি। শতাংশের নিরিখে যাদের সত্যি সত্যি কল্যাণ সাধিত হয়েছে সেই হিসাবে দেশের কল্যাণ বৃদ্ধির ব্যাপারটিকে বিচার করলে বলা যায়, GDP দেশের কল্যাণের পরিমাপের জন্য ভাল সূচক নয়।

2. **অ-আর্থিক বিনিময় :** দেশের অনেক কাজকর্ম রয়েছে যেগুলোকে অর্থ দিয়ে মূল্যায়ন করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, মহিলারা বাড়ীতে যে সেবা প্রদান করেন তার জন্য কোনো রকম আর্থিক মূল্য প্রদান করা হয় না। অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে টাকা ছাড়া দ্রব্যের মাধ্যমে যে বিনিময় হয় তাকে বলে বার্টার বিনিময় প্রথা। বার্টার বিনিময় প্রথার জন্য দ্রব্য (বা সেবা) সমূহ সরাসরি একে অপরের মধ্যে আদান প্রদান হয়। কিন্তু যেহেতু টাকা এইক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না, এই ধরনের বিনিময় অর্থনৈতিক কাজকর্মের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না। উন্নয়নশীল দেশে যেখানে অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চল অনুন্নত অবস্থায় রয়েছে সেখানে এই ধরনের আদান প্রদান চলে। কিন্তু এগুলো সাধারণত GDP তে অন্তর্ভুক্ত হয় না, এইটি GDP-র সীমাবদ্ধতার একটি উদাহরণ। সেজন্য প্রচলিত পদ্ধতিতে যেভাবে GDP গণনা হয় তা আমাদের উৎপাদনশীল কার্যকলাপের এবং একটি দেশের কল্যাণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিতে পারে না।

GDP-এর বণ্টন কেমন সুষম? এখনো মনে হয় অধিকাংশ লোক গরিব ও মুষ্টিমেয় লোক সুবিধা পাচ্ছে।

3. **বাহ্যিকতা :** একটি ফার্মের বা কোনো ব্যক্তি কোনো সুবিধা (অসুবিধা) ভোগের ফলে আরেকটি ফার্ম বা অন্য আরেকজন ব্যক্তিকে যে অসুবিধা (সুবিধা) পেতে হয় তাকে বাহ্যিকতা বলা হয়। বাহ্যিকতা কোনো বাজারে পাওয়া যায় না, যেখান থেকে এটা ক্রয় করা হয় বা বিক্রয় করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক দেশে একটি তৈল শোধনাগার আছে যা কাঁচা পেট্রোলকে শোধন করে এবং বাজারে বিক্রি করে। তৈল শোধনাকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্য হল শোধিত তেল। এই তৈল শোধনাকারী ফার্মের মূল্য সংযোজনের হিসাব করার সময় ফার্মটি যে মধ্যবর্তী দ্রব্য (কাঁচা তেল) ব্যবহার করেছে তার আর্থিক মূল্যকে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম থেকে বাদ দিতে হবে। তৈল শোধনাকারী ফার্মের মূল্য সংযোজন কোনো দেশের GDP-র একটি অংশ হিসাবে ধরা হয়। কিন্তু এই ফার্মটির উৎপাদন প্রক্রিয়া যখন চলতে থাকে তখন পাশের নদীর জলকে দূষিত করে। এটা মানুষেরও ক্ষতি করে যারা এই নদীর জল পান করে। সুতরাং তাদের কল্যাণের ব্যাঘাত ঘটে এবং হ্রাস পায়। এই দূষণ মাছ ও নদীর অন্যান্য সজীব বস্তুকেও মেরে ফেলে যা খেয়ে মাছ নদীতে জীবন ধারণ করে। এর ফলে নদীর মৎস্যজীবীদের জীবিকা নির্বাহ বিঘ্নিত হয়। তৈল শোধনাগারটি অন্যের উপর যে ক্ষতিকারক প্রভাব সৃষ্টি করেছে এবং সেজন্য তাকে কোনো খরচ বহন করতে হয় না, তাকেই বলে বাহ্যিকতা। এইসব ঋণাত্মক বাহ্যিকতা GDP-এর মধ্যে ধরা হয় না। সুতরাং, আমরা যদি GDP -কে দেশের কল্যাণের একটি নির্দেশক হিসাবে ধরে থাকি তাহলে আমরা প্রকৃত কল্যাণের অতিরিক্ত হিসাব করি। সঠিক হিসাব করি না। এটা হল ঋণাত্মক বাহ্যিকতার একটি উদাহরণ। ধনাত্মক বাহ্যিকতারও কিছু কিছু দিক আছে। এইসব ক্ষেত্রে, GDP দেশের আসল কল্যাণকে সঠিকভাবে নিরূপণ করতে পারবে না।

সারসংক্ষেপ

সবচেয়ে প্রাথমিক অবস্থায় সামষ্টিক অর্থনীতিকে (ওই অর্থনীতির কথা বলা হচ্ছে যেখানে সামষ্টিকভাবে আলোচনা করা হয়) চক্রাকার প্রবাহের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে। পরিবারসমূহ যে সকল উৎপাদনের উপকরণ যোগান দেয়, ফার্ম তাদেরকে নিয়োগ করে এবং ফার্মসমূহ যে বিভিন্ন পণ্য এবং সেবা সামগ্রী উৎপাদন করে তা আবার পরিবারসমূহের নিকট বিক্রি করে। আবার পরিবারসমূহ ফার্মের নিকট যে শ্রম নিয়োগ করে তার বিনিময়ে ফার্ম থেকে পারিশ্রমিক পায় এবং এই টাকা খরচ করে পরিবারসমূহ ফার্ম থেকে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করে। সুতরাং, আমরা তিনটি উপায়ের মধ্যে যে-কোনো একটি উপায়ে অর্থনীতিতে যে সমস্ত দ্রব্য ও সেবা সামগ্রী উৎপাদিত হয় তার আর্থিক মূল্য হিসাব করতে পারি : (ক) উৎপাদনের উপকরণের সামগ্রিক অর্জিত আয় পরিমাপ করে (আয় পদ্ধতি), (খ) উৎপাদনকারী সংস্থাসমূহ যে সমস্ত পণ্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন করে তার সামগ্রিক আর্থিক মূল্য পরিমাপ করে (উৎপাদন পদ্ধতি), (গ) কার্যসমূহের সমস্ত ব্যয় যোগ করে (ব্যয় পদ্ধতি) জাতীয় আয় পরিমাপ করা যায়। উৎপাদন পদ্ধতিতে দ্বৈত গণনায় সমস্যাকে দূর করার জন্য মধ্যবর্তী দ্রব্যের আর্থিক মূল্যকে হিসাব থেকে বাদ দিতে হয় এবং চূড়ান্ত দ্রব্য সামগ্রীর আর্থিক মূল্যকে যোগ করতে হয়। আমরা দেশের সামগ্রিক আয় এই তিনটি পদ্ধতিতে হিসাব করার জন্য নির্দিষ্ট সূত্র নির্মাণ করি। যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী ভবিষ্যতে বিনিয়োগের জন্য ক্রয় করা হয় তারও হিসাব রাখতে হয় এবং তাদেরকে বিনিয়োগকারী ফার্মের উৎপাদনশীল ক্ষমতার মধ্যে ধরা হয়। সামগ্রিক আয় এখানে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে এবং তা নির্ভর করে কোন্ কোন্ উৎস থেকে তা পাওয়া যায় তার উপর। আমরা GDP, GNP, বাজার দামে NNP উপকরণ ব্যয়ে NNP-এর মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করেছি, যেহেতু দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর দাম বিভিন্ন হতে পারে। আমরা কীভাবে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দাম সূচকের (GDP Deflator, CPI এবং WPI) হিসাব নিকাশ করা হয়, তা আলোচনা করেছি। সর্বশেষে আমরা লক্ষ করেছি যে, GDP-কে কোনো দেশের কল্যাণ পরিমাপের সূচক হিসাবে গণ্য করা হয় না কেন।

মূল ধারণা

চূড়ান্ত দ্রব্য	ভোগ্য পণ্য
ভোক্তার স্থায়ী দ্রব্য	মূলধনী দ্রব্য
মধ্যবর্তী পণ্য	মজুত সমূহ
প্রবাহসমূহ	মোট বা স্থূল বিনিয়োগ
নিট বিনিয়োগ	অবচয়জনিত ব্যয়
মজুরি	সুদ
মুনাফা	খাজনা
আয়ের চক্রাকার প্রবাহ	জাতীয় আয়ের হিসাবের ক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতি
জাতীয় আয় হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যয় পদ্ধতি	জাতীয় আয়ের হিসাবের ক্ষেত্রে আয় পদ্ধতি
সামষ্টিক অর্থনীতির মডেল	উপকরণ
মূল্য সংযোজন	ইনভেন্টরি
মজুত বা ইনভেন্টরির পরিকল্পিত পরিবর্তন	ইনভেন্টরির অপরিকল্পিত পরিবর্তন
মোট দেশীয় উৎপাদন (জিডিপি)	নিট দেশীয় উৎপাদন (এনডিপি)
মোট জাতীয় উৎপাদন (জি এন পি)	বাজার দামে নিট জাতীয় উৎপাদন (এন এন পি)
নিট জাতীয় উৎপাদন (উপকরণ ব্যয়ে) বা জাতীয় আয় (এন আই)	অবণ্টিত মুনাফা
ভোগকারী পরিবার সমূহের নিট সুদ প্রদান	কর্পোরেট কর
সরকার ও ফার্ম থেকে পরিবারসমূহকে হস্তান্তর আয় প্রদান	ব্যক্তিগত আয়
ব্যক্তিগত কর প্রদান	কর বহির্ভূত লেনদেন
ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয় (পি ডি আই)	জাতীয় ব্যয়যোগ্য আয়

ব্যক্তিগত আয়
প্রকৃত জিডিপি
জিডিপি ডিফ্লেটর/সঙ্কোচক
পাইকারি দাম সূচক বা WPI
আর্থিক জিডিপি
ভিত্তি বছর
ভোক্তার দামসূচক
বাহ্যিকতা

অনুশীলনী

1. উৎপাদনের চারটি উপকরণ কি এবং উপকরণগুলো প্রতিদান হিসাবে যা পায় তাদেরকে কী বলে?
2. একটি দেশের সামগ্রিক চূড়ান্ত ব্যয় সামগ্রিক উপকরণের জন্য প্রদেয় অর্থের সমান হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
3. মজুত ও প্রবাহের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করো। নিট বিনিয়োগ এবং মূলধনের মধ্যে কোন্‌টি মজুত এবং কোন্‌টি প্রবাহ? একটি জলাধারে জলের প্রবাহের দ্বারা নিট বিনিয়োগ ও মূলধনের মধ্যে তুলনা করো।
4. পরিকল্পিত এবং অপরিকল্পিত মজুত জমানোর মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করো। ইনভেন্টরির পরিবর্তন এবং ফার্মের মূল্য সংযোজনের মধ্যে সম্পর্কটি বিশ্লেষণ করো।
5. একটি দেশের GDP গণনার তিনটি পদ্ধতিতে ব্যবহৃত তিনটি অভেদ সম্পর্কে আলোচনা করো। এই তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে যে GDP পরিমাপ করা হয় তার মান কেন সমান হয় তা ব্যাখ্যা করো।
6. বাজেট ঘাটতি এবং বাণিজ্য ঘাটতি কী? কোনো একটি বছরে একটি দেশের সঞ্চয় অপেক্ষা ব্যক্তিগত বিনিয়োগ 2,000 কোটি টাকা বেশি। বাজেট ঘাটতির পরিমাণ (–) 1,500 কোটি টাকা। ওই দেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ কত?
7. ধরা যাক, কোনো একটি বছরে একটি দেশের বাজার দামে GDP হল 1,100 কোটি টাকা। বিদেশ থেকে নিট উপকরণ আয় 100 কোটি টাকা। পরোক্ষ কর, যেমন ভুর্তকির মূল্য 150 কোটি টাকা এবং জাতীয় আয় 850 কোটি টাকা। অবমূল্যায়নজনিত ব্যয়ের সামগ্রিক মূল্য নির্ণয় করো।
8. কোনো একটি দেশের একটি বছরের উপকরণ ব্যয়ে নিট জাতীয় উৎপাদন 1900 কোটি টাকা। পরিবারসমূহকে সরকার বা ফার্মের কাছে কোনো সুদ প্রদান করতে হয় না। আবার সরকার বা ফার্মকেও সুদের টাকা পরিবারকে ফেরত দিতে হয় না। পরিবারের ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয় 1,200 কোটি টাকা। তাদের ব্যক্তিগত আয়কর 600 কোটি টাকা এবং ফার্ম ও সরকারের আয় 200 কোটি টাকা। সরকার ও ফার্ম পরিবারকে যে হস্তান্তর আয় প্রদান করে তার মান নির্ণয় করো।
9. নিম্নের তত্ত্বগুলোর মাধ্যমে ব্যক্তিগত আয় এবং ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয় নির্ণয় করো।

	টাকা (কোটি)
(a) উপকরণ ব্যয়ে নিট দেশজ উৎপাদন	8,000
(b) বিদেশ থেকে নিট উপকরণ আয়	200
(c) অবণ্টিত মুনাফা	1,000
(d) কর্পোরেট কর	500
(e) পরিবারবর্গের সুদ প্রাপ্তি	1,500
(f) পরিবারবর্গের সুদ প্রদান	1,200
(g) হস্তান্তর আয়	300
(h) ব্যক্তিগত কর	500

10. কোনো একটি দিনে রাজু নামে এক নাপিত চুলকাটা বাবদ 500 টাকা সংগ্রহ করল; ওইদিনে তার যন্ত্রাংশের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ 50 টাকা খরচ হয়। রাজু বাকি 450 টাকা থেকে বিক্রয় কর বাবদ 30 টাকা দেয়। বাড়ীতে নিয়ে যায় 200 টাকা এবং নতুন যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম ক্রয় করার জন্য বা মেরামতির জন্য 220 টাকা রেখে দেয়। সে

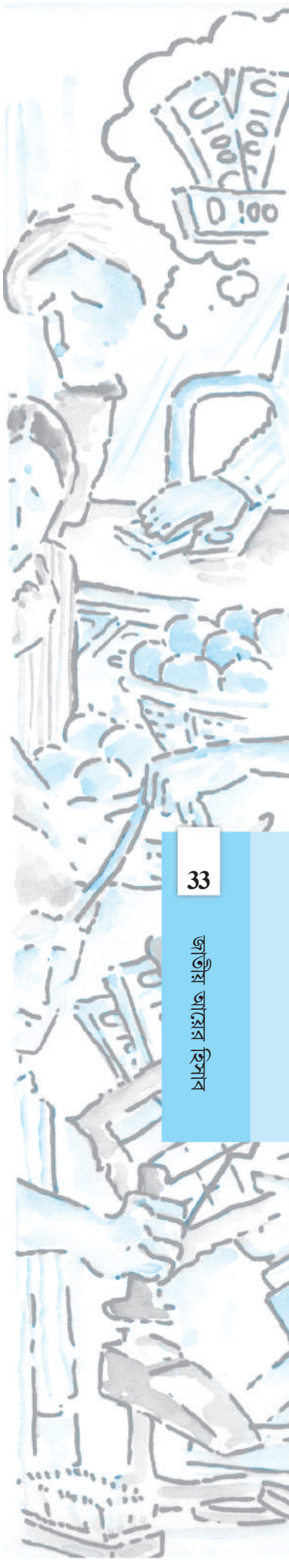

আবার তার আয়ের থেকে আয়কর বাবদ 20 টাকা প্রদান করে। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে আয় নির্ধারণের নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলোতে উল্লেখ করো। (ক) স্থূল দেশীয় উৎপাদন (জিডিপি) (খ) বাজার দামে NNP (গ) উপকরণ ব্যয়ে NNP (ঘ) ব্যক্তিগত আয় (ঙ) ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয়।

11. কোনো একটি বছরে একটি দেশের আর্থিক GNP 2,500 কোটি টাকা। ঐ একই বছরকে ভিত্তি বছর ধরে ওই দেশের GNP সংকোচক বা ডিফ্লেটির-এর মান নির্ণয় করো। বিবেচনাধীন বছর ও ভিত্তি বছরের দামস্তরের মধ্যে কী কোনো পার্থক্য লক্ষ করা যাবে?

12. একটি দেশের GDP কে কল্যাণের সূচক হিসাবে ব্যবহার করার কিছু সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে আলোচনা করো।

Suggested Readings

1. Bhaduri, A., 1990. *Macroeconomics: The Dynamics of Commodity Production*, pages 1 – 27, Macmillan India Limited, New Delhi.
2. Branson, W. H., 1992. *Macroeconomic Theory and Policy*, (third edition), pages 15 – 34, Harper Collins Publishers India Pvt Ltd., New Delhi.
3. Dornbusch, R and S. Fischer. 1988. *Macroeconomics*, (fourth edition) pages 29–62, McGraw Hill, Paris.
4. Mankiw, N. G., 2000. *Macroeconomics*, (fourth edition) pages 15–76, Macmillan Worth Publishers, New York.

সারণি 2.5: **2011-12 স্থির দামে[6] ভারতের GVA এবং GDP**

ক্রমিক নং	*বিষয়*	*2016-17 সালের মূল্য (লক্ষ কোটি টাকায়)*
1.	মূল দামে GVA	111.854
2.	নিট উৎপাদন কর	10.044
3.	GDP (1+2)	121.898

[6]এগুলো হল সিএসও দ্বারা পরিবেশিত প্রাথমিক হিসাবসমূহ। মে 31, 2017-তে এই তথ্যগুলো প্রকাশ করা হয়েছে।

সারণি 2.6: GDP-এর বিভিন্ন দিক: ব্যয়ের দিক (2011-12 দামে)

ক্রমিক নং	*বিষয়*	*2016-17 সালের মূল্য (লক্ষ কোটি টাকায়)*
1.	ব্যক্তিগত চূড়ান্ত ভোগ ব্যয় (PFCE)	68.066
2.	সরকারের চূড়ান্ত ভোগ ব্যয় (GFCE)	13.407
3.	স্থূল স্থির মূলধন গঠন (GFCF)	36.020
4.	মজুতের পরিবর্তন	2.918
5.	মূল্যবানসমূহ	1.487
	বিনিয়োগ (3+4+5)	**40.425**
6.	দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর রপ্তানি	24.860
7.	দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর আমদানি	25.687
	নিট রপ্তানি (6-7)	**-0.827**
8.	অসামঞ্জস্য	0.839
9.	**GDP (1+2+3+4+5+6-7+8)**	**121.898**

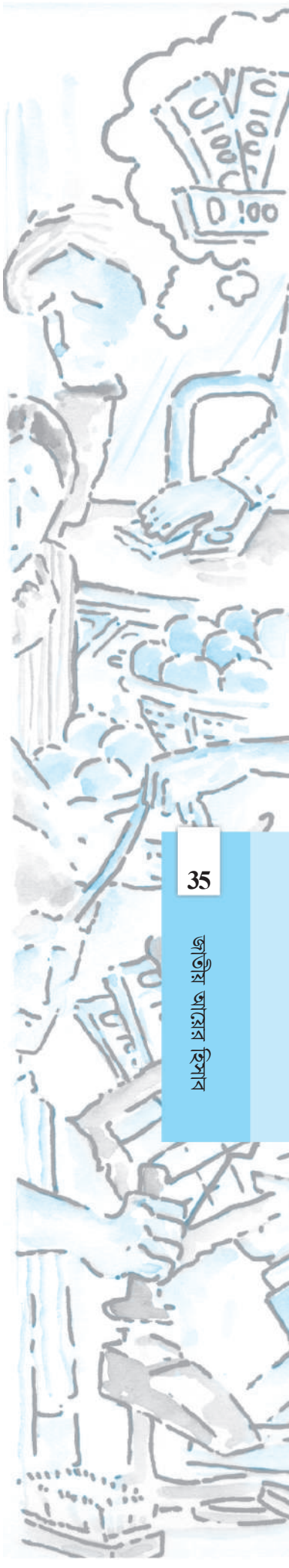

অধ্যায় 3

অর্থ এবং ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা

অর্থ হল সর্বজনস্বীকৃত বিনিময়ের মাধ্যম। এমন একটি অর্থব্যবস্থা কল্পনা করা যাক যেখানে একজন মাত্র ব্যক্তি রয়েছে। এই অর্থ ব্যবস্থায় যেহেতু দ্রব্যের বিনিময়ের কোনো সুযোগ নেই, কাজেই অর্থের কোনো ভূমিকাও নেই। এমনকি অর্থব্যবস্থায় একাধিক ব্যক্তি থাকলে পরেও সেই ব্যক্তিরা যদি বাজারে লেনদেনে অংশগ্রহণ না করে, যেমন কোনো নির্জন দ্বীপে বসবাসকারী কোনো পরিবার, তাদের ক্ষেত্রে অর্থের কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু অর্থব্যবস্থায় যদি একাধিক অর্থনৈতিক এজেন্ট থাকে যারা নিজেদের মধ্যে বাজার ব্যবস্থায় লেনদেনে লিপ্ত থাকে, তবে তাদের সেই লেনদেন প্রক্রিয়ায় অর্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থের ব্যবহার ছাড়া যে অর্থনৈতিক বিনিময় হয়ে থাকে তাকে 'দ্রব্য বিনিময়' বা 'বার্টার বিনিময়' বলা হয়। এক্ষেত্রে অনুমান করে নিতে হবে যে অভাবের দ্বৈত সমাপতন ঘটবে। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক যে কোনো ব্যক্তির কাছে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাল রয়েছে যেটা সে কাপড়ের পরিবর্তে বিনিময় করতে চায়। এই বিনিময় সে করতে পারবে না যদি এমন কোনো ব্যক্তিকে সে খুঁজে না পায় যার ঠিক বিপরীত চাহিদা রয়েছে অর্থাৎ যে কিনা তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাপড় চালের পরিবর্তে বিনিময় করতে চায়। কাজেই এই ধরনের দ্রব্য বিনিময় প্রক্রিয়া যথেষ্ট জটিল এবং ব্যয় সাপেক্ষ। বিনিময় প্রক্রিয়াটিকে সহজ ও সাবলীল করার জন্য একটি মধ্যবর্তী দ্রব্য থাকতে হবে যেটা বিনিময়ে অংশগ্রহণকারী দুপক্ষের কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে। এই মধ্যবর্তী দ্রব্যটিই হল 'অর্থ'। এই অর্থের বিনিময়ে ব্যক্তি তার উৎপাদিত পণ্য বা সেবা বিক্রয় করতে পারে আবার সেই অর্থ দিয়েই সে তার প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করতে পারে। যদিও বিনিময় প্রক্রিয়াকে সহজতর করাই হল অর্থের মূল কাজ, কিন্তু অর্থের এছাড়াও আরও কিছু ভূমিকা রয়ে গেছে। একটি আধুনিক অর্থব্যবস্থায় অর্থের কী কী ভূমিকা রয়েছে সেটা নীচে আলোচনা করা হল।

3.1 অর্থের কাজ

অর্থের প্রথম এবং মুখ্য কাজ হল, অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। বৃহৎ অর্থব্যবস্থায় সরাসরি দ্রব্য বিনিময় বা বার্টার বিনিময় ভীষণ রকমের জটিল হয়ে পড়ে কেননা, বিনিময়ে আগ্রহী ব্যক্তির চয়ন তথা সন্ধান যথেষ্ট ব্যয় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া।

অর্থ হিসাবের একক হিসেবেও কাজ করে। সমস্ত রকমের দ্রব্য ও সেবার মূল্য আর্থিক এককে প্রকাশ করা যেতে পারে। যখন আমরা বলি যে, কোনো একটি হাতঘড়ির মূল্য 500 এককের পরিবর্তে বিনিময় করা যেতে পারে। যেখানে অর্থের একক টাকা। একটি পেন্সিলের দাম 2 টাকা এবং একটি কলমের দাম 10 টাকা হলে আমরা পেন্সিলের সাপেক্ষে কলমটির আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ করতে পারি, যেমন এক্ষেত্রে 1টি কলমের মূল্য $10 \div 2 = 5$টি পেন্সিল। অন্যান্য দ্রব্যের নিরিখে অর্থের মূল্যায়ণও এভাবে করা যেতে পারে। উপরের উদাহরণের ক্ষেত্রে 1 টাকার মূল্য $1 \div 2 = 0.5$ পেন্সিল অথবা $1 \div 10 = 0.1$ কলম। এজন্য, যদি সমস্ত দ্রব্যের মূল্য অর্থের নিরিখে বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ

সাধারণভাবে মূল্যস্তরের বৃদ্ধি ঘটে তবে যে-কোনো দ্রব্যের নিরিখে অর্থের মূল্য হ্রাস পেয়েছে বলা যেতে পারে। এর তাৎপর্য হল, 1 একক অর্থ এখন আগের চেয়ে কম দ্রব্য ক্রয় করতে পারবে। একে অর্থের ক্রয় ক্ষমতার অবনতি বলা যেতে পারে।

বার্টার ব্যবস্থার অন্য কিছু ঘাটতিও রয়ে গেছে। বার্টার ব্যবস্থায় কোনো ব্যক্তির সম্পদ ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা বেশ অসুবিধাজনক। ধরা যাক, তোমার কাছে কিছু চাল রয়েছে যেটা তুমি পুরোটা এখনই ভোগ করতে চাও না, কিছুটা ভবিষ্যতে হয় ভোগ করার জন্য নয়তো বিক্রয় করে অন্য জিনিস সংগ্রহ করার জন্য সঞ্চয় করে রাখতে চাও। কিন্তু চাল হল পচনশীল দ্রব্য, যেটা দীর্ঘদিন সঞ্চয় করে রাখা যায় না। তাছাড়া চাল সঞ্চয় করে রাখতে অনেকটা জায়গারও প্রয়োজন হয়। তারপর যখন সেই চাল বিনিময় করে অন্য দ্রব্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয় তখন সেই বিনিময় করার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান করাটাও অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ ও পরিশ্রমসাধ্য কাজ। এই সমস্যাগুলোর সমাধান তখনই সম্ভব হবে যদি তুমি অর্থের বিনিময়ে সেই সঞ্চিত চাল বিক্রয় কর। অর্থ পচনশীল দ্রব্য নয়, তাছাড়া অর্থের সঞ্চয়ের ব্যয়ও তুলনামূলকভাবে অনেক কম। তাছাড়া অর্থ যে-কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার সম্পদের আধার হিসাবে কাজ করতে পারে। ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য সম্পদ অর্থের মাধ্যমে সঞ্চয় করে রাখা যেতে পারে। তবে অর্থের এই কাজটি সুচারুভাবে করা তখনই সম্ভব হবে যদি অর্থের মূল্য যথেষ্ট পরিমাণে স্থিতিশীল থাকে। মূল্যস্তরের বৃদ্ধি অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করতে পারে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, অর্থ ছাড়াও অন্যান্য দ্রব্য সম্পদের আধার হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন স্বর্ণ, জমি, বাড়ি কিংবা বণ্ড। তবে এ সমস্ত সম্পদ খুব সহজেই অন্যান্য দ্রব্যে পরিবর্তন করা যায় না কিংবা এদের সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতাও নেই।

কিছু কিছু দেশ তাদের অর্থব্যবস্থায় মুদ্রার ব্যবহার কম করে থাকে তথা ডিজিটাল লেনদেনের উপরেই বেশি নির্ভরশীল থাকে। একটা মুদ্রাহীন সমাজব্যবস্থা (ক্যাশলেস সোসাইটি) বলতে এমন একটা অর্থব্যবস্থাকে বোঝানো হয়ে থাকে যেখানে অর্থনৈতিক লেনদেন ব্যাঙ্ক নোটের (কাগজী মুদ্রা কিংবা ধাতব মুদ্রা) উপর নির্ভরশীল নয় বরং লেনদেন হয়ে থাকে ডিজিটাল মাধ্যমে। ভারতীয় অর্থব্যবস্থায় একটি বৃহত্তর অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির জন্য সরকার বরাবরই নানা রকমের সংস্কারমূলক প্রকল্পে বিনিয়োগ করে চলেছে। ভারতীয় অর্থব্যবস্থাকে মুদ্রাহীন অর্থব্যবস্থায় রূপান্তরের উদ্দেশ্যে সরকার গত কয়েক বছরে জনধন যোজনা, আধার ভিত্তিক লেনদেন, ই-ওয়ালেট, ন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল স্যুইচ এবং এ ধরনের বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে। মোবাইল তথা স্মার্টফোনের ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং ব্যবহারের ফলে আজ অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি বাস্তব রূপ পেতে চলেছে।

3.2 অর্থের চাহিদা এবং অর্থের জোগান

3.2.1. অর্থের চাহিদা

অর্থের চাহিদা আমাদের এটা বুঝতে সাহায্য করে যে, কোনো ব্যক্তির কেন অর্থের আকাঙ্ক্ষা থাকে। যেহেতু যে-কোনো ধরণের লেনদেনের ক্ষেত্রেই অর্থের প্রয়োজন হয়, কাজেই লেনদেনের পরিমাণের উপর অর্থের চাহিদার পরিমাণ নির্ভর করে থাকে। লেনদেনের পরিমাণ যদি বেশি হয় তবে অর্থের চাহিদাও বেশি হয়। আবার লেনদেনের পরিমাণ নির্ভর করে আয়ের উপর। কাজেই আয় বাড়লেও অর্থের চাহিদা বাড়বে। মানুষ অনেক সময় অর্থ ব্যাঙ্কে না রেখে হাতে রাখতে চায় যেটা আবার নির্ভর করে ব্যাঙ্ক কী পরিমাণ সুদ দিচ্ছে তার উপর। সুদের হার যদি বেশি হয়, তবে মানুষ অর্থ হাতে না রেখে ব্যাঙ্কে রাখতে চাইবে, কেননা হাতে রাখলে সে সেই সুদ থেকে বঞ্চিত হবে। কাজেই সুদের হার বেশি থাকলে অর্থের চাহিদা কমে যাবে।

3.2.2. অর্থের যোগান

আধুনিক অর্থব্যবস্থায় অর্থ বলতে কাগজী মুদ্রা বা কারেন্সি এবং ব্যাঙ্ক আমানত এই দুটোকেই বোঝানো হয়। ব্যাঙ্ক আমানত আবার বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। ব্যাঙ্ক আমানতের এই প্রকারভেদের উপর ভিত্তি করে অর্থের পরিমাপও নানা প্রকারের হয়ে থাকে। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা মূলত: দু'ধরনের প্রতিষ্ঠানের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে — কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক।

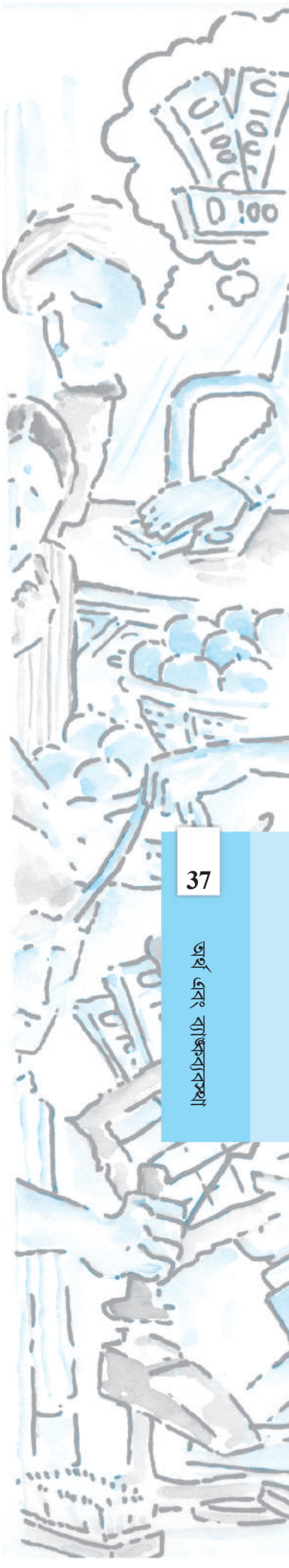

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

আধুনিক অর্থব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। প্রায় প্রতিটি দেশেই একটি করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রয়েছে। ভারতে 1935 সালে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী রয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশে মুদ্রার প্রচলন করে থাকে। তাছাড়া এই ব্যাঙ্ক দেশে অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিভিন্ন রকমের হাতিয়ার ব্যবহার করে যেমন-ব্যাঙ্ক রেট, খোলা বাজারী কার্যকলাপ এবং জমার অনুপাতের পরিবর্তন ইত্যাদি। সরকারের ব্যাঙ্কার হিসাবেও কাজ করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলের সংরক্ষক হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কার হিসাবেও কাজ করে থাকে।

অর্থের যোগানের দৃষ্টিকোণ থেকে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মুদ্রা প্রচলনের বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে মুদ্রার প্রচলন করে সেটা জনগণের কাছে থাকতে পারে কিংবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছেও থাকতে পারে এবং একে 'উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অর্থ' বা 'রিজার্ভ অর্থ' বা 'আর্থিক ভিত' বলা হয়ে থাকে যেহেতু এটা ঋণ সৃষ্টির ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক একটি অর্থব্যবস্থায় অর্থ সৃষ্টির প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত সংস্থা। এখানে আমরা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জনগণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে থাকে এবং সেই আমানতের একটা অংশ ঋণগ্রহীতাকে ঋণ হিসাবে দিয়ে থাকে। ব্যাঙ্ক ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে যে হারে সুদ নিয়ে থাকে তার চেয়ে কম সুদের হারে আমানতকারীদের কাছ থেকে আমানত জমা রাখে। এই দুই সুদের হারের পার্থক্যই হল ব্যাঙ্কের মুনাফা।

ব্যাঙ্কের আমানত ও ঋণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি নীচে আলোচনা করা হল। এই প্রক্রিয়াটি বোঝানোর জন্য একটি গল্পের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

একটি গ্রামে একসময় লালা নামে একজন স্বর্ণকার ছিল। সেই গ্রামের মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করার জন্য স্বর্ণ এবং অন্যান্য মূল্যবান ধাতুর ব্যবহার করত। অন্যভাবে বললে, এই ধাতুগুলোই অর্থের কাজ করত। গ্রামের মানুষ তাদের স্বর্ণ সুরক্ষিত রাখার জন্য লালার কাছে জমা রাখত। সেই স্বর্ণ জমা রাখার বিনিময়ে লালা তাদেরকে কাগজের রসিদ দিত এবং তাদের কাছ থেকে সামান্য ফি সংগ্রহ করত। আস্তে আস্তে লালার দেওয়া সেই কাগজের রসিদ অর্থের মত বিনিময় হতে লাগল। অর্থাৎ গম, জুতো কিংবা অন্য যে-কোনো জিনিস কেনার জন্য স্বর্ণের পরিবর্তে লালার দেওয়া রসিদ ব্যবহার হতে লাগল। এভাবে যেহেতু, গ্রামের মানুষ লালার দেওয়া রসিদকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে মেনে নিত, তাই এই রসিদ অর্থের মতো ব্যবহার হতে লাগল।

এখন ধরা যাক, বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে জমা রাখা মোট 100 কেজি স্বর্ণ লালার কাছে রয়েছে এবং এই 100 কেজি স্বর্ণের বিনিময়ে সে তাদেরকে কাগজী রসিদ দিয়েছে। এখন রামু লালার কাছে এসে 25 কেজি স্বর্ণ ঋণ নিতে চাইল। লালা কি সেই ঋণ দিতে পারবে? তার কাছে জমা করা 100 কেজি স্বর্ণের দাবীদার রয়েছে। কিন্তু যেহেতু এটা ধরেই নেওয়া যেতে পারে যে, সমস্ত দাবীদার একসঙ্গে এসে তাদের জমা স্বর্ণের দাবী করবে না, কাজেই সেখান থেকে 25 কেজি স্বর্ণ রামুকে ঋণ হিসাবে দেওয়া যেতেই পারে এবং এর বিনিময়ে রামুর কাছ থেকে কিছুটা সুদও আদায় করে নেওয়া যেতে পারে। লালা যদি রামুকে 25 কেজি স্বর্ণ ঋণ হিসাবে দিয়ে থাকে, তবে রামুও সেই 25 কেজি স্বর্ণ আলিকে তার কোনো দ্রব্য কিংবা সেবার বিনিময়ে দিতে পারে। আবার আলি সেই স্বর্ণ লালার কাছে তার কাগজী রসিদের বিনিময়ে জমা রাখতে পারে। কাজেই কাগজী রসিদ, যেটা অর্থের মতো কাজ করছিল সেটা এখন বেড়ে 125 কেজি স্বর্ণের সমতুল্য হয়ে গেল। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, লালা এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অর্থ সৃষ্টি করতে তথা অর্থ সংযোজন করতে সমর্থ হল। এই উদাহরণে লালা যেভাবে অর্থ সৃষ্টি করল ঠিক সেইভাবেই আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা অর্থ সৃষ্টি করে থাকে।

[1]এই অধ্যায়ের শেষদিকে অর্থের যোগানের পরিমাপ সংক্রান্ত বাক্সটি দেখো।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক আমানতকারী এবং বিনিয়োগকারীদের মধ্যে মধ্যস্থতা করে থাকে। কোনো ব্যক্তি তার অতিরিক্ত সম্পদ ব্যাঙ্কের কাছে আমানত হিসাবে জমা রাখতে পারে। আবার যার অর্থের প্রয়োজন সে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নিতে পারে। কোনো ব্যক্তি তার অতিরিক্ত সম্পদ ব্যাঙ্কের কাছে আমানত হিসাবে জমা রাখতে এই কারণে আগ্রহী থাকে যে, সেই জমার বিনিময়ে ব্যাঙ্ক তাকে সুদ দিয়ে থাকে। তাছাড়াও অতিরিক্ত সম্পদ ঘরে রাখার চেয়ে ব্যাঙ্কে রাখা অনেকটাই নিরাপদ বলে বিবেচিত হয়। ঠিক যেমনটা আমাদের গল্পে লালার কাছে আমানতকারীরা তাদের স্বর্ণ জমা রাখত। বর্তমান প্রেক্ষাপটে যেখানে চেক বই কিংবা ডেবিট কার্ডের সুবিধা রয়েছে সেখানে ব্যাঙ্কে আমানত জমা রাখা এবং প্রয়োজনমত সেটা তুলে নিয়ে লেনদেন করা অনেক সুবিধাজনক এবং নিরাপদ। (এক্ষেত্রে কোনো বাড়ি ক্রয় করার জন্য বিশাল অঙ্কের লেনদেনের কথা কল্পনা করা যেতে পারে।)

ব্যাঙ্কের কাছে যে আমানত জমা রাখা হয় ব্যাঙ্ক সেটা দিয়ে কী করে? ব্যাঙ্কের কাছে যারা আমানত জমা রাখল তারা সবাই একসাথে সেটা তুলে নিতে আসবে না। এই অনুমান করে ব্যাঙ্ক সেই জমা আমানত থেকে যারা সুদের বিনিময়ে ঋণ নিতে আগ্রহী তাদেরকে ঋণ দিতে পারে। (অবশ্য ব্যাঙ্ককে এক্ষেত্রে এটা সুনিশ্চিত করতে হবে যে, সেই ঋণ সে সঠিক সময়ে ফিরে পাবে)। কাজেই ব্যাঙ্ক তার জমা আমানতের একটা অংশ প্রয়োজনে আমানতকারীদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য রেখে দিয়ে বাকিটা ঋণ হিসাবে বণ্টন করতে পারে। যেহেতু ব্যাঙ্ক সেই প্রদেয় ঋণ থেকে সুদ হিসাবে আয় করতে পারবে, কাজেই যে-কোনো ব্যাঙ্কই চাইবে তার ঋণ প্রদানের পরিমাণটিকে সর্বোচ্চ করতে। তবে আমানতকারীদের প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের অর্থ ফিরিয়ে দেওয়াও ব্যাঙ্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমানতকারীরা তখনই কোনো ব্যাঙ্ক তাদের আমানত জমা রাখতে চাইবে যদি তারা সুনিশ্চিত হয় যে, প্রয়োজনে যে-কোনো মুহূর্তে তারা সেই অর্থ ব্যাঙ্কে থেকে ফেরৎ পাবে। কাজেই ব্যাঙ্কের উচিত তার ঋণপ্রদানের পরিমাণটিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে আমানতকারীদের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ ফিরিয়ে দিতে তার কোনো অসুবিধা হয় না।

3.3 ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা কর্তৃক অর্থ সৃষ্টি

লালার গল্পের মতো ব্যাঙ্কও অর্থ সৃষ্টি করতে পারে। ব্যাঙ্ক ঋণ দিতে সক্ষম থাকে কেননা সে অনুমান করে নেয় যে, তার সমস্ত আমানতকারী তাদের সমস্ত আমানত একসাথে তুলে নিতে আসবে না। যখন ব্যাঙ্ক কোনো এক ব্যক্তিকে ঋণ দেয়, তখন সেই ব্যক্তির নামে একটি নতুন আমানত খতিয়ান খুলে নেয়। কাজেই পুরনো আমানত এবং নতুন আমানত (মুদ্রা সহ) মিলে মোট অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায়।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ধরা যাক, দেশে একটিমাত্র ব্যাঙ্ক রয়েছে। এই ব্যাঙ্কের জন্য একটি কাল্পনিক ব্যালেন্স শিট তৈরি করা যাক। ব্যালেন্স শিট হল যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের সম্পদ এবং দেনার একটা খতিয়ান। সাধারণভাবে ব্যালেন্সশিটের বাদিকে সম্পদের হিসাব এবং ডানদিকে দেনার হিসাব লিপিবদ্ধ করা হয়। হিসাবরক্ষণের নিয়ম অনুযায়ী ব্যালেন্স শিটের দুদিকের মানই সমান হতে হয় অর্থাৎ মোট সম্পদের পরিমাণ মোট দেনার পরিমাণের সমান হয়ে থাকে। **সম্পদ** বলতে বোঝায়, কোনো প্রতিষ্ঠানের নিজ মালিকানাধীন অথবা অন্যের কাছে তার প্রাপ্য দ্রব্যাদি। কোনো একটা ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে, তার বাড়ি, আসবাবপত্র ইত্যাদি ছাড়াও সে জনসাধারণকে যে ঋণ প্রদান করে থাকে সেটাও তার সম্পদ হিসাবে গণ্য হয়। যখন ব্যাঙ্ক কোনো ব্যক্তিকে 100 টাকা ঋণ দেয় তখন সেই 100 টাকা ওই ব্যক্তির কাছে তার প্রাপ্য সম্পদ। ব্যাঙ্কের অন্য আর এক ধরনের সম্পদ হল তার রিজার্ভ। আমানতের যে অংশ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তথা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে জমা রাখে সেগুলোকেই 'রিজার্ভ' বলা হয়ে থাকে। এই রিজার্ভ আংশিকভাবে নগদ হিসাবে এবং বাকি অংশ আর.বি.আই. দ্বারা প্রচলিত বণ্ড কিংবা ট্রেজারি বিলের মাধ্যমে সঞ্চিত থাকে। রিজার্ভ হল, আমরা ব্যাঙ্কে যে আমানত জমা রাখি তারই সমতুল্য। আমরা আমাদের আমানত ব্যাঙ্কে জমা রাখি এবং এই আমানতই হল আমাদের সম্পদ এবং এই সম্পদ আমরা যে-কোনো সময় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে উঠিয়েও নিতে পারি। ঠিক তেমনিভাবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক যেমন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া তার আমানত RBI-এর কাছে জমা রাখে, যাকে 'রিজার্ভ' বলা হয়ে থাকে। কাজেই, সম্পদ = রিজার্ভ + ঋণ।

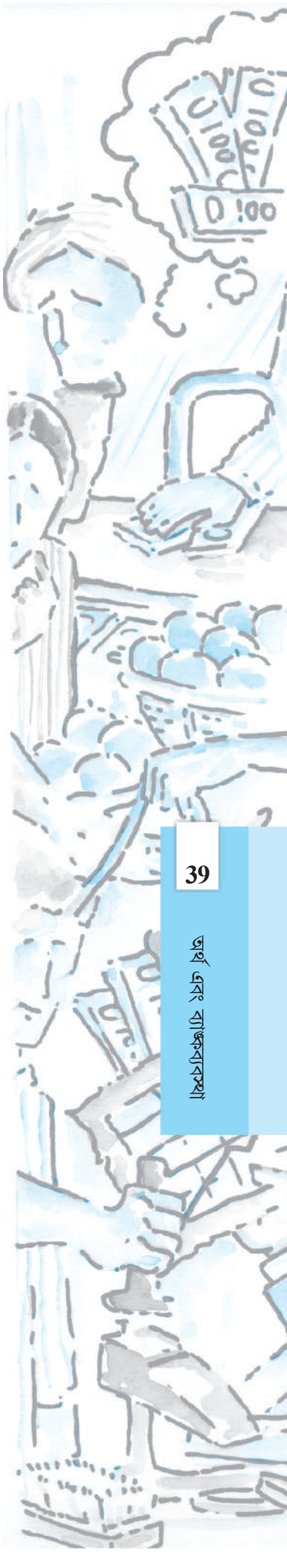

কোনো প্রতিষ্ঠানের **দেনা** বলতে বোঝায় তার নিজস্ব ঋণ অর্থাৎ অন্যের কাছে তার দেনার পরিমাণ। ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে মূল দেনা হল জনগণ তার কাছে যে আমানত জমা রাখে সেটা। অর্থাৎ,

দেনা = আমানত

হিসাবরক্ষণের নিয়ম অনুযায়ী ব্যালেন্সশিটের দুদিকের মানই সমান হতে হয়। এজন্য যদি সম্পদ দেনার চেয়ে বেশি হয়ে যায় তবে সেটা ডানদিকে নিট মূল্য হিসাবে লিপিবদ্ধ করতে হয়। অর্থাৎ,

নিট মূল্য = সম্পদ – দেনা

3.3.1 একটি কাল্পনিক ব্যাঙ্কের ব্যালেন্সশিট

ধরা যাক, আমাদের কাল্পনিক ব্যাঙ্কটির প্রাথমিকভাবে 100 টাকা আমানত (দেনা) রয়েছে। এর কারণ হিসাবে ধরা যাক যে, শ্রীমতি ফার্নাণ্ডেজ ওই ব্যাঙ্কে 100 টাকা আমানত জমা রেখেছেন। ধরা যাক, এই ব্যাঙ্কটি RBI -এর কাছে ওই সমপরিমাণ অর্থ রিজার্ভ হিসাবে জমা রাখে। সারণি 3.1 হল ব্যাঙ্কটির ব্যালেন্সশিট।

3.1 একটি ব্যাঙ্কের ব্যালেন্সশিট

সম্পদ		দেনা	
রিজার্ভ	Rs 100	আমানত	Rs 100
		নিটমূল্য	Rs 0
মোট	Rs 100	মোট	Rs 100

আমরা যদি ধরে নিই যে, বাজারে আলাদাভাবে আর কোনো কাগজী মুদ্রার প্রচলন নেই তবে অর্থ ব্যবস্থায় মোট অর্থের যোগান হল 100 টাকা।

M_1= *কাগজী মুদ্রা (কারেন্সি) + আমানত (ডিপোজিট)* = 0 +100 =100

3.3.2 ঋণ সৃষ্টির সীমা এবং অর্থগুণক

ধরা যাক, মি.মেথিউ এই ব্যাঙ্ক থেকে 500 টাকা ঋণ নিতে আসে। আমাদের ব্যাঙ্ক কি এই পরিমাণ ঋণ প্রদান করতে পারবে? যদি ব্যাঙ্ক মি. মেথিউকে এই ঋণ প্রদান করে এবং মি. মেথিউ যদি ওই পরিমাণ অর্থ আবার ব্যাঙ্কে আমানত হিসাবে জমা রাখে, তবে ব্যাঙ্কের মোট আমানতের পরিমাণ যেমন বাড়বে ঠিক তেমনি মোট অর্থের যোগানও বৃদ্ধি পাবে। এতে মনে হতে পারে যে ব্যাঙ্ক তার ইচ্ছামতো যতখুশি অর্থ সৃষ্টি করতে পারে।

কিন্তু ব্যাঙ্কের অর্থ বা ঋণ সৃষ্টির কি কোনো সীমা রয়েছে? হ্যাঁ, এবং এটা ঠিক করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তথা RBI। RBI ঠিক করে দেয় ব্যাঙ্ক তার আমানতের কত শতাংশ রিজার্ভ হিসাবে জমা রাখবে। এটা এজন্য করা হয় যেন ব্যাঙ্কগুলো অতিরিক্ত ঋণ সৃষ্টি করে না ফেলে। এটা হচ্ছে এক রকমের আইনি বাধ্যবাধকতা যেটা যে-কোনো ব্যাঙ্ককেই মেনে চলতে হয়। একে বলা হয় 'প্রয়োজনীয় সংরক্ষিত অনুপাত' বা 'সংরক্ষিত অনুপাত' বা নগদ সংরক্ষিত অনুপাত।

নগদ সংরক্ষিত অনুপাত = আমানতের যে অংশ কোনো ব্যাঙ্ক তার নিজের কাছে নগদ সংরক্ষিত রাখে।

নগদ সংরক্ষিত অনুপাত (CRR) ছাড়াও স্বল্পকালে ব্যাঙ্কগুলোকে আরও কিছু রিজার্ভ নগদ হিসাবে রাখতে হয়। এই অনুপাতকে বলা হয় বিধিবদ্ধ তারল্যের অনুপাত বা SLR।

আমাদের কাল্পনিক উদাহরণটির ক্ষেত্রে ধরা যাক, CRR = 20 %। কাজেই 100 টাকা আমানতের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ককে 20 টাকা CRR হিসাবে জমা রাখতে হবে। অবশিষ্ট 80 টাকা (100 – 20 = 80 টাকা) ব্যাঙ্ক ঋণ হিসাবে বণ্টন করতে পারবে। বিধিবদ্ধ তারল্যের অনুপাত ব্যাঙ্কের ঋণ সৃষ্টির পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

বিষয়টি ভালোভাবে বোঝার জন্য আবার আমাদের আগের উদাহরণে ফিরে যাচ্ছি। ধরা যাক, লীলা ব্যাঙ্কে 100 টাকা আমানত জমা করেছে। CRR হল 20%। কাজেই ব্যাঙ্ক 80 টাকা ঋণ হিসাবে বিতরণ করতে পারবে। ধরা যাক, ব্যাঙ্ক যশপাল কৌরকে এই 80 টাকা ঋণ হিসাবে দিল। এই টাকাটা পরবর্তী সময়ে হস্তান্তরিত হয় এই ব্যাঙ্কেই আমানত হিসাবে জমা পড়ল এবং ব্যাঙ্কের মোট আমানতের পরিমাণ হল 180 টাকা। এখন এই 180 টাকার 20% অর্থাৎ 36 টাকা CRR হিসাবে জমা রাখতে হবে। যেহেতু ব্যাঙ্কটি মোট 100 টাকা ক্যাশ নিয়ে শুরু করেছিল এবং যেহেতু এখন 36 টাকা তাকে CRR হিসাবে জমা রাখতে হবে, কাজেই ব্যাঙ্কটি আবারও 64 টাকা (100 – 36 = 64 টাকা) ঋণ হিসাবে বণ্টন করতে পারবে। এবার ধরা যাক এই 64 টাকা জুনেইদকে ঋণ হিসাবে দেওয়া হল। হস্তান্তরিত হয়ে এই টাকাটা আবার আমানত হিসাবে ব্যাঙ্কে জমা পড়ল। এভাবে ততক্ষণ চলতে থাকল যতক্ষণ পর্যন্ত না CRR -এর পরিমাণ 100 টাকা হবে ততক্ষণে মোট আমানতের পরিমাণ হয়ে যাবে 500 টাকা। কারণ এই 500 টাকা আমানতের 20% অর্থাৎ 100 টাকা হল CRR। এই পদ্ধতিটা সারণি 3.2 তে দেখানো হল।

সারণি 3.2: **অর্থ সৃষ্টির পদ্ধতি**

কলাম 1	কলাম 2	কলাম 3	কলাম 4
রাউণ্ড	ব্যাঙ্কে আমানত	প্রয়োজনীয় রিজার্ভ	ব্যাঙ্কের দেওয়া ঋণ
1	100.00	20.00	80.00
2	180.00	36.00	64.00
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
...	.	.	.
মোট	500.00	100.00	400.00

উপরের সারণিতে প্রথম কলামটি বিভিন্ন রাউণ্ড নির্দেশ করছে। দ্বিতীয় কলামটি প্রতিটি রাউণ্ডের শুরুতে আমানতের পরিমাণ নির্দেশ করছে। এই আমানতের 20% প্রয়োজনীয় জমা হিসাবে (CRR) RBI-এর কাছে সংরক্ষিত রাখতে হবে, যেটা তৃতীয় কলামটি নির্দেশ করছে। প্রতি রাউণ্ডে ব্যাঙ্ক যেটা ঋণ হিসাবে বণ্টন করছে পরবর্তী রাউণ্ডে সেটা আমানত হিসাবে যোগ হচ্ছে। চতুর্থ কলামটি ব্যাঙ্কের ঋণ বণ্টনের পরিমাণ নির্দেশ করছে।

সারণি 3.3: **একটি ব্যাঙ্কের ব্যালেন্স শিট**

সম্পদ		দেনা	
রিজার্ভ	Rs 100	আমানত (100+400)	Rs 500
ঋণ	Rs 400		
মোট	Rs 500	মোট	Rs 500

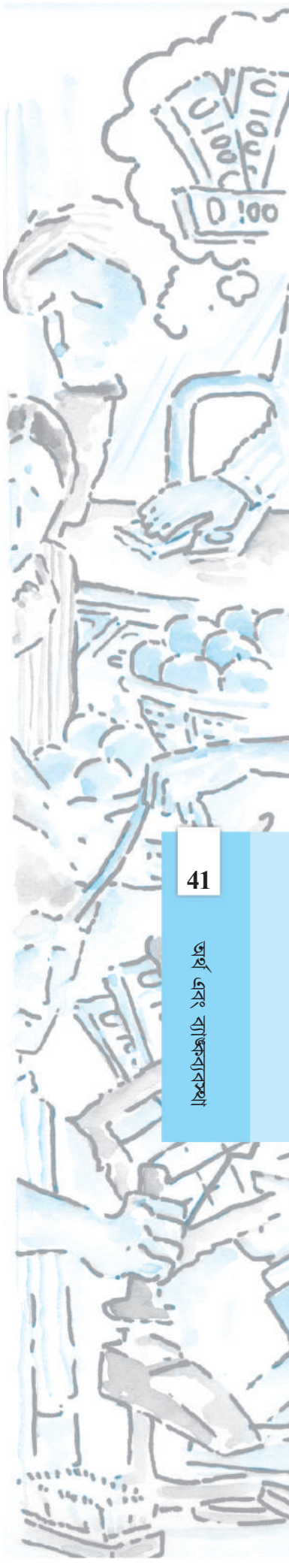

যেহেতু ব্যাঙ্ককে তার আমানতের 20% রিজার্ভ হিসাবে রাখতে হবে, তাই 100 টাকা রিজার্ভ (500 টাকার 20% = 100) রিজার্ভ হলে আমানত হবে 500 টাকা। অন্যভাবে বললে ব্যাঙ্ক 400 টাকা ঋণ হিসাবে বণ্টন করতে পারবে। সারণি 3.3 তে ব্যাঙ্কের ব্যালেন্স শীট দেখানো হয়েছে।

M_1 = কাগজী মুদ্রা + আমানত = 0 + 500 = 500

কাজেই অর্থের যোগান 100 টাকা থেকে বেড়ে 500 টাকা হয়েছে।

CRR যদি 20% থাকে তবে ব্যাঙ্ক 400 টাকা থেকে বেড়ে 500 টাকা হয়েছে। CCR যদি 20% থাকে তবে ব্যাঙ্ক 400 টাকার বেশি ঋণ দিতে পারবে না। কাজেই রিজার্ভের বাধ্যবাধকতা অর্থসৃষ্টির সীমা নির্ধারণ করে দেয়।

$$\text{অর্থগুণক} = \frac{1}{\text{নগদ সংরক্ষিত অনুপাত (CRR)}}$$

আমাদের উদাহরণে, অর্থগুণক = $\frac{1}{20\%} = \frac{1}{0.2} = 5$। কাজেই 100 টাকা রিজার্ভ, 500 টাকা (5x100) আমানত সৃষ্টি করতে সক্ষম।

3.4 অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণকারী নীতিসমূহ

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হল একমাত্র প্রতিষ্ঠান যে মুদ্রার প্রচলন করতে সক্ষম। ঋণ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর যখন অর্থের প্রয়োজন হয়, তখন ব্যাঙ্ক সেই অর্থ বাজার থেকে সংগ্রহ করতে পারে কিংবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নানারকমভাবে সেই অর্থের যোগান দিতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোকে অর্থের যোগান দেওয়া হল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একটি অন্যতম কাজ এবং এজন্যই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে **'অর্থ যোগানের শেষ অবলম্বন' (lender of last resort)** বলা হয়ে থাকে।

আর বি আই নানাভাবে অর্থব্যবস্থায় অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণের জন্য যে পদ্ধতিগুলোর ব্যবহার করে থাকে তাদেরকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে — পরিমাণগত পদ্ধতি এবং গুণগত পদ্ধতি। পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে নগদ সংরক্ষিত অনুপাত (CRR), ব্যাঙ্ক রেট, খোলা বাজারী কার্যকলাপ ইত্যাদি। গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে উৎসাহিত কিংবা নিরুৎসাহিত করে থাকে। এই ধরনের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রত্যক্ষ-ব্যবস্থা, নৈতিক প্রনোদন ইত্যাদি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি সংরক্ষিত অনুপাতের পরিবর্তন ঘটায় তবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর ঋণ প্রদানের মাত্রার পরিবর্তন ঘটে এবং এর ফলে ব্যাঙ্কের আমানতের তথা অর্থের যোগানেরও পরিবর্তন ঘটে। আমাদের পূর্ববর্তী উদাহরণের ক্ষেত্রে যদি আর বি আই সংরক্ষিত অনুপাত বাড়িয়ে 25% করে তবে অর্থগুণকের মান কী হবে? লক্ষনীয় যে, পূর্ববর্তী উদাহরণে 100 টাকা রিজার্ভ থাকলে সেটা 400 টাকা আমানত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। কিন্তু এখন 25% সংরক্ষিত অনুপাতের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র 300 টাকা ঋণ প্রদান করতে সক্ষম হবে। এক্ষেত্রে ব্যাঙ্ককে কিছু ঋণ ফিরিয়ে আনতে হবে যাতে করে সে তার রিজার্ভের পরিমাণ সঠিক রাখতে পারে। এর ফলে অর্থের যোগান হ্রাস পাবে।

খোলাবাজারী কার্যকলাপ হল আর বি আই-এর অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করার অপর একটি অস্ত্র। সরকার প্রবর্তিত বণ্ড খোলা বাজারে ক্রয় বিক্রয় করাকেই খোলাবাজারী কার্যকলাপ বলা হয়ে থাকে। এই ক্রয় বিক্রয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক করে থাকে। যখন আর বি আই কোনো সরকারি বণ্ড খোলা বাজারে ক্রয় করে তখন সে তার মূল্য চেকের মাধ্যমে দিয়ে থাকে। এই চেক অর্থব্যবস্থায় আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং সেক্ষেত্রে অর্থের যোগানেরও বৃদ্ধি ঘটায়। অপরদিকে, আর বি আই যখন বণ্ড বিক্রয় করে (বেসরকারি কোনো ব্যক্তি বিশেষ কিংবা প্রতিষ্ঠানের নিকট) তখন আমানতের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং ফলস্বরূপ অর্থের যোগানও হ্রাস পায়।

খোলাবাজারী কার্যকলাপ দু'প্রকারের হয়ে থাকে — সরাসরি এবং পুন:ক্রয়। সরাসরি যে খোলাবাজারী কার্যকলাপ সেটা একপ্রকারের স্থায়ী প্রকৃতির বলা যেতে পারে। যখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই ঋণপত্রগুলো বা সিকিউরিটিস্ ক্রয় করে

বাজারে অর্থের যোগান দেয় তখন এই ঋণপত্রগুলো আবারও বিক্রয় করার কোনো অঙ্গীকার করে না। ঠিক তেমনিভাবে যখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই ঋণপত্রগুলো বিক্রয় করে বাজার থেকে অর্থ উঠিয়ে নেয় তখনও এই ঋণপত্রগুলো আবারও ক্রয় করার কোনো অঙ্গীকার করে না। যার ফলে অর্থের প্রসারণ কিংবা সংকোচন যাই হোক না কেন সেটা হয়ে থাকে স্থায়ী প্রকৃতির। অপরপক্ষে অন্য আরেক প্রকারের খোলাবাজারী কার্যকলাপ রয়েছে যেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যখন ঋণপত্র ক্রয় করে তখন সেই চুক্তিপত্রে তার পরবর্তী বিক্রয়মূল্য এবং সময়ের উল্লেখ থাকে। এধরনের ব্যবস্থাপনাকে **পুনঃক্রয় চুক্তি বা রিপো** বলা হয়ে থাকে। যে সুদের হারে এই পদ্ধতিতে ঋণ দেওয়া হয় তাকে পুনঃক্রয়ের হার বা রিপো রেইট বলা হয়ে থাকে। একইভাবে ঋণপত্র সরাসরি বিক্রয় না করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তার পুনঃক্রয়ের সময় এবং মূল্য নির্ধারণ করে দিয়ে চুক্তিপত্রের মাধ্যমে সেগুলো বিক্রয় করতে পারে। এধরনের ব্যবস্থাপনাকে **বিপরীত পুনঃক্রয় চুক্তি বা রিভার্স রিপো** বলা হয়ে থাকে। যে সুদের হারে এই পদ্ধতিতে অর্থ বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয় তাকে বিপরীত পুনঃক্রয়ের হার বা রিভার্স রিপো রেইট বলা হয়ে থাকে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া একদিবসীয়, সাপ্তাহিক, চৌদ্দ দিবসীয় ইত্যাদি বিভিন্ন মেয়াদী পুনঃক্রয় এবং বিপরীত পুনঃক্রয় কার্যকলাপ সংগঠিত করে থাকে। এধরনের কার্যকলাপ ইদানিং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতির ক্ষেত্রে অন্যতম অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোকে আরবিআই যে সুদের হারে ঋণ দিয়ে থাকে তার পরিবর্তনের মাধ্যমেও আরবিআই বাজারে অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ভারতে এই সুদের হারকে **ব্যাঙ্ক রেট বা ব্যাঙ্ক হার** বলা হয়। ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধি পেলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট থেকে ঋণ নেওয়ার প্রবণতা কমে যায় এবং তার ফলে অর্থব্যবস্থায় অর্থের যোগান হ্রাস পায়। ঠিক একইভাবে ব্যাঙ্ক রেট হ্রাস পেলে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায়।

বক্স 3.1: অর্থের চাহিদা এবং যোগান — একটি বিস্তৃত আলোচনা

সমস্ত ধরনের সম্পদের মধ্যে অর্থের তারল্য সবচেয়ে বেশি এই কারণে যে অর্থ হল সার্বজনীন গ্রহণযোগ্য এবং এর ফলে খুব সহজেই যে-কোনো দ্রব্যের পরিবর্তে বিনিময় করা যায়। অন্যদিকে এর একটা সুযোগ ব্যয় রয়েছে। যদি অর্থ হাতে না রেখে কোনো ফিক্সড ডিপোজিট হিসাবে রাখা হয়, তবে তা থেকে সুদও অর্জন করা যায়। কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে কতটা অর্থ হাতে রাখা উচিত সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে অর্থ হাতে রাখার সুবিধার কথা যেমন মাথায় রাখতে হবে তেমনি অর্থ হাতে রাখলে যে সুদ থকে বঞ্চিত হতে হয় সে বিষয়টাও বিবেচনা করতে হবে। অর্থের চাহিদা বলতে এজন্য তারল্যের পছন্দকে বোঝানো হয়ে থাকে। মূলতঃ দুটি উদ্দেশ্যে মানুষ অর্থ হাতে রাখতে চায়।

লেনদেনের উদ্দেশ্য

অর্থ হাতে রাখার মূল যে উদ্দেশ্য সেটা হল লেনদেন। যদি তুমি তোমার আয় সাপ্তাহিকভাবে পেয়ে থাক এবং সপ্তাহের প্রথম দিনই তোমার সমস্ত খরচাপাতি করে ফেলতে হয়, তবে সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে তোমার হাতে কোনো নগদ অর্থ না থাকলেও চলে। আমাদের আয়-ব্যয়ের মধ্যে বরাবরই একটা পার্থক্য থাকে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে আয় মানুষের হাতে আসে, কিন্তু ব্যয় তাকে অবিরত করে যেতে হয়। ধরা যাক, মাসের প্রথম দিন তুমি 100 টাকা আয় কর এবং পুরো মাস ধরে সেই টাকা ব্যয় কর। কাজেই মাসের শুরুতে এবং শেষে তোমার মোট নগদ অর্থের পরিমাণ হল যথাক্রমে 100 টাকা এবং 0 টাকা। এক্ষেত্রে তোমার গড় নগদ অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় $(100 + 0) \div 2 = 50$ টাকা যা দিয়ে তুমি মাসে 100 টাকার লেনদেন করে থাক। কাজেই তোমার গড় লেনদেনের জন্য অর্থের চাহিদা হল তোমার মাসিক আয়ের অর্ধেক কিংবা তোমার মাসিক ব্যয়ের অর্ধেক।

এখন ধরা যাক, অর্থব্যবস্থায় দুটি একক রয়েছে — একটি ফার্ম (যা একজন ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত) এবং একজন শ্রমিক। ফার্মটি শ্রমিকটিকে প্রতি মাসের শুরুতে 100 টাকা মজুরি হিসাবে দিয়ে থাকে। শ্রমিকটি সেই অর্থ সারা মাসব্যাপী ওই ফার্মেরই উৎপাদিত দ্রব্য ক্রয় করতে ব্যয় করে (যেহেতু এখানে অনুমান করে নেওয়া হয়েছে যে, অর্থব্যবস্থায় একটিমাত্রই ফার্ম রয়েছে এবং সেই ফার্মটি একটিমাত্রই দ্রব্য উৎপাদন করে)। এজন্য প্রতিমাসের শুরুতে শ্রমিকের নগদ অর্থের পরিমাণ হয়

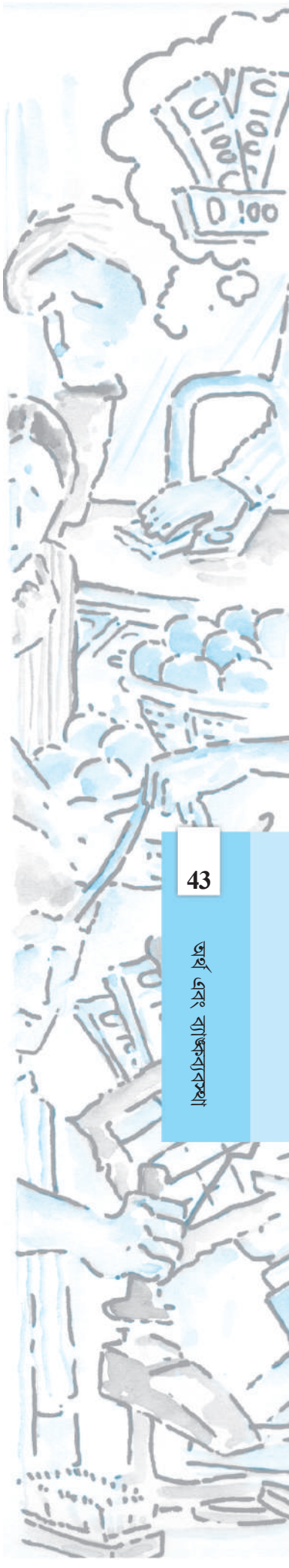

100 টাকা এবং ফার্মের 0 টাকা। মাসের শেষের দিনে সেই হিসাবটা পাল্টে যায় — তখন ফার্মটি শ্রমিকের কাছে তার উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করার ফলে ফার্মের নগদ অর্থের পরিমাণ হয় 100 টাকা এবং শ্রমিকের হয় 0 টাকা। এক্ষেত্রে গড় মাসিক নগদ অর্থের পরিমাণ, ফার্ম এবং শ্রমিক দুজনের ক্ষেত্রেই দাঁড়ায় 50 টাকা করে। কাজেই এই অর্থ ব্যবস্থায় মোট লেনদেনের জন্য অর্থের চাহিদার পরিমাণ হল 100 টাকা। এই অর্থব্যবস্থায় মোট মাসিক লেনদেনের পরিমাণ হল 200 টাকা — ফার্মটি তার 100 টাকার উৎপাদিত পণ্য শ্রমিকের নিকট বিক্রয় করেছে এবং শ্রমিকও তার 100 টাকার শ্রম ফার্মের নিকট বিক্রয় করেছে। অর্থব্যবস্থায় লেনদেনের জন্য অর্থের চাহিদা মোট লেনদেনের পরিমাণের একটা অংশমাত্র।

এজন্য সাধারণভাবে, কোনো অর্থব্যাবস্থায় লেনদেনের জন্য অর্থের চাহিদা M_T^d কে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে :

$$M_T^d = k.T \qquad (3.1)$$

এখানে, T হল লেনদেনের মোট পরিমাণ এবং k হল একটি ইতিবাচক ভগ্নাংশ।

এই দুই-একক বিশিষ্ট অর্থব্যবস্থা, যেটা উপরে বর্ণনা করা হল, সেটাকে একটু অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এটা বিস্ময়কর মনে হতে পারে যে, অর্থ ব্যবস্থায় মাত্র 100 টাকা নগদ অর্থ দিয়ে মোট 200 টাকার লেনদেন করা হয়েছে। এই রহস্যের ব্যাখ্যাটা বেশ সহজ — প্রতিটা নগদ অর্থ মাসে দু'বার করে হাত বদল করছে। মাসের প্রথম দিন যে অর্থ ফার্মের নিকট থেকে শ্রমিকের নিকট হস্তান্তরিত হচ্ছে সেটা মাসের অন্য কোনো সময় আবার শ্রমিকের হাত থেকে ফার্মের কাছে হস্তান্তরিত হচ্ছে। একটি নির্দিষ্ট সময়ে এক একক অর্থ যতবার হাত বদল করে তাকে অর্থের প্রচলন বেগ বলা হয়ে থাকে। উপরের উদাহরণে অর্থের প্রচলন বেগ হল 2। আমরা (3.1)নং সমীকরণটিকে নিম্নলিখিতভাবেও প্রকাশ করতে পারি :

$$\frac{1}{k}.M^d{}_T = T, \text{ or, } v.M^d{}_T = T \qquad (3.2)$$

যেখানে, $v = 1/k$ হল অর্থের প্রচলন বেগ। এখানে লক্ষনীয় যে, T হল পরিবর্তনশীল চলক এবং অর্থের চাহিদা ($M^d{}_T$) হল স্থিত চলক, যা কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে নগদ অর্থ হাতে রাখার পরিমাণকে বোঝায়। অর্থের প্রচলন বেগের (v) একটা সময় মাত্রা রয়েছে অর্থাৎ যে-কোনো নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি একক নগদ অর্থ যতবার হাত বদল করে সেটাই তার প্রচলন বেগ। কাজেই (3.2)নং সমীকরণের বাদিকের অংশ অর্থাৎ $v.M^d{}_T$ হল নির্দিষ্ট সময়ে মোট আর্থিক লেনদেনের পরিমাণ। এটি একটি পরিবর্তনশীল চলক এবং তাই সমীকরণের ডানদিকের অংশের সমান।

আমরা একটি অর্থ ব্যবস্থায় কোনো নির্দিষ্ট সময়ে গড় লেনদেনের জন্য অর্থের চাহিদার সাথে তার মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের বা নমিন্যাল ডিজিপি-র সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী। একটি অর্থব্যবস্থার বাৎসরিক লেনদেনের যে মূল্য সেটা অন্তবর্তী দ্রব্য ও সেবার লেনদেনের অন্তর্ভুক্তির ফলে আর্থিক বা নমিন্যাল GDP-র চেয়ে বড়ো হয়ে থাকে। সাধারণভাবে লেনদেনের মূল্যের সাথে নমিনাল GDP-র একটা স্থিতিশীল এবং ইতিবাচক সম্পর্ক থাকে। নমিনাল GDP বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ হল মোট লেনদেন মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া তথা লেনদেনের জন্য অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া। কাজেই (3.1) নং সমীকরণটিকে কিছুটা পরিবর্তিত করে আমরা লিখতে পারি :

$$M^d{}_T = kPY \qquad (3.3)$$

যেখানে, Y হল প্রকৃত GDP এবং P হল দামস্তর অর্থাৎ GDP ডিফ্লেটর। উপরের সমীকরণটি থেকে জানা যায় যে, কোনো অর্থ ব্যবস্থায় লেনদেনের জন্য অর্থের চাহিদা জাতীয় আয় এবং দামস্তর উভয়ের সাথেই ইতিবাচকভাবে সম্পর্কযুক্ত।

ফাটকার উদ্দেশ্যে

কোনো ব্যক্তি তার সম্পদ জমি, অলংকার, বণ্ড, অর্থ ইত্যাদি নানাভাবে রাখতে পারে। বোঝার সুবিধার জন্য ধরা যাক, অর্থ বাদে বাকি সমস্ত রকমের সম্পত্তি হল 'বণ্ড'। 'বণ্ড' হল এক ধরনের কাগজী দলিল যাতে নির্দিষ্ট সময় পর তা থেকে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট মূল্য প্রদানের অঙ্গীকার করা থাকে। এই কাগজী দলিল তথা বণ্ড সরকার কিংবা যে কোনো ফার্ম জনগণের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রচলন করে থাকে এবং এই বণ্ড বাজারে বিক্রয়যোগ্য। ধরা যাক, একটি ফার্ম জনগণের নিকট থেকে 100 টাকা ঋণ সংগ্রহ করতে চায়। সে একটি বণ্ড প্রচলন করল যা থেকে প্রথম বছরের শেষে 10 টাকা ফেরৎ পাওয়া যাবে এবং দ্বিতীয় বছরের শেষে 10 টাকা এবং আসল 100 টাকা অর্থাৎ মোট 110 টাকা ফেরৎ পাওয়া যাবে। ধরে নিতে হবে যে, এই বণ্ডটি একটি দুবছর মেয়াদি বণ্ড, এর লিখিত মূল্য বা ফেইস ভ্যালু 100 টাকা এবং এর কূপন হার বা কূপন রেইট 10 শতাংশ। ধরা যাক, ব্যাঙ্কের সেভিংস একাউন্টে প্রদেয় সুদের হার 5 শতাংশ। স্বাভাবিকভাবেই তুমি ব্যাঙ্কের প্রদেয় এই সুদের হারের সাথে বণ্ড থেকে প্রাপ্ত সুদের হারের একটা তুলনা করতে চাইবে। যে প্রশ্নটা তোমার মনে আসাটা স্বাভাবিক সেটা হল কত টাকা ব্যাঙ্কের সেভিংস একাউন্টে রাখলে এক বছর শেষে 10 টাকা পাওয়া যেতে পারে? ধরা যাক, এই অর্থের পরিমাণ হল X টাকা। কাজেই

$$X\left(1+\frac{5}{100}\right)=10$$

অর্থাৎ,

$$X=\frac{10}{\left(1+\frac{5}{100}\right)}$$

এই X টাকা হল 10 টাকার বর্তমান মূল্য যেটা প্রচলিত সুদের হারে বাট্টা দেওয়া হয়েছে। একইভাবে ধরা যাক, Y হল সেই অর্থের পরিমাণ যেটা ব্যাঙ্কের সেভিংস একাউন্টে রাখলে দুবছর পর 110 টাকা পাওয়া যাবে। কাজেই ব্যাঙ্ক থেকে দুবছরে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাবে তার বর্তমান মূল্য হল,

$$PV=X+Y=\frac{10}{\left(1+\frac{5}{100}\right)}+\frac{(10+100)}{\left(1+\frac{5}{100}\right)}=109.29 \text{ (প্রায়)}$$

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, তুমি যদি 109.29 টাকা ব্যাঙ্কের সেভিংস একাউন্টে রাখো তাহলে তুমি যে রিটার্ন পাবে সেটা বণ্ডের রিটার্নের সমান হবে। কিন্তু বণ্ডের বিক্রেতা কেবলমাত্র 100 টাকা লিখিত মূল্যের বিনিময়ে সমপরিমাণ অর্থ ফেরৎ দিচ্ছে। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই যেহেতু বণ্ড সেভিংস একাউন্টের চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় তাই মানুষ সেভিংস একাউন্টের বদলে বণ্ড কিনতে বেশি আগ্রহী হবে। এর ফলে প্রতিযোগিতার বাজারে বণ্ডের দাম তার লিখিত মূল্যের চেয়ে বেড়ে যাবে। বণ্ডের দাম যদি PV-এর চেয়ে বেশি হয়ে যায় অর্থাৎ সেভিংস একাউন্টের ক্ষেত্রে যে বর্তমান মূল্য তার চেয়ে বেশি হয় তবে বণ্ড সেভিংস একাউন্টের চেয়ে কম আকর্ষণীয় হয়ে পড়ে এবং মানুষ বণ্ডটি বিক্রয় করে দিতে চায়। এর ফলে বণ্ডের যোগান তার চাহিদার তুলনায় বেড়ে যায় এবং এর ফলে বণ্ডের দাম কমতে শুরু করে এবং তার দাম পুনরায় PV-এর সমান হয়ে পড়ে। কাজেই প্রতিযোগিতামূলক সম্পদের বাজারে ভারসাম্যাবস্থায় বণ্ডের দাম সবসময় তার বর্তমান মূল্যের সমান থাকে।

এখন ধরা যাক বাজারে সুদের হার 5 শতাংশ থেকে পরিবর্তিত হয়ে 6 শতাংশ হয়েছে। কাজেই বর্তমান মূল্য এবং সেই বণ্ডটির দাম হবে

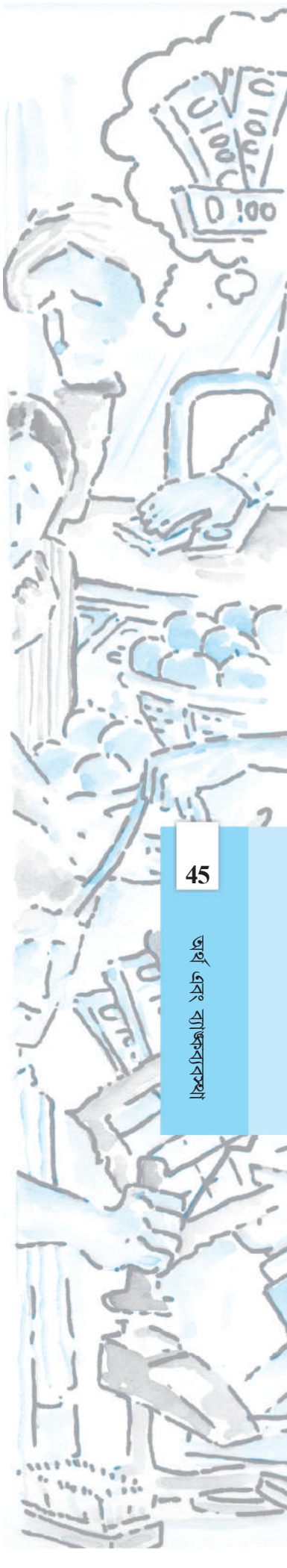

$$\frac{10}{(1+\frac{6}{100})}+\frac{(10+100)}{(1+\frac{6}{100})^2}=107.33 \text{ (প্রায়)}$$

কাজেই বণ্ডের দাম এবং সুদের হারের মধ্যে একটা বিপরীতমুখী সম্পর্ক রয়েছে।

অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে বাজারের সুদের হারের পরিবর্তনের ব্যাপারে প্রত্যাশা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। যদি তুমি মনে কর যে, বাজারে সুদের হার 8 শতাংশ হতে পারে তাহলে বর্তমান 5 শতাংশ সুদের হারটি তোমার কাছে অত্যন্ত কম এবং পরিবর্তন সাপেক্ষে বলে মনে হবে। তোমার মনে হবে যে, সুদের হার বাড়বে এবং ফলশ্রুতিতে বণ্ডের দাম কমবে। যদি তোমার কাছে বণ্ড থেকে থাকে তবে বণ্ডের দাম কমে যাওয়ার অর্থ হল তোমার লোকসান হওয়া ঠিক যেমনটা একজন সম্পত্তির মালিকের ক্ষেত্রে সম্পত্তির দাম কমে গেলে হয়ে থাকে। বণ্ডের দাম কমে যাওয়ার ফলে বণ্ডের মালিকের যে লোকসান হয় তাকে মূলধনী লোকসান বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে তুমি তোমার বণ্ড বাজারে বিক্রয় করে দিয়ে তার পরিবর্তে হাতে নগদ অর্থ রাখতে চাইবে। কাজেই, ভবিষ্যতে সুদের হার এবং বণ্ডের দামের পরিবর্তনের ব্যাপারে যে প্রত্যাশা তার কারণেই ফাটকা খেলার জন্য অর্থের চাহিদার পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

যখন সুদের হার খুব বেশি থাকে তখন সকলে এটা প্রত্যাশা করে যে ভবিষ্যতে তা নিম্নগামী হবে এবং এর ফলে বণ্ড থেকে মূলধনী লাভ অর্জন করা যাবে। কাজেই মানুষ বণ্ড ক্রয় করতে আগ্রহী হয়। ফলে ফাটকা খেলার জন্য অর্থের চাহিদা হ্রাস পায়। যখন সুদের হার নীচে নামে আসে তখন বেশিরভাগ মানুষ ভাবতে শুরু করে যে, এটা নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে ঊর্ধ্বগামী হবে এবং এর ফলে মূলধনী লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। কাজেই তারা তাদের বণ্ড বিক্রয় করে দিয়ে নগদ অর্থ হাতে রাখতে চায় যার ফলে ফাটকা খেলার জন্য অর্থের চাহিদা বেড়ে যায়। কাজেই ফাটকা খোলার জন্য অর্থের চাহিদা সুদের হারের সাথে ব্যস্তানুপাতিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। সহজভাবে ফাটকা খেলার জন্য অর্থের চাহিদাকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায়

$$M^d_S = \frac{r_{max} \quad r}{r \quad r_{min}} \qquad (3.4)$$

যেখানে r হল বাজারের সুদের হার, r_{max} এবং r_{min} হল সুদের হারের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান যার দুটোই হল ইতিবাচক ধ্রুবক। উপরের সমীকরণ থেকে এটা লক্ষণীয় যে, যখন সুদের হার r_{max} থেকে r_{min}-এ হ্রাস পায়, তখন M^d_S, 0 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ∞ হয়ে যায়।

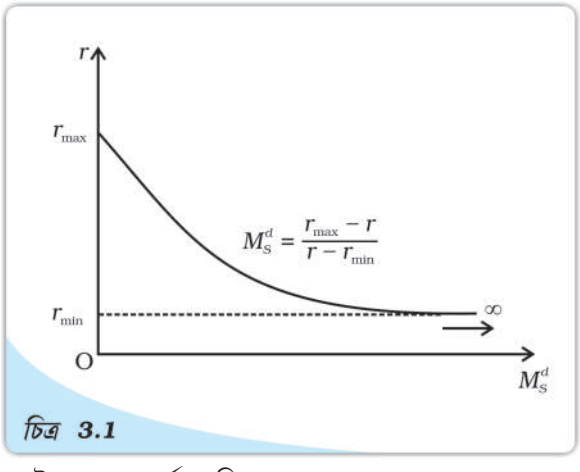

চিত্র 3.1

ফাটকার জন্য অর্থের চাহিদা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুদের হারকে সুযোগ ব্যয় হিসাবে চিন্তা করা যেতে পারে অর্থাৎ অর্থ নগদ হিসাবে হাতে ধরে রাখার মূল্য। যদি অর্থব্যবস্থায় অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায় এবং জনগণ সেই অর্থ দিয়ে বণ্ড ক্রয় করে তবে বণ্ডের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। বণ্ডের মূল্য বৃদ্ধি পাবে এবং সুদের হার হ্রাস পাবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, অর্থব্যবস্থায় অর্থের যোগান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

অর্থ হাতে ধরে রাখার যে ব্যয় অর্থাৎ সুদের হার হ্রাস পায়। বাজারে সুদের হার যদি খুব কম থাকে এবং জনগণ ভবিষ্যতে সেটা বাড়বে বলে প্রত্যাশা করে, যার ফলশ্রুতিতে মূলধনী লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে কেউই বণ্ড রাখতে চাইবে না। সবাই তার সম্পদ অর্থ হিসাবে হাতে রাখতে চাইবে এবং যদি অর্থব্যবস্থায় অতিরিক্ত অর্থের প্রবেশ ঘটানো হয় তবে সেটাও জনগণ নগদ অর্থ হিসাবেই ধরে রাখতে চাইবে, বণ্ডের চাহিদা সৃষ্টি করবে না এবং সুদের হারের আরও হ্রাস ঘটবে না যাতে করে সেটা সর্বনিম্ন সুদের হারের চেয়েও (r_{min}) নীচে নেমে যায়। এই অবস্থাকে বলা হয়ে থাকে **তারল্যের ফাঁদ**। এখানে ফাটকা খেলার জন্য অর্থের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অসীম হয়ে থাকে।

3.1 নং চিত্রে অনুভূমিক অক্ষে ফাটকা খেলার জন্য অর্থের চাহিদা এবং উল্লম্ব অক্ষে সুদের হারে পরিমাপ করা হয়েছে। যখন $r = r_{max}$ তখন ফাটকা খেলার জন্য অর্থের চাহিদা শূন্য। এক্ষেত্রে সুদের হার এতটাই বেশি যে প্রত্যেকে এটাই প্রত্যাশা করে যে, ভবিষ্যতে সুদের হার নিশ্চয় হ্রাস পাবে এবং মূলধনী মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হবে। কাজেই প্রত্যেকে তার ফাটকা খেলার জন্য যে অর্থের ভাণ্ডার সেটা দিয়ে বণ্ড কিনে নেবে। যখন $r = r_{min}$, তখন অর্থব্যবস্থা তারল্যের ফাঁদে পা দেয়। প্রত্যেকেই প্রায় সুনিশ্চিত থাকে যে, সুদের হার ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাবে এবং বণ্ডের দাম হ্রাস পাবে। কাজেই প্রত্যেকেই তার সমস্ত সম্পদ নগদ অর্থ হিসাবে ধরে রাখবে এবং এর ফলে ফাটকা খেলার জন্য অর্থের চাহিদা হবে অসীম।

অর্থব্যবস্থায় মোট অর্থের চাহিদা হল লেনদেনের জন্য অর্থের চাহিদা এবং ফাটকা খেলার জন্য অর্থের চাহিদা। প্রথমটা প্রকৃত GDP এবং দামস্তরের সাথে সমানুপাতিক সম্পর্কযুক্ত এবং দ্বিতীয়টা বাজারের সুদের হারের সাথে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্কযুক্ত। কোনো অর্থব্যবস্থার মোট অর্থের চাহিদা নীচের সমীকরণের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা যায়

$$M^d = M_T^d + M_S^d$$

$$\text{or, } M^d = kPY + \frac{r_{max} \quad r}{r \quad r_{min}} \qquad (3.5)$$

অর্থের যোগান — বিভিন্ন পরিমাপ সমূহ

আধুনিক অর্থব্যবস্থায় অর্থ বলতে মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রচলিত কাগজী এবং ধাতব মুদ্রাকে বোঝানো হয়। ভারতবর্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া কাগজী মুদ্রার প্রচলন করে থাকে। অন্যদিকে ভারত সরকার ধাতব মুদ্রার প্রচলন করে থাকে। এই কাগজী এবং ধাতব মুদ্রা ছাড়াও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে রাখা কারেন্ট কিংবা সেভিংস একাউন্টের যে জমা আমানত সেটাও অর্থ হিসাবে বিবেচিত হবে কেননা এই একাউন্টগুলো থেকে চেকের মাধ্যমে যে-কোনো লেনদেন করা সম্ভব। এ ধরনের আমানতকে চাহিদা আমানত বা ডিমাণ্ড ডিপোজিট বলা হয়ে থাকে কেননা চাহিদা অনুযায়ী ব্যাঙ্ক সেই আমানত ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকে। অন্যান্য আমানত যেমন স্থায়ী আমানতের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় পর সেই আমানত ফেরৎ নেওয়া যায় এবং এগুলোকে সময় **আমানত** বলা হয়ে থাকে।

যদিও একটি 100 টাকার নোট দিয়ে কোনো দোকান থেকে 100 টাকার পণ্য ক্রয় করা যায়, কিন্তু এই কাগজের মূল্য কিন্তু নিতান্তই নগণ্য, অন্তত 100 টাকার চেয়ে অবশ্যই কম। একইভাবে একটি 5 টাকার কয়েনের ক্ষেত্রে তার ধাতুর মূল্য অবশ্যই 5 টাকার চেয়ে কম। তবে কেন মানুষ সেই কাগজী কিংবা ধাতব মুদ্রার বিনিময়ে এর চেয়ে অধিক মূল্যবান পণ্য দিতে প্রস্তুত থাকে? কারণ এই কাগজী বা ধাতব মুদ্রার মূল্য ঠিক হয় তার প্রচলনকারী কর্তৃপক্ষের দেওয়া গ্যারান্টির ভিত্তিতে। প্রতিটি কাগজী মুদ্রায় RBI-এর গভর্নরের দেওয়া এই প্রতিশ্রুতি থাকে যে, সেই মুদ্রা RBI কিংবা কোনো বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে উপস্থাপন করা হলে সেই ব্যক্তিকে ওই মুদ্রায় লিখিত মূল্যের সমান

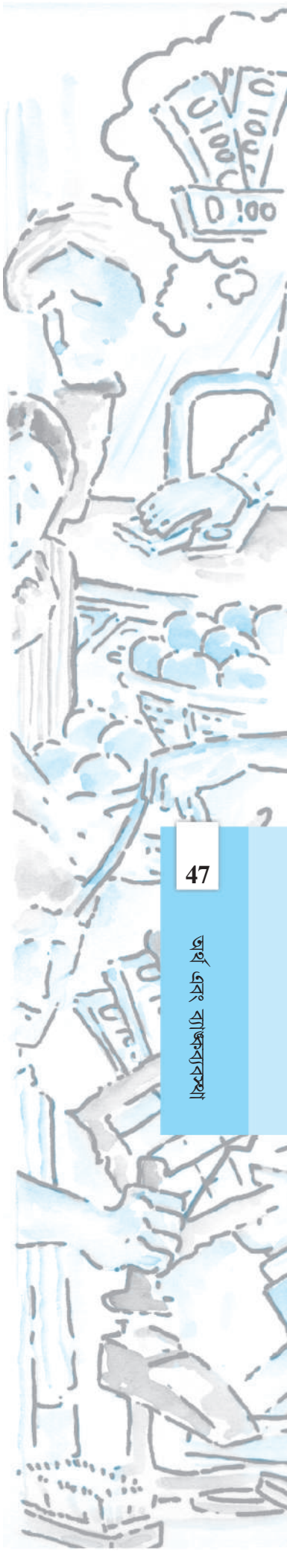

ক্রয়ক্ষমতা দিতে হবে। একই প্রতিশ্রুতি ধাতব মুদ্রার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কাগজী এবং ধাতব মুদ্রাকে এজন্য **ফিয়েট অর্থ বা আদর্শ নির্ভর অর্থ** বলা হয়। এদের স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যের মতো কোনো স্বকীয় মূল্য থাকে না। এদের **বিহিত মুদ্রা বা আইনগ্রাহ্য মুদ্রা** বলা হয়ে থাকে কেননা কোনো নাগরিক তার যে-কোনো রকম লেনদেনের ক্ষেত্রে এই মুদ্রাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না। কারেন্ট কিংবা সেভিংস একাউন্ট থেকে দেওয়া কোনো চেক লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে যে কেউ প্রত্যাখ্যান করতেই পারে। এজন্য চাহিদা আমানত কোনো বিহিত মুদ্রা হিসাবে স্বীকৃত নয়।

আইনসম্মত সংজ্ঞা : সংকীর্ণ এবং ব্যাপক অর্থ

অর্থের চাহিদার মতো অর্থের যোগানও একটি স্থিত চলক (stock variable)। একটি নির্দিষ্ট সময়ে জনসাধারণের কাছে যে পরিমাণ অর্থ মজুত থাকে তাকে অর্থের যোগান বলা হয়। RBI অর্থের যোগান পরিমাপ করার চার ধরনের মানদণ্ডের কথা উল্লেখ করেছে। যেমন, M1, M2, M3 এবং M4। এদের সংজ্ঞা নীচে দেওয়া হল :

M1 = CU + DD

M2 = M1 + পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কের সঞ্চয় আমানত

M3 = M1 + বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে নিট সময়-আমানত

M4 = M3 + পোস্ট অফিস সঞ্চয়ী সংস্থাতে মোট বিনিয়োগ (ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট ব্যতিরেকে)

এখানে, CU হল জনসাধারণের নিকট মজুত কাগজী এবং ধাতব মুদ্রা। DD হল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নিট চাহিদা আমানত। 'নিট' শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, অর্থের যোগানে কেবলমাত্র ব্যাঙ্কে রাখা জনগণের আমানতকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আন্তঃব্যাঙ্ক আমানত যেটা একটা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অন্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে রাখে সেটা অর্থের যোগানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

M1 এবং M2 হল **সংকীর্ণ অর্থ**। M3 এবং M4 হল ব্যাপক অর্থ। এই পরিমাপগুলো তারল্যের ক্রমহ্রাসমান একক নির্দেশ করে। M1 এর তারল্য সবচেয়ে বেশি এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুবিধাজনক। M4-এর তারল্য সবচেয়ে কম। অর্থের যোগানের পরিমাপ হিসাবে সর্বোচ্চ ব্যবহৃত একক হল M3। একে **সামগ্রিক আর্থিক সম্পদও**[2] বলা হয়ে থাকে।

[2]পরিশিষ্ট 3.2 দেখো। এখানে সময়ের সাথে সাথে M1 এবং M3 পরিমাপের প্রভেদ দেখতে পাবে।

বক্স 3.2: বিমুদ্রায়ণ বা নোট বাতিল বা ডিমানিটাইজেশন

অর্থ ব্যবস্থায় বিদ্যমান দুর্নীতি, কালো টাকা, সন্ত্রাসবাদ এবং নকল মুদ্রার সমস্যাগুলোকে সমাধান করার উদ্দেশ্যে 2016 সালের নভেম্বর মাসে ভারত সরকার বিমুদ্রায়ণ নামে এক নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করে। পুরোনো 500 এবং 1000 টাকার নোট এখন থেকে আর বৈধ মুদ্রা রইল না। নতুন 500 এবং 2000 টাকার নোট চালু করা হল। জনসাধারণকে 31 ডিসেম্বর 2016 -র মধ্যে তাদের পুরানো বাতিল হওয়া নোটগুলোকে ব্যাঙ্ক একাউন্টে জমা করার নির্দেশ জারি করা হল। যারা ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নোটগুলো ব্যাঙ্কে জমা করতে পারবেন না তাদের 31 শে মার্চ 2017 -এর মধ্যে তাদের নিজস্ব বিবৃতি সহ সেই নোটগুলো RBI-এ জমা করার সুযোগ দেওয়া হল।

এছাড়া অর্থব্যবস্থায় মুদ্রার সংকট কাটাতে সরকার মাথাপিছু দৈনিক 4000 টাকার পুরোনো নোটের পরিবর্তে নতুন নোট প্রদান করার সুযোগ করে দিল। তাছাড়া 12ই ডিসেম্বর, 2016 পর্যন্ত পুরোনো নোটগুলোকে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন-পেট্রোল পাম্প, সরকারি হাসপাতাল, ট্যাক্স, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি প্রদানের ক্ষেত্রে লেনদেনের জন্য বৈধ থাকবে বলে ঘোষণা করা হল।

সরকারের এই ভূমিকার প্রশংসা যেমন করা হল তেমনি এর সমালোচনাও করা হল। ব্যাঙ্ক এবং ATM বুথের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে মানুষকে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করতে হল। মুদ্রা সংকটের ফলে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অনেকাংশে ব্যাহত হল। তবে সময়ের সাথে সাথে যখন মুদ্রার যোগান বাড়ল এই সমস্যাগুলোর সমাধান হতে লাগল।

এই পদক্ষেপের ইতিবাচক দিকও ছিল। এতে যেহেতু একটা বড়ো অংশের মানুষ করের আওতায় চলে আসে তাই কর সংগ্রহের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ব্যক্তিগত সঞ্চয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় চলে আসে। এতে ব্যাঙ্কগুলোতে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায় এবং ব্যাঙ্কগুলো কম সুদে বিনিয়োগকারীদের ঋণ প্রদানে সমর্থ হয়। এটা কালো টাকা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে সরকারের একটা বিশেষ পদক্ষেপ যার মাধ্যমে এই বার্তাটাও সমাজে দেওয়া হয়েছে যে কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা আর বরদাস্ত করা হবে না। কর এড়ানোর চেষ্টা করা হলে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দুভাবেই দণ্ডিত করা হবে। এতে কর সংগ্রহের পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি দুর্নীতির মাত্রাও হ্রাস পাবে। বিমুদ্রায়ণের ফলে কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জটিলতা হ্রাস পাবে কেননা অর্থব্যবস্থা নগদ লেনদেন থেকে ডিজিটাল লেনদেনে রূপান্তরিত হতে থাকবে।

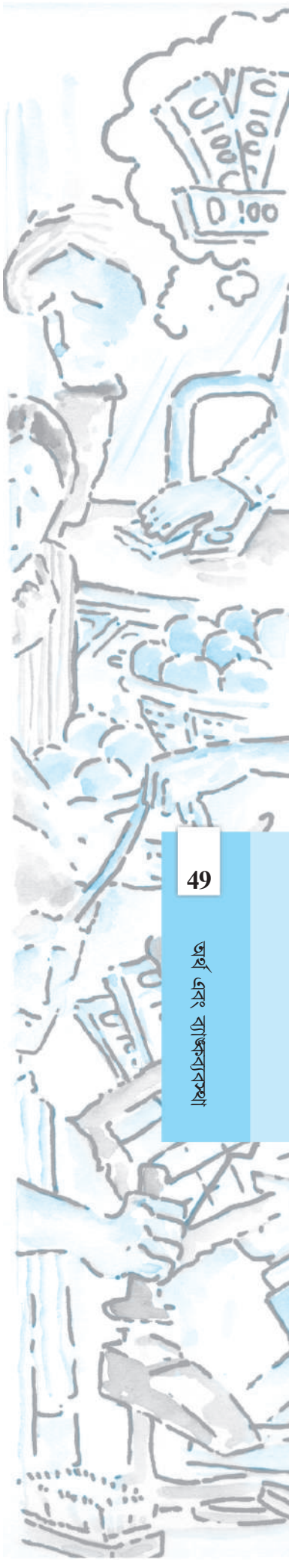

সারসংক্ষেপ

অর্থের ব্যবহার ছাড়া যে দ্রব্যের বিনিময় হয়ে থাকে তাকে বার্টার বিনিময় বলা হয়। এতে দ্বৈত সমাপতনের সমস্যা দেখা দেয়। অর্থ তার সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতার কারণে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে থাকে। আধুনিক অর্থব্যবস্থায় মানুষ মোটামুটি দুটো কারণে অর্থ নগদ হিসাবে হাতে রাখতে চায় — লেনদেনের উদ্দেশ্যে এবং ফাটকা খেলার উদ্দেশ্যে। অন্যদিকে অর্থের যোগান হল কাগজী ও ধাতব মুদ্রা, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চাহিদা এবং সময় আমানত ইত্যাদির যোগফল। তারল্যের মাত্রার ক্রমানুসারে এগুলোকে সংকীর্ণ এবং ব্যাপক অর্থে শ্রেণিবিভক্ত করা হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দেশে অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অর্থ ব্যবস্থায় অর্থের যোগান সাধারণ মানুষের নানাবিধ কার্যকলাপ তথা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এবং RBI-এর কার্যকলাপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। RBI বাজারে অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অর্থের যোগান, ব্যাঙ্ক রেট এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সংরক্ষিত অনুপাত ইত্যাদি অস্ত্রের সাহায্য নিয়ে থাকে। অর্থের যোগানের ক্ষেত্রে বাহ্যিক প্রভাবকেও RBI নিষ্ক্রিয় করে থাকে।

মূল ধারণা

সরাসরি পণ্য বিনিময় / বার্টার বিনিময়
অর্থ
হিসাব পরিমাপের একক
বণ্ড / ঋণপত্র
তারল্যের ফাঁদ
আইনগ্রাহ্য মুদ্রা বা বিহিত মুদ্রা
ব্যাপক সংজ্ঞায় অর্থ
সংরক্ষিত আমানতের অনুপাত
অর্থ গুণক
খোলাবাজারী কার্যকলাপ
নগদ সংরক্ষিত অনুপাত (CRR)
বিপরীত পুনঃক্রয়ের হার
অভাবের দ্বৈত সমাপতন
বিনিময়ের মাধ্যম
মূল্যাধার বা মূল্যের ভাণ্ডার
সুদের হার
ফিয়েট অর্থ / আদর্শ নির্ভর অর্থ
সংকীর্ণ অর্থ
মুদ্রা আমানত অনুপাত
উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অর্থ / মৌল মুদ্রা
ঋণের অন্তিম উৎস
ব্যাঙ্ক হার / ব্যাঙ্ক রেট
পুনঃক্রয় হার / রিপো রেইট

অনুশীলনী

1. সরাসরি পণ্য বিনিময় ব্যবস্থা কী? এর সীমাবদ্ধতা কী কী?
2. অর্থের মূল কাজগুলো কী কী? অর্থ কীভাবে সরাসরি পণ্য বিনিময় ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাগুলো দূর করে থাকে?
3. লেনদেনের জন্য অর্থের চাহিদা কী? কোনো নির্দিষ্ট সময়ে লেনদের মূল্যের সাথে এটি কীভাবে সম্পর্কযুক্ত?
4. ভারতে অর্থের যোগানের বিকল্প সংজ্ঞাগুলো কী কী?
5. 'বিহিত অর্থ' কী? 'ফিয়েট অর্থ' কী?
6. উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অর্থ কী?
7. একটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কার্যাবলি বর্ণনা করো।
8. অর্থগুণক কী? এই গুণকের মান কীভাবে ঠিক হয়?
9. RBI-এর আর্থিক নীতির হাতিয়ারগুলো কী কী?
10. একটি অর্থব্যবস্থায় একটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে তুমি কি 'অর্থের স্রষ্টা' হিসাবে গণ্য করবে?
11. RBI-এর কোনো ভূমিকাকে 'ঋণের অন্তিম উৎস' হিসাবে গণ্য করা হয়?

Suggested Readings

1. Dornbusch, R. and S. Fischer. 1990. *Macroeconomics*, (fifth edition) pages 345 – 427, McGraw Hill, Paris.
2. Sikdar, S., 2006. *Principles of Macroeconomics*, pages 77 – 89, Oxford University Press, New Delhi.

পরিশিষ্ট 4

অসীম গুণোত্তর শ্রেণির যোগফল

আমরা নীচের অসীম গুণোত্তর শ্রেণিটির যোগফল নির্ণয় করতে চাই

$$S = a + a.r + a.r^2 + a.r^3 + ... + a.r^n + ... + \cdot\infty$$

যেখানে a এবং r হল বাস্তব সংখ্যা (real numbers) এবং $0 < r < 1$ । যোগফল নির্ণয় করার জন্য উপরের সমীকরণটির দুদিকে r দিয়ে গুণ করা হল

$$r.S = a.r + a.r^2 + a.r^3 + ... + a.r^{n+1} \cdot + ... + \cdot \infty$$

প্রথম সমীকরণ থেকে দ্বিতীয় সমীকরণটি বিয়োগ করলে পাই

$$S - r.S = a$$

অথবা, $(1 - r)S = a$

কাজেই, $$S = \frac{a}{1-r}$$

অর্থগুণক নির্ণয় করার উদাহরণটির ক্ষেত্রে $a = 1$ এবং $r = 0.4$ । কাজেই অসীম সিরিজটির মান হল

$$\frac{1}{1-0.4} = \frac{5}{3}$$

পরিশিষ্ট 4

ভারতে অর্থের যোগান

সারণি **3.4: সময়ের সাথে M1 এবং M3-র পরিবর্তন (বিলিয়নের হিসাবে)**

বছর	*M1* *(ব্যাপক অর্থ)*	*M3* *(সংকীর্ণ অর্থ)*
1999-00	3417.96	11241.74
2000-01	3794.33	13132.04
2001-02	4228.24	14983.36
2002-03	4735.58	17179.36
2003-04	5786.94	20056.54
2004-05	6497.66	22456.53
2005-06	8263.89	27194.93
2006-07	9679.25	33100.38
2007-08	11558.10	40178.55
2008-09	12596.71	47947.75
2009-10	14892.68	56026.98
2010-11	16383.45	65041.16
2011-12	17373.94	73848.31
2012-13	18975.26	83898.19
2013-14	20597.62	95173.86
2014-15	22924.04	105501.68
2015-16	26105.67	116543.39

তথ্যসূত্র : *হ্যান্ডবুক অফ স্ট্যাটিসটিক্স অন ইন্ডিয়ান ইকোনমি, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, 2015-16*

দুটি কলামের মধ্যেকার মানের পার্থক্যটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে জমা মেয়াদি আমানতের গুণাবলির ভিত্তিতে সুস্পষ্ট হয়।

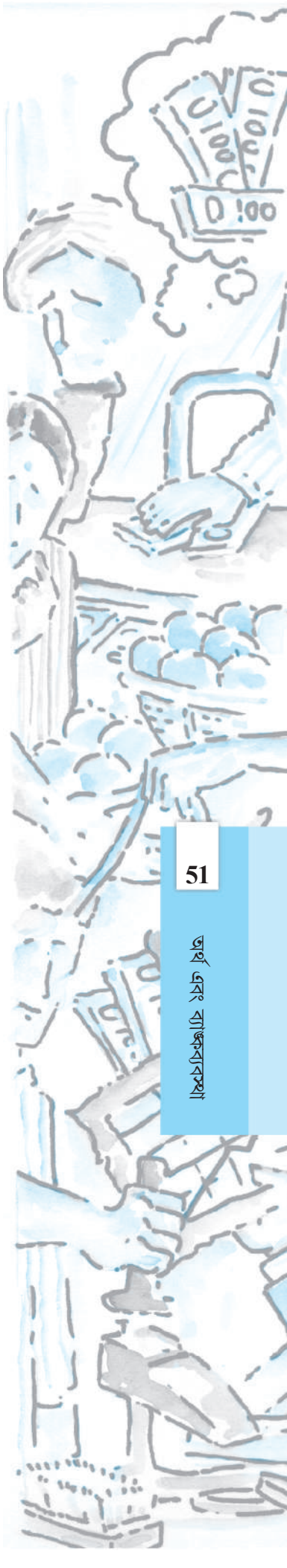

সময়ের সাথে সাথে আর্থিক ভিত্তির উৎসের গঠনের পরিবর্তন
অর্থের মজুতের উপাদানসমূহ

সারণি **3.5: আর্থিক ভিত্তির পরিবর্তনের উৎস (বিলিয়ন)**

বছর	*অর্থব্যবস্থার কারেন্সির পরিমাণ*	*ব্যাঙ্কে জমা নগদ*	*মানুষের কাছে কারেন্সি (2-3)*	*আরবিআই-এর নিকট অন্য জমা*	*আরবিআই-এর নিকট ব্যাঙ্কের আমানত*
1981-82	154.11	9.37	144.74	1.68	54.19
1991-92	637.38	26.40	610.98	8.85	348.82
2001-02	2509.74	101.79	2407.94	28.31	841.47
2004-05	3686.61	123.47	3563.14	64.54	1139.96
2005-06	4295.78	174.54	4121.24	68.43	1355.11
2006-07	5040.99	212.44	4828.54	74.67	1972.95
2007-08	5908.01	223.90	5684.10	90.27	3284.47
2008-09	6911.53	257.03	6654.50	55.33	2912.75
2009-10	7995.49	320.56	7674.92	38.06	3522.99
2010-11	9496.59	378.23	9118.36	36.53	4235.09
2011-12	10672.30	435.60	10236.70	28.22	3562.91
2012-13	11909.75	499.14	11410.61	32.40	3206.71
2013-14	13010.75	552.55	12458.19	19.65	4297.03
2014-15	14483.12	621.31	13861.82	145.90	4655.61
2015-16(P)	16634.63	653.68	15980.95	154.51	5018.26

তথ্যসূত্র : *হ্যাণ্ডবুক অফ স্ট্যাটিসটিক্স অন ইন্ডিয়ান ইকোনমি, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, 2015-16*

অধ্যায় 4

আয় ও নিয়োগ নির্ধারণ

বিভিন্ন অধ্যায়ে এখন পর্যন্ত আমরা জাতীয় আয়, দামস্তর, সুদের হার ইত্যাদি নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেছি — কিন্তু এদের মান কোনো শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে তা নিয়ে অনুসন্ধান করিনি। সামষ্টিক অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্যই হল কিছু তাত্ত্বিক পদ্ধতি তৈরি করা, যা কিনা মডেল নামে পরিচিত; যার সাহায্যে ওই চলকগুলোর মান নির্ধারণের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যায়। বিশেষত:, এই মডেলগুলোর সাহায্যে কিছু প্রশ্নের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়, যেমন একটি অর্থব্যবস্থায় ধীর প্রবৃদ্ধি বা মন্দার অথবা দামস্তর বৃদ্ধি বা বেকারত্ব বৃদ্ধির কারণ। কিন্তু একই সময়ে এই সমস্ত চলক সম্পর্কে বলা কঠিন। তাই, যখন কোনো একটি নির্দিষ্ট চলকের মান নির্ধারণের প্রশ্ন আসে, তখন অন্য চলকগুলোর মান স্থির ধরে নিতে হয়। সমস্ত তাত্ত্বিক আলোচনাতেই তা ধরে নিতে হয় এবং একে 'সেটেরিক পারিবাস নামে অভিহিত করা হয়, যার অর্থ হল 'অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত রেখে'। এই প্রক্রিয়ার নীচের বর্ণনা অনুযায়ীও চিন্তা করা যায় : দুই চলক (x ও y) সম্পন্ন দুটি সমীকরণ সমাধান করতে গেলে, একটি চলকের মান (ধরি x) প্রথমে নির্ধারণ করা হয় দ্বিতীয় চলকের সাপেক্ষে (ধরি y); এবং তারপর এই মান দ্বিতীয় সমীকরণে বসিয়ে দুটি চলকেরই মান নির্ধারণ করা হয়। সমাধান সম্পন্ন হয়। এই বিধিই সামষ্টিক অর্থনীতির বিশ্লেষণে ব্যবহার করা হয়।

এই অধ্যায়ে অর্থনীতিতে চূড়ান্ত বা সম্পূর্ণ উৎপাদিত দ্রব্যের দাম নির্দিষ্ট ও সুদের হার স্থির অনুমান করে নিয়ে জাতীয় আয় নির্ধারণ আলোচনা করা হবে। এই প্রসঙ্গে কেইন্‌স বর্ণিত তত্ত্ব এই অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

4.1 সামগ্রিক চাহিদা ও তার উপাদানসমূহ :

জাতীয় আয় হিসাবরক্ষণ বিষয়ক অধ্যায়ে ভোগ, বিনিয়োগ বা সম্পূর্ণ উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার পরিমাণ ইত্যাদি ধারণার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এই ধারণাগুলোর দুই রকম অর্থ হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই ধারণাগুলো হিসাব রক্ষার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়েছে — একটি অর্থব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট বছরে উৎপাদনের এই ধারণাগুলোর আসল বা বাস্তব মান পরিমাপ করা হয়েছে। এই আসল বা বাস্তব মানগুলোকে আমরা যথার্থ পরিমাপ হিসেবে অভিহিত করি।

যদিও এই ধারণাগুলোকে অন্য অর্থের আলোচনায় আনা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'ভোগ' কোনো একটি নির্দিষ্ট বছরে জনসাধারণের মোট ভোগকৃত দ্রব্য বা সেবার পরিমাণ নাও বোঝাতে পারে; বরং, ওই বছরে জনসাধারণ কি পরিমাণ ভোগের পরিকল্পনা করেছে তা-ও বোঝাতে পারে। একইভাবে, বিনিয়োগ বলতে একজন উৎপাদকের তার মজুতে কি

পরিমাণ বৃদ্ধির পরিকল্পনা করেছে তা বোঝাতে পারে। তা-ও আবার শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন হতেই পারে। ধরে নেওয়া যাক, উৎপাদক বছরের শেষ পর্যন্ত তার মজুত ভাণ্ডারে 100 টাকা মূল্যের দ্রব্য যুক্ত করার পরিকল্পনা করে। সুতরাং ওই নির্দিষ্ট বছরে তার পরিকল্পিত বিনিয়োগ হল 100 টাকা। কিন্তু, বাজারে তার উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়ায় তার পরিকল্পিত বিক্রয়ের তুলনায় বাস্তব বিক্রয়ের পরিমাণ বেশি হয়ে গেল। এই অতিরিক্ত চাহিদা মেটাতে গিয়ে তার মজুত থেকে অতিরিক্ত 30 টাকা মূল্যের দ্রব্য বিক্রি করতে হল। সুতরাং, বছর শেষে তার মজুত করা দ্রব্যের পরিমাণ দাঁড়ালো (100 – 30) = 70 টাকার মাত্র। তার পরিকল্পিত বিনিয়োগ 100 টাকা, কিন্তু তার বাস্তব বা ex post বিনিয়োগ হল 70 টাকা মাত্র। বিনিয়োগ, ভোগ অথবা সম্পূর্ণ উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণের পরিকল্পিত মানকে আমরা **ex ante** পরিমাপ হিসেবে অভিহিত করি।

এককথায়, **ex-ante** -এর অর্থ হল যা পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং **ex-post** যা বাস্তবেই ঘটেছে তা নির্দেশ করে। আয় নির্ধারণের পদ্ধতি জানতে গেলে আগে সামগ্রিক চাহিদার বিভিন্ন উপাদানের পরিকল্পিত মানও জানা দরকার। নীচে আমরা বিভিন্ন উপাদানগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব।

4.1.1. ভোগ

ভোগের বা ভোগের চাহিদার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হল পরিবারের আয়। একটি ভোগ অপেক্ষক ভোগ ও আয়ের মধ্যে সম্পর্ক ব্যক্ত করে। $C=f(Y)$ । যেখানে Y হল আয়ের পরিমাণ ও C ভোগের পরিমাণ। একটি সরলতম ভোগ অপেক্ষক ধরে নেয় যে, আয় পরিবর্তিত হলে ভোগ স্থির হারে পরিবর্তিত হয়। অবশ্যই, আয় শূন্য হলেও, ভোগব্যয়ের অস্তিত্ব থাকে। এই ভোগব্যয় আয়ের উপর নির্ভরশীল নয় বলে, একে স্বয়ম্ভূত ভোগ বলা হয়। নীচে একটি ভোগ অপেক্ষক দেখানো হল :

$$C=\overline{C}+cY \qquad (4.1)$$

এখানে C হল পরিবারের মোট ভোগব্যয়, যার দুইটি উপকরণ — স্বয়ম্ভূত ভোগ ($\overline{C}$) এবং প্ররোচিত বা প্রণোদিত ভোগ, (cY)। $\overline{C}$ আয়ের উপর নির্ভরশীল নয়। আয় শূন্য হলেও যে ভোগ করা হয়, তা-ই স্বয়ম্ভূত ভোগব্যয়। প্ররোচিত বা প্রণোদিত ভোগ cY আয়ের উপর নির্ভরশীল। আয়ের পরিবর্তনের ফলে ভোগব্যয়ে যে পরিবর্তন ঘটে তা বোঝানোর উদ্দেশ্যে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার ধারণাটির ব্যবহার করা হয়। 'প্রান্তিক' শব্দটির অর্থ 'অতিরিক্ত'। আয় 1 টাকা বৃদ্ধি পেলে, প্ররোচিত ভোগ c পরিমাণ বৃদ্ধি পায়; এই c হল MPC বা প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা। অতিরিক্ত 1একক আয়ের পরিবর্তনের ফলে ভোগব্যয়ের যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা বলে।

$$MPC=\frac{\Delta C}{\Delta Y}=c$$

MPC-এর মান কী কী হতে পারে তা এখন দেখা যাক। আয় পরিবর্তিত হলে, ভোগের পরিবর্তন (ΔC) কখনোই আয়ের পরিবর্তনের (ΔY) বেশি হতে পারে না। c -এর অধিকতম মান 1 হতে পারে; অর্থাৎ, আয়ের পরিবর্তনের পরিমাণের সমান ভোগব্যয়ের পরিবর্তনের পরিমাণ হলে, MPC 1 হবে। অন্যদিকে, ভোক্তা আয়ের পরিবর্তন হলেই ভোগব্যয়ের পরিবর্তন করতে না-ও চাইতে পারে; এক্ষেত্রে MPC = 0। সাধারণত: MPC-এর মান 0 থেকে 1-এর মধ্যেই থাকে (0 [MPC [1)। সরলভাবে বলতে গেলে, আয়

বৃদ্ধি পেলে (a) ভোক্তা ভোগব্যয় বৃদ্ধি একেবারেই না-ও করতে পারে (MPC=0) বা (b) আয়ের বৃদ্ধির পুরোটাই ভোগব্যয় করে নিতে পারে (MPC=1), অথবা (c) আংশিকভাবে ভোগব্যয় বৃদ্ধি করতে পারে (0< MPC<1)।

মনে কর, একটি দেশের ভোগ অপেক্ষক $C = 100 + 0.8\ Y$ । এর অর্থ হল, ওই দেশে কোনো আয় না থাকলেও নাগরিকরা 100 টাকা মূল্যের দ্রব্য ভোগ করে। অর্থাৎ ওই দেশের স্বয়ম্ভূত ভোগের পরিমাণ 100 টাকা। প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা 0.8। এর অর্থ হলো, দেশে আয় 100 টাকা বৃদ্ধি পেলে, ভোগব্যয় 80 টাকা হবে।

আমরা এর এক অন্য মাত্রায় দৃষ্টিপাত করতে পারি, আর তা-হল সঞ্চয়। আয়ের যে অংশ ভোগ করা হয় না, তা-ই সঞ্চয়। অর্থাৎ

$$S = Y - C$$

আমরা প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতার সংজ্ঞা (MPS) এভাবে দিতে পারি যে, আয়ের বৃদ্ধির ফলে সঞ্চয়ের হারের যে পরিবর্তন হয়।

$$\text{অর্থাৎ,} \quad MPS = \frac{\Delta S}{\Delta Y} = s$$

যেহেতু, $S = Y - C$

$$\text{সুতরাং,} \quad s = \frac{\Delta(Y - C)}{\Delta Y}$$
$$= \frac{\Delta Y}{\Delta Y} - \frac{\Delta C}{\Delta Y}$$
$$= 1 - c$$

কিছু সংজ্ঞা

প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (MPC): এটি হল ভোগের পরিবর্তন যা প্রতি একক আয়ের পরিবর্তনের জন্য হয়। একে c দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এবং $\frac{\Delta C}{\Delta Y}$-এর সমান হয় c।

প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা (MPS): এইটি হল সঞ্চয়ের পরিবর্তন যা প্রতি একক আয়ের পরিবর্তনের কারণে ঘটে। একে s দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং $(1-c)$-এর সমান হয় s। এর অর্থ হল, $s + c = 1$।

গড় ভোগ প্রবণতা (APC): এইটি হল প্রতি একক আয়ে ভোগের পরিমাণ। অর্থাৎ $\frac{C}{Y}$ ।

গড় সঞ্চয় প্রবণতা (APS): এইটি হল প্রতি একক আয়ে সঞ্চয়। এর অর্থ হল, $\frac{S}{Y}$ ।

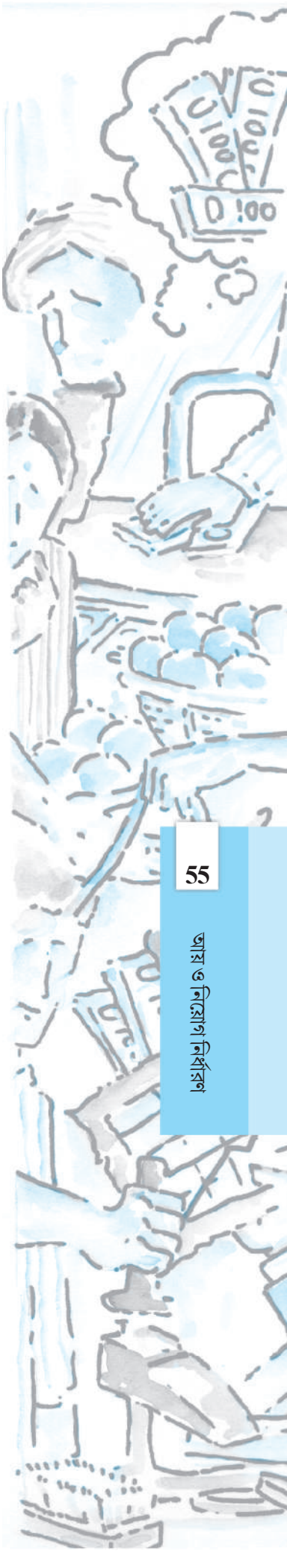

4.1.2. বিনিয়োগ

বিনিয়োগ ভৌত মূলধনের মজুত-এর সংযোজন ঘটায় (যেমন মেশিন, দালানবাড়ি, রাস্তা ইত্যাদি, অর্থাৎ এমন সকল জিনিস যা অর্থনীতির ভবিষ্যৎ উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে কাজে লাগে) এবং পরিবর্তন আনে মজুত ভাণ্ডারে (অথবা চূড়ান্ত দ্রব্যের স্টকে) একজন উৎপাদকের। উল্লেখ্য যে, 'বিনিয়োগ দ্রব্য' (যেমন মেশিন) হল চূড়ান্ত দ্রব্যের অংশ। এই সকল দ্রব্য মধ্যবর্তী পর্যায়ের (যেমন কাঁচামাল) দ্রব্য নয়। একটি অর্থনীতিতে একটি উল্লেখিত বছরে যে সকল মেশিন উৎপাদিত হয় সেগুলো অন্য দ্রব্য উৎপাদনে 'ব্যবহার করা' হয় না। কিন্তু মেশিনের কাজ পরবর্তী কয়েক বছর ধরেই চলতে থাকে।

নতুন যন্ত্রপাতি বা মেশিন ক্রয় করা, কি না করা ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত উৎপাদককেই নিতে হয়; তবে তা অনেকাংশেই বাজার সুদের হারের উপর নির্ভর করে। তবে, আলোচনা সহজ রাখার শর্তে ধরে নেওয়া হয় যে উৎপাদক প্রতিবছরই সম-পরিমাণ বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করে। সুতরাং, পরিকল্পিত বিনিয়োগ চাহিদা হল

$$I = \bar{I} \qquad (4.2)$$

যেখানে, $\bar{I}$ হল ধনাত্মক স্বয়ংভূত বিনিয়োগ (একটি অর্থনীতিতে কোনো একটি নির্দিষ্ট বছরে)।

4.2 দুই ক্ষেত্রবিশিষ্ট মডেলে আয় নির্ধারণ

সরকার বিহীন একটি অর্থনীতিতে, পরিকল্পিত ভোগ ব্যয় এবং পরিকল্পিত বিনিয়োগ ব্যয়-এর যোগফল হল কোনো একটি চূড়ান্ত বা সম্পূর্ণ উৎপাদিত দ্রব্যের সামগ্রিক চাহিদা। $AD = C + I$, যেখানে C হল ভোগ ব্যয় এবং I বিনিয়োগ ব্যয়। সমীকরণ (4.1) এবং (4.2) থেকে C এবং I-এর মান ব্যবহার করে দেখা যায়

$$AD = \bar{C} + \bar{I} + c.Y$$

চূড়ান্ত দ্রব্যের বাজারে ভারসাম্য থাকলে, এই সমীকরণকে নিম্নবর্ণিত উপায়ে দেখানো যায়

$$Y = \bar{C} + \bar{I} + c.Y$$

যেখানে Y হল পরিকল্পিত সম্পূর্ণ উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ। দুটি স্বয়ম্ভূত উপাদানকে ($\bar{C}$ ও $\bar{I}$) যোগ করে এই সমীকরণকে আরো সরলীকৃত রূপ দেওয়া যায়

$$Y = \bar{A} + c.Y \qquad (4.3)$$

যেখানে $\bar{A} = \bar{C} + \bar{I}$ হল অর্থনীতিতে মোট স্বয়ম্ভূত ব্যয়। বাস্তবে, স্বয়ম্ভূত ব্যয়ের এই দুই উপাদানের আচরণ ভিন্ন। একটি অর্থনীতিতে জীবনধারণের ভোগ ব্যয় স্তর $\bar{C}$ সময়ের সাথে মোটামুটি স্থির থাকে। কিন্তু $\bar{I}$ -এর মানে সময়ে সময়ে উঠা-নামা দেখা যায়।

এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল রাখা দরকার। (4.3) সমীকরণের বাদিকের অংশে Y ex-ante উৎপাদন বা সম্পূর্ণ উৎপাদিত দ্রব্যের পরিকল্পিত যোগান দেখায়। অন্যদিকে, সমীকরণের ডানদিকের অংশে অর্থনীতিতে সম্পূর্ণ উৎপাদিত দ্রব্যের ex ante বা পরিকল্পিত সামগ্রিক চাহিদা দেখানো হয়। সম্পূর্ণ উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারে এবং অর্থনীতিতে ভারসাম্য থাকলেই একমাত্র প্রত্যাশিত যোগান ও প্রত্যাশিত চাহিদা সমান হয়। সুতরাং, সমীকরণ (4.3) কে দ্বিতীয় অধ্যায়ের জাতীয় আয় হিসাবরক্ষণের অভেদের সঙ্গে মিলিয়ে ফেললে চলবে না, যেখানে বলা হয়েছে মোট উৎপাদনের ex post বা বাস্তব উৎপাদন সমসময়ই বাস্তব ভোগব্যয় ও বাস্তব বিনিয়োগ ব্যয়ের যোগফলের সমান হতে হবে। যদি একটি বছরে চূড়ান্ত দ্রব্যের বা পরিকল্পিত চাহিদা উৎপাদকের পরিকল্পিত মোট উৎপাদনের কম হয়, তাহলে সমীকরণ (4.3) সঠিক হবে না। মজুত জমতে থাকে গুদামে, যাকে আমরা 'অনাকাঙ্খিত মজুতের সঞ্চয়ন বা পুঞ্জীভবন' বলে অভিহিত করতে পারি। মনে রাখতে হবে উৎপাদনের যে অংশ বিক্রয় করা গেল না এবং ফলস্বরূপ যা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্মেই পড়ে রইল, তাকেই মজুত বলা হয়। এই মজুতের পরিবর্তনকে মজুত বিনিয়োগ বা ইনভেনটরী বিনিয়োগ বলা হয়, যা কি না ধনাত্মক বা ঋণাত্মক দুই-ই

হতে পারে। ইনভেনটরী বাড়লে, তা হবে ধনাত্মক মজুত ভাণ্ডার বিনিয়োগ। অন্যদিকে ইনভেনটরী কমলে তা হল ঋণাত্মক মজুতভাণ্ডার বিনিয়োগ। বিনিয়োগ মজুত ভাণ্ডারের পেছনে দুটি কারণ থাকতে পারে : (i) ফার্ম নিজে থেকেই বিভিন্ন কারণে মজুত রেখে নিতে পারে (একে বলা হয় পরিকল্পিত মজুত বিনিয়োগ), (ii) বাস্তব বিক্রয়ের পরিমাণ ও পরিকল্পিত উৎপাদন বা বিক্রয়ের পরিমাণের মধ্যে ফারাক থাকতে পারে। এর ফলে বর্তমান মজুতের সঙ্গে আরো মজুত যোগ হতেও পারে অথবা বর্তমান মজুত থেকে কিছু বিক্রিয়ও হয়ে যেতে পারে (একে বলা হয় অপরিকল্পিত মজুত বিনিয়োগ)। সুতরাং, **যদিও পরিকল্পিত *Y* পরিকল্পিত *C* + *I*-এর তুলনায় বেশি, তথাপি বাস্তব *Y* বাস্তব *C* + *I*-এর সমান হবে। হিসাবগত অভেদের ডান অংশে বাস্তব *I* তে অতিরিক্ত উৎপাদনকে অনিচ্ছাকৃত মজুত সঞ্চয়ণ হিসেবে দেখানো হবে।**

এই অবস্থায়, অর্থনীতিতে সরকারকে শামিল করা যেতে পারে। চূড়ান্ত বা সম্পূর্ণ উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাকে প্রভাবিত করতে পারে সরকারের যে দুটি অর্থনৈতিক কার্যাবলি তা হল রাজস্ব চলক কর (T)এবং সরকারী ব্যয় (G)। আমাদের আলোচনায় দুটিই স্বয়ম্ভূত। একদিকে, অন্যান্য পরিবার তথা ফার্মের মতোই সরকার নিজের ব্যয়ের মাধ্যমে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে, সরকার কর আরোপ করে পরিবারের আয়ের অংশ নিয়ে নেয়। ফলে, পরিবারের ব্যয়যোগ্য আয় দাঁড়ায় $Y_d = Y - T$ । পরিবারগুলো এই ব্যয়যোগ্য আয়ের অংশমাত্র ভোগের জন্য ব্যয় করে। সুতরাং, সমীকরণ (4.3) কে সরকারের উপস্থিতিতে পরিবর্তন করে লেখা যায় এইভাবে :

$$Y = \bar{C} + \bar{I} + G + c\,(Y - T)$$

উল্লেখ্য, এই সমীকরণে $\bar{C}$ অথবা $\bar{I}$ -এর ন্যায় $G - c.T$ স্বয়ম্ভূত রাশি $\bar{A}$ -এ যোগ হয়ে যায়। এর ফলে বিশ্লেষণে তেমন কোনো গুণগত পরিবর্তন হয় না। আলোচনা সহজ রাখার উদ্দেশ্যে সরকারি ক্ষেত্রকে অধ্যায়ের বাকি অংশে গুরুত্ব দেওয়া হবে না। এটাও উল্লেখ্য যে, সরকার কর্তৃক পরোক্ষ কর ও ভর্তুকি আরোপ করা না হলে, অর্থনীতিতে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবায় মোট মূল্য (GDP) অভিন্নরূপে জাতীয় আয়ের সমান হয়। পরের অংশে, আমরা Y-কে GDP অথবা জাতীয় আয় হিসেবে ব্যবহার করবো।

4.3 স্বল্পকালে ভারসাম্য আয় নির্ধারণ

ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে একটি বাজারে ভারসাম্যাবস্থায় চাহিদা ও যোগান আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে, চাহিদা রেখা ও যোগান রেখা একসঙ্গে ভারসাম্য দাম ও ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করে। কিন্তু সামষ্টিক অর্থনীতিতে আমরা দুই ধাপে এগোবো। প্রথম ধাপে, একটি সামষ্টিক ভারসাম্য আলোচিত হবে দামস্তরকে স্থির ধরে নিয়ে। দ্বিতীয় ধাপে, দামস্তর বারবার পরিবর্তিত হবে।

দামস্তর স্থির ধরে নেওয়ার পেছনে যুক্তি কী? দুটো কারণ দেখানো যেতে পারে : (i) প্রথমতঃ, আমরা অব্যবহৃত সম্পদসম্পন্ন (যন্ত্রপাতি, বিল্ডিং, শ্রমিক) একটি অর্থনীতি অনুমান করে নিয়েছি। এই পরিস্থিতিতে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান বিধি কাজ করে না। সুতরাং, প্রান্তিক ব্যয় না বড়িয়েও অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন করা যেতে পারে। ফলে, উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তন হলেও দামস্তর তেমন পরিবর্তন হয় না। (ii) দ্বিতীয়তঃ, এটা একটা সরলীকৃত অনুমান যা পরে পরিবর্তন করা হবে।

4.3.1 স্থির দামস্তরে সামষ্টিক ভারসাম্য

(A) জ্যামিতিক পদ্ধতি

আগেই আলোচিত হয়েছে, ভোক্তার চাহিদাকে নিম্নরূপে দেখানো যায় :

$$C = \bar{C} + cY$$

যেখানে $\bar{C}$ = স্বয়ম্ভূত ব্যয় এবং c হল প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা।

এই সম্পর্কটি আমরা কীভাবে লেখচিত্রে দেখাব? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদের স্মরণ করতে হবে 'একঘাত সমীকরণের ক্ষেত্রে ছেদককে'। অর্থাৎ,

$$Y = a + bX$$

এখানে চলকগুলো হল X এবং Y এবং এদের মধ্যে একঘাত বা লিনিয়ার সম্পর্ক রয়েছে। a এবং b হল দুইটি ধ্রুবক। চিত্র 4.1-এ এই সমীকরণটি চিত্রায়িত করা হয়েছে। ধ্রুবক 'a'-কে Y অক্ষে ছেদিতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে। এর অর্থ, X এর মান শূন্য হলে Y-এর মান a হবে। ধ্রুবক 'b' হল রেখার ঢাল।

অর্থাৎ tangent $\theta = b$।

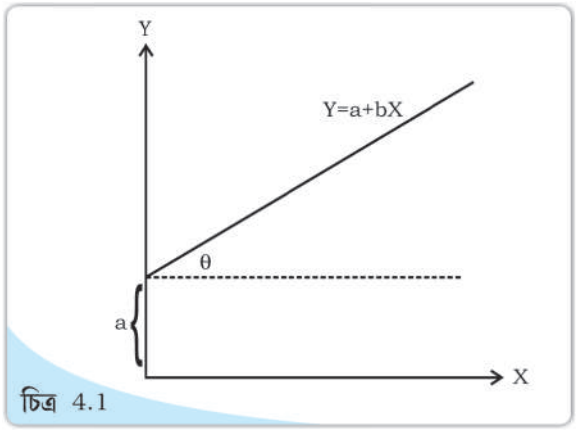

চিত্র 4.1

একঘাত সমীকরণে ছেদিতাংশ।

ভোগ অপেক্ষক - জ্যামিতিক উপস্থাপনা

একই যুক্তিতে, ভোগ অপেক্ষক হল,

$$C = \bar{C} + cY$$

যেখানে $\bar{C}$ = ভোগ অপেক্ষকের ছেদিতাংশ

c = ভোগ অপেক্ষকের ঢাল = tan α। চিত্র 4.2-তে তা দেখানো হয়েছে।

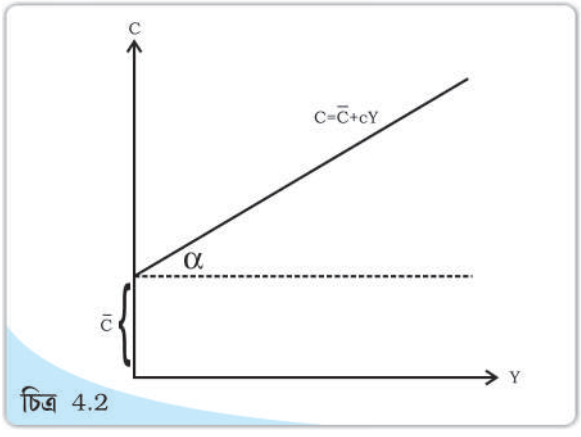

চিত্র 4.2

ছেদিতাংশ $\bar{C}$ সম্পন্ন ভোগ অপেক্ষক।

বিনিয়োগ অপেক্ষক - জ্যামিতিক উপস্থাপনা

দুই ক্ষেত্রবিশিষ্ট মডেলে, চূড়ান্ত চাহিদার দুটি উৎস থাকে --- প্রথমত: ভোগ এবং দ্বিতীয়: বিনিয়োগ।

বিনিয়োগ অপেক্ষককে $I = \bar{I}$ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

জ্যামিতিকভাবে, বিনিয়োগ অপেক্ষক অনুভূমিক অক্ষের $\bar{I}$ উচ্চতায় একটি অনুভূমিক রেখা। অর্থাৎ রেখাটি অনুভূমিক অক্ষের সমান্তরাল।

এই মডেলে I স্বয়ম্ভূত, অর্থাৎ বিনিয়োগ আয়ের উপর নির্ভরশীল নয়। আয়ের স্তর যা-ই হোক না কেন, বিনিয়োগ স্থির।

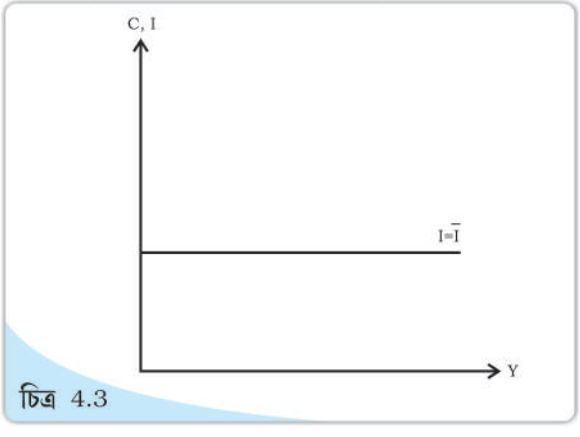

চিত্র 4.3

বিনিয়োগ অপেক্ষক যেখানে I স্বয়ম্ভূত।

সামগ্রিক চাহিদা : জ্যামিতিক লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন

প্রতিটি আয়ের স্তরে সামগ্রিক চাহিদা অপেক্ষক (রেখা) মোট চাহিদা (ভোগ + বিনিয়োগ) নির্দেশ করে। জ্যামিতিকভাবে, এর অর্থ হল ভোগ অপেক্ষক ও বিনিয়োগ অপেক্ষকের উল্লম্ব যোগফল থেকে সামগ্রিক চাহিদা অপেক্ষক পাওয়া যায়।

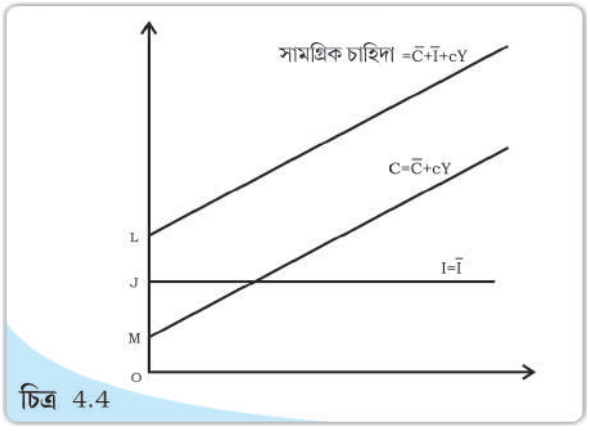

চিত্র 4.4

ভোগ অপেক্ষক ও বিনিয়োগ অপেক্ষকের উল্লম্ব যোগফলে সামগ্রিক চাহিদা পাওয়া যায়।

এখানে, OM = $\bar{C}$

OJ = $\bar{I}$

OL = $\bar{C}+\bar{I}$

সামগ্রিক চাহিদা অপেক্ষক ভোগ অপেক্ষকের সমান্তরাল। অর্থাৎ দুটো রেখার ঢাল-ই সমান (c)। মনে রাখতে হবে, এই সামগ্রিক চাহিদা অপেক্ষক বা পরিকল্পিত চাহিদা নির্দেশ করে।

সামষ্টিক ভারসাম্যে যোগানের দিক

ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে দ্রব্যের দামকে উল্লম্ব অক্ষে এবং যোগানের পরিমাণকে অনুভূমিক অক্ষে দেখিয়ে যোগান রেখা অঙ্কণ করা হয়, যা ধনাত্মক ঢালসম্পন্ন।

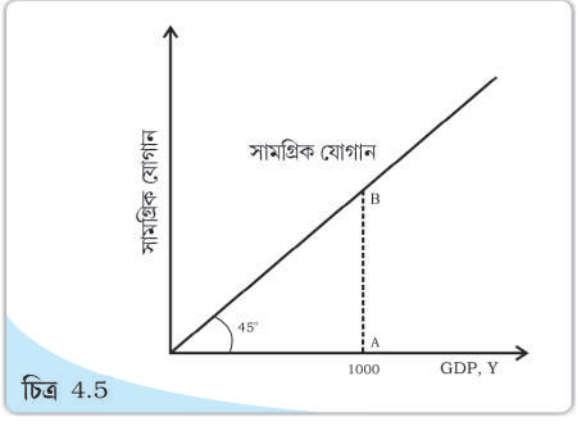

চিত্র 4.5

45° রেখায় সামগ্রিক যোগান।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক আলোচনায় প্রথম স্তরে দামস্তর স্থির ধরা হয়। এখানে, বিভিন্ন প্রকার অব্যবহৃত সম্পদ থাকার ফলে সামগ্রিক যোগান বা GDP সহজভাবে উঠানামা করতে পারে। GDP যে স্তরেই থাকুক না কেন, সেই পরিমাণ যোগান হবে এবং এতে দামস্তরের কোনো ভূমিকা নেই। এইরকম যোগান রেখা 45^0 রেখার সাহায্যে দেখানো হয়েছে। 45^0 রেখার বৈশিষ্ট্য হলো এই রেখার উপর প্রত্যেকটি বিন্দুর উল্লম্ব এবং অনুভূমিক স্থানাঙ্ক সমান। অর্থাৎ চিত্রানুযায়ী GDP এবং সামগ্রিক যোগান যে-কোনো পরিস্থিতিতেই সমান হবে।

ধরে নেওয়া যাক, A বিন্দুতে GDP = 1,000 টাকা। যোগানের পরিমাণ কী হবে? উত্তর হল, 1000 টাকার মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী। 45^0 রেখা এবং A-বিন্দুতে উল্লম্ব রেখার ছেদবিন্দু হল B। B বিন্দুতে A বিন্দুর সাপেক্ষে সামগ্রিক যোগান দেখানো হয়েছে। OA = 1000 টাকা = AB।

ভারসাম্য

পরিকল্পিত সামগ্রিক চাহিদা এবং সামগ্রিক যোগানের সাহায্যে চিত্র 4.6-এ ভারসাম্য দেখানো হয়েছে। সামগ্রিক চাহিদা এবং সামগ্রিক যোগান যে বিন্দুতে সমান হয়, সেই বিন্দুতেই ভারসাম্য নির্ধারিত হয়। সুতরাং, ভারসাম্য বিন্দু হল E এবং ভারসাম্য আয় OY_1 ।

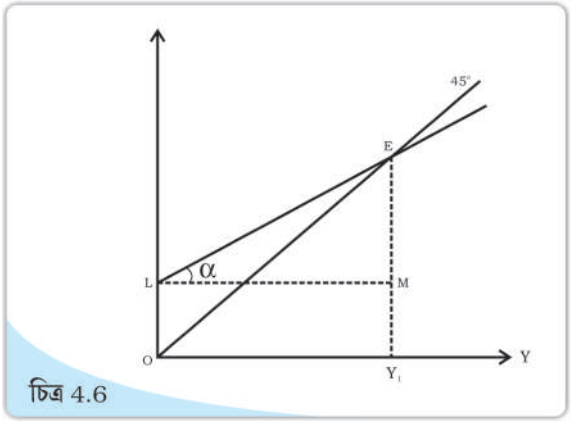

চিত্র 4.6

পরিকল্পিত সামগ্রিক চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য

(B) বীজগাণিতিক পদ্ধতি

পরিকল্পিত সামগ্রিক চাহিদা = $\bar{I}+\bar{C}+cY$

এবং সামগ্রিক যোগান = Y ।

ভারসাম্য অবস্থায় তখনই অর্থনীতি পৌঁছায় যখন উৎপাদক বা যোগানদারদের যোগান চূড়ান্ত চাহিদার সমান হয়। এই অবস্থায়, সামগ্রিক চাহিদা = সামগ্রিক যোগান,

$$\bar{C}+\bar{I}+cY=Y$$
$$Y(1-c)=\bar{C}+\bar{I}$$
$$Y=\frac{\bar{C}+\bar{I}}{(1-c)} \qquad (4.4)$$

4.3.2 আয় এবং উৎপাদনের উপর সামগ্রিক চাহিদার স্বয়ম্ভূত পরিবর্তনের প্রভাব

আমরা দেখেছি, ভারসাম্য আয়ের স্তর সামগ্রিক চাহিদার উপর নির্ভর করে। সুতরাং, সামগ্রিক চাহিদা পরিবর্তিত হলে, ভারসাম্য আয়ও পরিবর্তন হবে। নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে এই পরিবর্তন দেখা যেতে পারে :

1. ভোগের পরিবর্তন : ভোগের পরিবর্তন হতে পারে (i) $\bar{C}$ পরিবর্তিত হলে, (ii) c পরিবর্তিত হলে।
2. বিনিয়োগ পরিবর্তন : আমরা আগেই অনুমান করে নিয়েছিলাম যে বিনিয়োগ স্বয়ম্ভূত। অর্থাৎ বিনিয়োগ আয়ের উপর নির্ভর করে না। তবে আয় ব্যতীত আরো অনেক উপাদান বা চলক আছে যারা বিনিয়োগকে প্রভাবিত করতে পারে। এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল ঋণের প্রাপ্যতা বা ঋণ লভ্যতা। সহজলভ্য ঋণ বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে। অন্য একটি উপাদান বা চলক যা বিনিয়োগকে প্রভাবিত করতে পারে, তা হল সুদের হার। সুদের হার বিনিয়োগকৃত তহবিলের খরচ/মূল্য। সুদের হার বাড়লে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হয়। অর্থাৎ বিনিয়োগ কমে যায়। ফার্ম তখন কম বিনিয়োগ করে।

ধরি, $C=40+0.8\ Y$, $I=10$। এক্ষেত্রে ভারসাম্য আয় (AD থেকে Y পাওয়ার সমীকরণে মান বসিয়ে) হবে 250[1] ।

এখন, ধরা যাক বিনিয়োগ বেড়ে হল 20। এক্ষেত্রে দেখা যাবে, ভারসাম্য আয় হবে 300। লেখচিত্রেও সেটা পরিলক্ষিত হয়। আয়ের এই বৃদ্ধির কারণ হল বিনিয়োগ বৃদ্ধি যা এখানে স্বয়ম্ভূত ব্যয়ের একটি উপাদান।

যখন স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বাড়ে তখন AD_1 রেখা সমান্তরালভাবে ঊর্ধ্বমুখে স্থানান্তরিত হয় এবং অনুমান করা

[1] $Y=C+I=40+0.8Y+10$, যার ফলে $Y=50+0.8Y$, অথবা $Y=\frac{1}{1-0.8}50=250$

হল রেখাটি AD_2 অবস্থানে চলে যাবে। উৎপাদনের Y_1^* স্তরে সম্মিলিত চাহিদার মান হবে Y_1^* F যা উৎপাদনের মান $0Y_1^* = Y_1^*$ E_1-এর চাইতে E_1F পরিমাণ বেশি হয়। E_1F অতিরিক্ত চাহিদার পরিমাণ পরিমাপ করে যা স্বয়ম্ভূত ব্যয়ের বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে অর্থনীতিতে আবির্ভূত হয়। সুতরাং, E_1 দীর্ঘসময় ধরে ভারসাম্য নির্দেশ করবে না। চূড়ান্ত দ্রব্যের বাজারে নতুন ভারসাম্য খোঁজে বের করতে আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে সেই বিন্দুর দিকে যেখানে নতুন সম্মিলিত চাহিদা রেখা, AD_2, ছেদ করবে 45° রেখাকে। এই ঘটনাটি ঘটবে E_2 বিন্দুতে। ফলে E_2 বিন্দুটি হবে নতুন ভারসাম্য বিন্দু। এক্ষেত্রে নতুন ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ ও সম্মিলিত চাহিদা হবে যথাক্রমে Y_2^* এবং AD_2^* ।

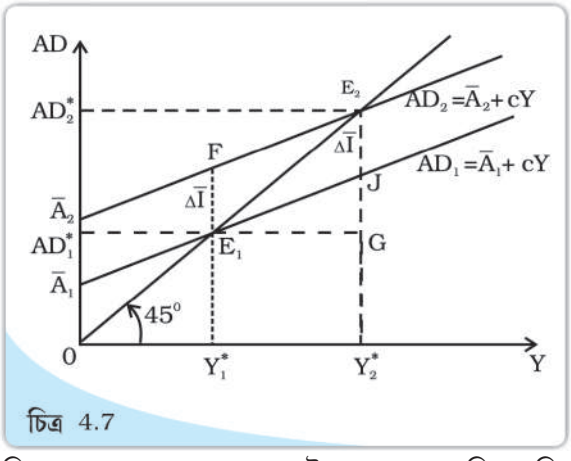

চিত্র 4.7

স্থির দামের মডেলে ভারসাম্য উৎপাদন ও সামগ্রিক চাহিদা

এখানে উল্লেখ্য যে, নতুন ভারসাম্য উৎপাদন ও সম্মিলিত চাহিদা বেড়েছে $E_1G = E_2G$ পরিমাণ, যা স্বয়ম্ভূত ব্যয়ের প্রাথমিক বৃদ্ধি $\Delta\bar{I} = E_1F = E_2J$-এর অপেক্ষা বেশি। এর অর্থ হল, উৎপাদন ও সম্মিলিত চাহিদার ভারসাম্য মানের উপর স্বয়ম্ভূত ব্যয়ের প্রাথমিক বৃদ্ধির গুণক প্রভাব পড়ছে। কোন্ কারণসমূহের জন্য সম্মিলিত চাহিদা ও উৎপাদনের সেই পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে যা স্বয়ম্ভূত ব্যয়ের প্রাথমিক বৃদ্ধির আকারের চাইতে বেশি হয়? এই বিষয়ে আমরা 4.3.3 বিভাগে আলোচনা করব।

4.3.3 গুণক প্রক্রিয়া

আগের পরিচ্ছেদে দেখা গেল যে, 10 এক স্বয়ম্ভূত ব্যয়ের পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্য আয় 50 একক (250 থেকে 300 একক) বৃদ্ধি পেল। গুণক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই পদ্ধতি বোঝা যাবে।

চূড়ান্ত উৎপাদিত দ্রব্য উৎপাদনে বিভিন্ন উপাদান যেমন শ্রম, মূলধন, জমি ও উদ্যোগী / উদ্যোক্তা নিয়োজিত হয়। পরোক্ষ কর ও ভতুর্কি-এর অনুপস্থিতিতে চূড়ান্ত উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্যমান উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বণ্টিত হয় — শ্রমের জন্য মজুরী, মূলধনের জন্য সুদ, জমির জন্য খাজনা ইত্যাদি। এরপর যে পরিমাণ বাকি থাকে তা উদ্যোক্তা তার মুনাফা হিসেবে রেখে দেয়। সুতরাং, একটি অর্থনীতিতে সামগ্রিক উপকরণ ব্যয়ের সমষ্টি, অর্থাৎ জাতীয় আয় ওই অর্থনীতির উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রীর সামগ্রিক মূল্যের অর্থাৎ GDP-এর সমান।

উপরের উদাহরণে, অতিরিক্ত উৎপাদনের মূল্য 10, বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে উপকরণ ব্যয় হিসেবে বণ্টিত হয় এবং এর ফলে অর্থনীতির আয় 10 বেড়ে যায়। আয় যখন 10 বাড়ে, তখন ভোগ ব্যয় $(0.8)10$ পরিমাণ বাড়ে যেহেতু ভোক্তারা তাদের অতিরিক্ত আয়ের 0.8 (= mpc) অংশ ভোগ করে। সুতরাং, পরবর্তী রাউণ্ডে সামগ্রিক চাহিদার বৃদ্ধি হয়। $(0.8)10$ পরিমাণ এবং এর ফলে আবার $(0.8)10$ পরিমাণ অতিরিক্ত চাহিদার সৃষ্টি হয়। ফলস্বরূপ, পরবর্তী উৎপাদন চক্রে, উৎপাদকেরা ভারসাম্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত উৎপাদন $(0.8)10$ পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এই অতিরিক্ত উৎপাদন উপকরণের মধ্যে বণ্টিত হলে আয় আবারও $(0.8)10$ পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ভোগের চাহিদা আরো $(0.8)^2 10$ পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অতিরিক্ত চাহিদা

মেটাতে উৎপাদকদের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত আয়ের একটি অংশ (0.8) উৎপাদিত দ্রব্যের ভোগে ভোক্তাদের ব্যয়ের এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে এবং প্রতিবার অতিরিক্ত চাহিদার সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক রাউন্ডের সামগ্রিক চাহিদা ও উৎপাদনের পরিমাণ আমরা সারণি 4.1-এ দেখতে পাই।

সারণির শেষ কলামটিতে (স্তম্ভটিতে) প্রত্যেক রাউন্ডে চূড়ান্ত দ্রব্যের উৎপাদনের মূল্য বা মান (এবং অর্থনীতির মোট আয়) দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় কলামে ভোগব্যয়ের বৃদ্ধি এবং তৃতীয় কলামে সামগ্রিক চাহিদার বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। চূড়ান্ত বা সম্পূর্ণ দ্রব্যের মানের মোট বৃদ্ধি নির্ধারণ করতে হলে, শেষ কলামের গুণোত্তর প্রগতি সিরিজকে যোগ করতে হবে। অর্থাৎ,

$$10 + (0.8)10 + (0.8)^2\, 10 + \ldots\ldots\ldots\infty$$
$$= 10\,\{1 + (0.8) + (0.8)^2 + \ldots\ldots\infty\} = \frac{10}{1-0.8} = 50$$

সারণি **4.1: চূড়ান্ত দ্রব্যের বাজারে গুণক প্রক্রিয়া**

	ভোগ ব্যয়	*সামগ্রিক চাহিদা*	*উৎপাদন / আয়*
রাউন্ড 1	0	10 (স্বয়ম্ভুত বৃদ্ধি)	10
রাউন্ড 2	(0.8)10	(0.8)10	(0.8)10
রাউন্ড 3	$(0.8)^2 10$	$(0.8)^2 10$	$(0.8)^2 10$
রাউন্ড 4	$(0.8)^3 10$	$(0.8)^3 10$	$(0.8)^3 10$
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	ইত্যাদি

সুতরাং, মোট উৎপাদনের বৃদ্ধি প্রাথমিক স্বয়ম্ভুত ব্যয়ের তুলনায় বেশি। চূড়ান্ত দ্রব্যের উৎপাদনের ভারসাম্য মানের বৃদ্ধি ও স্বয়ম্ভুত ব্যয়ের প্রাথমিক বৃদ্ধির অনুপাতকে অর্থনীতির **বিনিয়োগ গুণক** বলে। স্মরণ করা যেতে পারে যে 10 এবং 0.8 যথাক্রমে $\Delta \bar{I} = \Delta \bar{A}$ এবং mpc নির্দেশ করে। গুণকের রূপকে এমনভাবে দেখানো যায় :

$$\text{বিনিয়োগ গুণক} = \frac{\Delta Y}{\Delta \bar{A}} = \frac{1}{1-c} = \frac{1}{S} \qquad (4.5)$$

যেখানে ΔY হলে চূড়ান্ত দ্রব্য উৎপাদনে বৃদ্ধির পরিমাণ, c হল প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (mpc)। উল্লেখ্য, গুণকের আকার c -এর মানের উপর নির্ভর করে। c যত বড়ো হবে, গুণক তত বৃদ্ধি পাবে।

সঞ্চয়ের ধাঁধা

অর্থব্যবস্থায় সমস্ত জনগণ যদি আয়ের আনুপাতিক সঞ্চয় বাড়িয়ে দেয় অর্থাৎ প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা যদি বাড়ে, তাহলে অর্থনীতির মোট সঞ্চয় বাড়বে না — সঞ্চয় হয় কমে যাবে, নয়তো একই থাকবে। এই ঘটনাকে বলা হয় সঞ্চয়ের ধাঁধা। অর্থনীতির সমস্ত জনগণ বা ভোক্তা যদি সঞ্চয়ী হয়ে যায়, তাহলে শেষ পর্যন্ত তাদের মোট সঞ্চয় হয় কম হবে নয়তো আগের মতোই থাকবে। যদিও এই কথাগুলো অবাস্তব বা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে, তবুও তা আলোচিত মডেলের একটি সরল প্রয়োগ।

আমাদের ধরে নেওয়া উদাহরণ দিয়েই আমরা আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাবো। মনে করা যাক, যখন প্রাথমিক ভারসাম্য আয় $Y = 250$, তখন মানুষের ব্যয়ের ধরনে একটা প্ররোচিত বা স্বয়ম্ভূত পরিবর্তন বা স্থানান্তর দেখা দিল — মানুষ হঠাৎ করে অতি সঞ্চয়ী হয়ে গেল। আসন্ন যুদ্ধ বা কোনো রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জনগণ এই রকম আচরণ করতে পারে। মানুষ ব্যয়ের প্রতি রক্ষণশীল মনোভাব প্রকাশ করে। অর্থনীতিতে প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা হ্রাস পায়। ধরে নেওয়া হল 0.8 থেকে 0.5-এ নেমে এল। প্রাথমিক আয় স্তর $AD_1^* = Y_1^* = 250$ তে mpc-এর আকস্মিক হ্রাস সামগ্রিক ভোগ ব্যয়কেও নামিয়ে আনে। ফলে সামগ্রিক চাহিদা, $AD = \bar{A} + cY$, $(0.8 - 0.5)\ 250 = 75$ একক পরিমাণ হ্রাস পায়। একে ভোগব্যয় স্বয়ম্ভূত হ্রাস বলা যেতে পারে যা mpc পরিবর্তনের ফলেই সম্ভব এবং কোনো মতেই তা মডেলের অন্যান্য চলক পরিবর্তনের জন্য নয়। অতিরিক্ত চাহিদা 75 একক পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় $Y_1^* = 250$ তা মেটাতে পারে না। ফলে অর্থনীতিতে 75 একক অতিরিক্ত যোগানের সৃষ্টি হয়। এইভাবে মজুত ঘরে মজুত বাড়তে থাকে এবং উৎপাদকেরা উৎপাদনের পরিমাণে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য উৎপাদনের পরিমাণ 75 একক কম করে। কিন্তু এর অর্থ হলো পরের রাউন্ডে উপকরণ ব্যয় কমে যায় এবং এর ফলে আয়ও 75 একক কমে যায়। আয় কমে গেলে স্বাভাবিকভাবেই ক্রেতারা আনুপাতিক হারে ভোগ ব্যয় কমাতে বাধ্য হয় (মনে রাখতে হবে নতুন mpc = 0.5)। ভোগ ব্যয় এবং সামগ্রিক চাহিদা $(0.5)75$ পরিমাণ হ্রাস পায়। ফলে আবার বাজারে অতিরিক্ত যোগান দেখা দেয়। পরের রাউন্ডে উৎপাদকেরা উৎপাদন আরও $(0.5)75$ পরিমাণ কমিয়ে দেয়। জনগণের আয়ও আবার কমে। ভোগ ব্যয় এবং সামগ্রিক চাহিদা $(0.5)^2\ 75$ পরিমাণ কমে যায়। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। যাই হোক না কেন, ক্রমিক চক্রের প্রভাবে মূল্য হ্রাস থেকে বোঝা যায় যে প্রক্রিয়াটি কেন্দ্রাভিমুখী। উৎপাদন ও সামগ্রিক চাহিদায় মানের মোট হ্রাসের পরিমাণ কত? অসীম সিরিজ $75 + (0.5)\ 75 + (0.5)^2\ 75 + \ldots\ldots \infty$ কে যোগ করা হলে উৎপাদনের মোট হ্রাস

$$\frac{75}{1-0.5} = 150$$

কিন্তু, এর অর্থ হল, অর্থনীতির নতুন ভারসাম্য উৎপাদন হবে মাত্র $Y_2^* = 100$। সব মানুষ সম্মিলিতভাবে এখন সঞ্চয় করছে $S_2^* = Y_2^* - C_2^* = Y_2^* - (\bar{C} + c_2.Y_2^*) = 100 - (40 + 0.5 \times 100) = 10$, যেখানে পূববর্তী ভারসাম্যে তারা সঞ্চয় করছিল $S_1^* = Y_1^* - C_1^* = Y_1^* - (\bar{C} + c_1.Y_1^*) = 250 - (40 + 0.8 \times 250) = 10$, যেখানে পূর্ববর্তী mpc, $c_1 = 0.8$ ছিল। সুতরাং, অর্থনীতিতে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ অপরিবর্তিতই থেকে যাচ্ছে।

$\bar{A}$ পরিবর্তিত হলে সামগ্রিক চাহিদা রেখা সমান্তরালভাবে নিম্নাভিমুখী বা উচ্চাভিমুখী স্থানান্তরিত হয়। c পরিবর্তিত হলে, রেখাটি উপরে বা নীচে ঘুরে গিয়ে স্থান পরিবর্তন করে।

mps-এর বৃদ্ধি বা mpc-এর হ্রাস *AD* রেখার ঢাল হ্রাস করে এবং রেখাটির ডানদিকে নীচের দিকে ঘুরে যায়। চিত্র 4.8-এ তা দেখানো হয়েছে।

প্রাথমিক অবস্থায় স্থিতিমাপের মান $\bar{A}$ = 50 এবং c = 0.8, সমীকরণ (4.4) থেকে উৎপাদন এবং সামগ্রিক চাহিদার পরিমাণ পাওয়া যায়

$$Y_1^* = \frac{50}{1-0.8} = 250$$

স্থিতিমাপের পরিবর্তিত মান c = 0.5 হলে, উৎপাদন ও সামগ্রিক চাহিদার নতুন ভারসাম্য মান

$$Y_2^* = \frac{50}{1-0.5} = 100$$

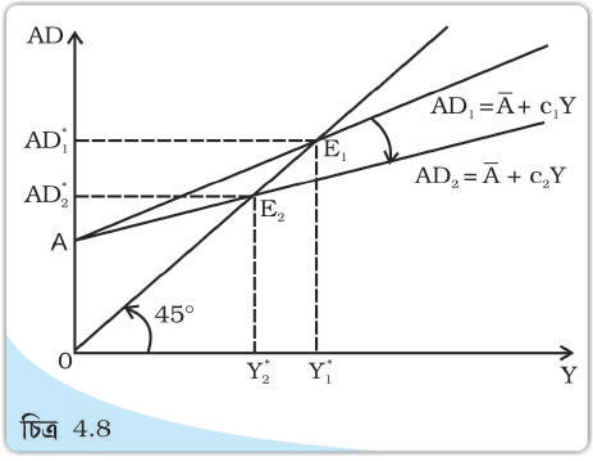

চিত্র 4.8

সঞ্চয়ের ধাঁধা - AD রেখার ডানদিকে নিম্নমুখী ঘূর্ণন।

ভারসাম্য উৎপাদন ও সামগ্রিক চাহিদা 150 একক হ্রাস পেয়েছে। আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে এর ফলে মোট সঞ্চয়ের মূল্যের কোনো পরিবর্তন হয় না।

4.4 আরো কিছু ধারণা

উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণের পরিমাণ দেওয়া থাকলে, অর্থনীতিতে ভারসাম্য উৎপাদন নিয়োগ স্তরও নির্ধারণ করে। এর অর্থ হল, *Y* এবং *AD*-এর সমতা থেকে নির্ধারিত উৎপাদন স্তর যে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থার উৎপাদন স্তর তা না-ও হতে পারে।

পূর্ণ নিয়োগ স্তরের আয় হল সেই আয় স্তর যেখানে উৎপাদনের সমস্ত উপকরণ উৎপাদন পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ নিয়োজিত থাকে, অর্থাৎ অনিয়োজিত কোনো উপকরণ নেই। মনে রাখতে হবে *Y* এবং *AD* -এর সমতা বিন্দুতে নির্ধারিত ভারসাম্য সম্পদ বা উপকরণের পূর্ণ নিয়োগ দেখায় না। ভারসাম্য বলতে সেই অবস্থাকে বোঝায় যখন উপকরণের অপূর্ণ নিয়োগ থাকলেও কোনো অবস্থাতেই অর্থনীতির আয় স্তর পরিবর্তিত হয় না। ভারসাম্য আয় স্তর পূর্ণ নিয়োগে আয় স্তরের বেশি বা কম হতে পারে। যদি তা পূর্ণ নিয়োগ আয় স্তরের কম হয়, তাহলে এর কারণ হল সমস্ত উপকরণ নিয়োজিত হওয়ার মতো চাহিদা অর্থনীতিতে নেই। এই অবস্থাকে বলে 'অপর্যাপ্ত চাহিদা'র অবস্থা। এর ফলে দীর্ঘকালে দামস্তর হ্রাস পায়। অন্যদিকে, ভারসাম্য আয় 'পূর্ণ নিয়োগে আয় স্তরের' বেশি হলে এর অর্থ হল পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় উৎপাদিত দ্রব্যের তুলনায় অর্থনীতিতে চাহিদা বেশি। এই অবস্থাকে বলে 'অতিরিক্ত চাহিদা'। এর ফলে দীর্ঘকালে দামস্তর বৃদ্ধি পায়।

সারসংক্ষেপ

কোনো একটি নির্দিষ্ট দামস্তরে যখন চূড়ান্ত বা সম্পূর্ণ উৎপাদিত দ্রব্যের জন্য সামগ্রিক চাহিদা তার সামগ্রিক যোগানের সমান হয়, তখন চূড়ান্ত দ্রব্যের বাজার ভারসাম্যে পৌঁছায়। সামগ্রিক চাহিদার উপাদানগুলো হল পরিকল্পিত ভোগ ব্যয়, পরিকল্পিত বিনিয়োগ, সরকারি ব্যয় ইত্যাদি। এক একক আয় বৃদ্ধির ফলে পরিকল্পিত ভোগব্যয়ের বৃদ্ধির হারকে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা বলে। অর্থনীতিতে চূড়ান্ত দ্রব্য সামগ্রীর সামগ্রিক চাহিদা নির্ধারণে স্বল্পকালে দ্রব্যের দাম ও সুদের হার স্থির রাখা হয়। আরও অনুমান করে নেওয়া হয় যে, এই দাম স্তরে সামগ্রিক যোগান সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক। এই অবস্থায় সামগ্রিক উৎপাদন নির্ধারিত হয় শুধুমাত্র সামগ্রিক চাহিদার পরিমাণের উপর ভিত্তি করে। একে বলা হয় কার্যকরি চাহিদা নীতি। স্বয়ম্ভূত ব্যয় বৃদ্ধির (হ্রাসের) ফলে চূড়ান্ত দ্রব্যের সামগ্রিক উৎপাদন গুণক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আরো বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি (হ্রাস) পায়।

মূল ধারণা

সামগ্রিক চাহিদা
ভারসাম্য
এক্স পোস্ট বা বাস্তব
প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা
মজুতের অনাকাঙ্খিত পরিবর্তন
স্থিতিমাপের স্থানান্তর
সঞ্চয়ের ধাঁধা
সামগ্রিক যোগান
পরিকল্পিত (এক্স এন্টি)
পরিকল্পিত ভোগ
পরিকল্পিত বিনিয়োগ
স্বয়ম্ভূত পরিবর্তন
কার্যকরি চাহিদা তত্ত্ব
স্বয়ম্ভূত ব্যয় গুণক।

অনুশীলনী

1. প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা কাকে বলে? প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতার সঙ্গে এই ধারণা কীভাবে সম্পর্কযুক্ত?
2. পরিকল্পিত বিনিয়োগ ও বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য কি?
3. একটি রেখার স্থিতিমাপের স্থানান্তর (parametric shift of a line) বলতে কী বোঝ? একটি রেখা কীভাবে স্থানান্তরিত হয় যদি (i) এর ঢাল কমে, এবং (ii) এর ছেদিতাংশ বাড়ে?
4. 'কার্যকরি চাহিদা' কী? চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রীর দাম এবং সুদের হার দেওয়া থাকলে স্বয়ম্ভূত ব্যয় গুণক কীভাবে নির্ধারণ করবে?
5. স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ এবং ভোগ ব্যয় (A) Rs 50 কোটি, MPS 0.2 এবং আয় (Y) Rs 4000 কোটি হলে পরিকল্পিত সামগ্রিক চাহিদা পরিমাপ করো। অর্থনীতিটি ভারসাম্য অবস্থায় আছে কী নেই বল (কারণ দেখাও)।
6. 'সঞ্চয়ের ধাঁধা' ব্যাখ্যা করো।

Suggested Readings

1. Dornbusch, R. and S. Fischer. 1990. *Macroeconomics*, (fifth edition) pages 63 – 105. McGraw Hill, Paris.

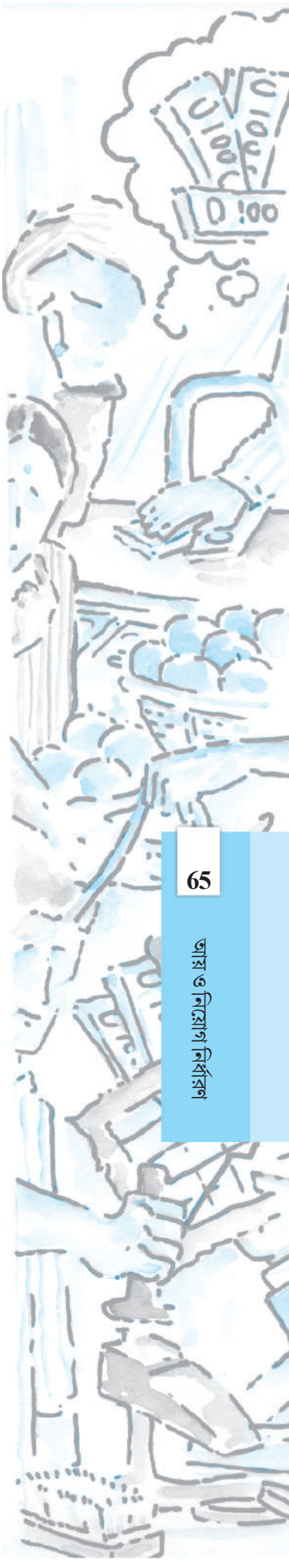

অধ্যায় 5

সরকারি বাজেট এবং অর্থব্যবস্থা

প্রথম অধ্যায়ে আমরা সরকার ও রাষ্ট্রকে একই অর্থে ব্যবহার করেছি। আমরা তাও উল্লেখ করেছি যে, বেসরকারি ক্ষেত্র ব্যতীতও রয়েছে সরকার। যার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। একটি অর্থব্যবস্থায় যখন সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্র পরস্পর সহাবস্থান করে তখন তাকে **মিশ্র অর্থব্যবস্থা** বলা হয়। একাধিকভাবে সরকার আর্থিক পরিমণ্ডলকে প্রভাবিত করে। এই অধ্যায়ে আমাদের আলোচনাকে **বাজেট** সংক্রান্ত কাজকর্মের পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব।

এই অধ্যায়টির আলোচনা নিম্নে বর্ণিত পথে অগ্রসর হবে। পরিচ্ছেদ 5.1-এ আমরা সরকারি বাজেটের উপাদান সমূহ উল্লেখ করব যার মাধ্যমে সরকারের রাজস্বের উৎসসমূহ এবং সরকারি ব্যয়ের উপায়সমূহ জানব। 5.2 পরিচ্ছেদে আমরা ভারসাম্যযুক্ত, উদ্বৃত্ত অথবা ঘাটতি বাজেট — এই বিষয়গুলো আলোচনা করেছি যার ভিত্তিতে ব্যয় ও রাজস্ব আদায়ের পার্থক্য হিসেব করেছি। বিশেষভাবে এই অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকারের বাজেট ঘাটতি ও তার তাৎপর্য এবং ঘাটতিকে বাগে আনার উপায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বাক্স 5.1-এ আমরা রাজকোষ নীতি এবং গুণকের সহজ সরল ব্যাখ্যা প্রদান করেছি। সরকারের কাজকর্মের উপর ঘাটতির তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। ঘাটতি সরকারের ঋণের দায়কে পুনরায় বাড়িয়ে তোলে। ঋণ সম্পর্কিত আলোচনার মাধ্যমে অধ্যায়টি শেষ করা হয়েছে।

5.1 সরকারি বাজেট — রূপরেখা এবং এর প্রকারভেদ

ভারতের সংবিধানের 112-তম অনুচ্ছেদ অনুসারে, একটি অর্থ বছরের (1 এপ্রিল থেকে 31 মার্চ পর্যন্ত) জন্য সরকারের সম্ভাব্য আয় এবং ব্যয়ের বিবরণ সংসদে পেশ করা সরকারের সাংবিধানিক কর্তব্য। এই 'বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি'-র ভিত্তিতেই সরকারের **বাজেট** দলিল তৈরি হয়।

যদিও বাজেটে একটি নির্দিষ্ট অর্থ বছরের জন্য সরকারের আয় এবং ব্যয়ের হিসেব থাকে কিন্তু বাজেটের প্রভাব পরবর্তী বছরগুলোতে প্রতিফলিত হয়। এই কারণে বাজেটে জমা খরচের দুইটি হিসেবের প্রয়োজন রয়েছে। এর মধ্যে যেগুলো শুধুমাত্র চলতি অর্থবছরের সাথে সম্পর্কিত তাদেরকে রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় (একে **রাজস্ব বাজেট** বলা হয়) এবং যে জমা-খরচের হিসেবে সরকারের সম্পদ ও দায় সমূহের উল্লেখ থাকে সেটা হল মূলধনী খাত (একে **মূলধনী বাজেট** বলে)। এই খাতগুলো বোঝার জন্য প্রথমেই সরকারি বাজেটের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বোঝা জরুরি।

5.1.1 সরকারি বাজেটের লক্ষ্য

সরকার মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ বাড়াতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই কাজ সম্পাদনে সরকার নিম্নলিখিত উপায়ে অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ করে।

সরকারি বাজেটের বরাদ্দের বৃত্তান্ত

সরকার কিছু নির্দিষ্ট দ্রব্য ও সেবার সংস্থান করে যা বাজার ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। অর্থাৎ ভোক্তা ও উৎপাদকদের মধ্যে দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর বিনিময় হয় না। এই ধরনের **সরকারি দ্রব্যের** উদাহরণ হল — জাতীয় সুরক্ষা, সড়ক, সরকারি প্রশাসন প্রভৃতি।

সরকারি দ্রব্যের সংস্থান কেন সরকারের করা প্রয়োজন? সেটা বুঝতে হলে আমাদেরকে বেসরকারি দ্রব্যসামগ্রী যেমন - কাপড়, গাড়ি, খাদ্য সামগ্রি ইত্যাদির সাথে সর্বজনের প্রাপ্য দ্রব্য (public goods) বা **সরকারি দ্রব্যের** পার্থক্য উপলব্ধি করতে হবে। এখানে দুটি মুখ্য পার্থক্য রয়েছে। প্রথমত, সরকারি দ্রব্যগুলোর সুবিধা সবাই ভোগ করে এবং শুধুমাত্র একজন বিশেষ ভোক্তার কাছেই সীমাবদ্ধ থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো ব্যক্তি চকোলেট খায় বা শার্ট পরিধান করে তবে এইগুলো অন্যদের ভোগ করার সুযোগ থাকবে না। এটি স্পষ্ট করে যে, সেই ব্যক্তির ভোগ অন্যদের ভোগের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করে। এক্ষেত্রে আমরা যদি কোনো পার্ক বা বায়ুদূষণ হ্রাসের পদক্ষেপকে বিবেচনা করি তবে এর সুফলগুলো সবার কাছে পৌঁছবে। এখানে কোনো এক ব্যক্তির একটি দ্রব্য ভোগের কারণে অন্যদের ভোগের পরিমাণ হ্রাস পায় না। ফলশ্রুতিতে অনেকে এর সুবিধা উপভোগ করতে পারে। অর্থাৎ একসাথে অনেক লোকের ভোগ '**প্রতিদ্বন্দ্বী**' হয় না।

দ্বিতীয়ত, প্রাইভেট দ্রব্য বা বেসরকারি দ্রব্যগুলোর ক্ষেত্রে, যে সকল ব্যক্তি দ্রব্যের জন্য অর্থ প্রদান করে না তাদেরকে ঐ সকল দ্রব্যের সুবিধা ভোগ থেকে নিবৃত্ত রাখা যায়। তুমি যদি টিকিট ক্রয় না কর তাহলে তুমি স্থানীয় সিনেমা হলে সিনেমা দেখার সুযোগ পাবে না। কিন্তু সরকারি দ্রব্যের ক্ষেত্রে, সুবিধা লাভ থেকে কাউকে নিরস্ত করা অসম্ভব। এই কারণে সরকারি দ্রব্যের ভোগ থেকে কাউকে বাদ দেওয়া যায় না, তাই এটি **অ-বর্জনকর**। এখানে যদি কিছু কিছু ভোক্তা সরকারি দ্রব্যের ব্যবহারের জন্য অর্থ প্রদান না করে তবে সরকারি দ্রব্যের ফি আদায় করা কঠিন হয় এবং কখনো কখনো অসম্ভব হয়ে উঠে। এই বিনা অর্থব্যয়ে সুবিধাভোগীরা '**বিনামূল্যের আরোহী**' হিসাবে পরিচিত। ভোক্তা, যা বিনামূল্যে পায় তারজন্য তারা স্বেচ্ছায় অর্থ প্রদান করে না এবং ফলস্বরূপ মালিকানায় অধিকারও একচ্ছত্র হয় না। লেনদেন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে যে সংযোগ ঘটে তা অচিরেই ছিন্ন হয়ে যায়, তাই সরকারকে এই সকল দ্রব্যের সরবরাহ অব্যাহত রাখতে অবশ্যই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়।

এখানে যদিও **সরকারি সরবরাহ ব্যবস্থা** এবং **সরকারি উৎপাদনের** মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে। সরকারি সরবরাহ ব্যবস্থা বলতে সেই সকল বিষয়কে বোঝায় যার জন্য বাজেটে অর্থসংস্থান করা হয় এবং সরাসরি অর্থপ্রদান না করেও ব্যবহার করা যায়। সরকারি দ্রব্য সরকারের মাধ্যমে অথবা বেসরকারি ক্ষেত্রে উৎপাদিত হতে পারে। সরকার যখন সর্বজনের জন্য দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন সরাসরি করে তখন তাকে **সরকারি উৎপাদন বা সার্বজনিক উৎপাদন বা পাবলিক প্রোডাকশন** বলে।

সরকারি বাজেটের পূর্ণবণ্টনের বৃত্তান্ত

দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে আমরা জেনেছি যে, দেশের মোট জাতীয় আয় চলে যায় বেসরকারি ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ফার্ম এবং পরিবারসমূহ (যা বেসরকারি আয় নামে পরিচিত) অথবা সরকারের ঘরে (যা সরকারি আয় নামে পরিচিত)। বেসরকারি আয়ের যে অংশ সর্বশেষে পরিবারগুলোর কাছে পৌঁছায় তাকে ব্যক্তিগত আয় বলে এবং ব্যক্তিগত আয়ের যে অংশ খরচ করা যায় সেটা হল ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয়। সরকারি ক্ষেত্রে পরিবারগুলো ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে দুইটি পদ্ধতিতে। এগুলো হল আয় হস্তান্তর এবং কর আদায়। এইভাবে সরকার আয়ের বণ্টনে পরিবর্তন ঘটাতে পারে এবং সমাজের পক্ষে 'ন্যায়সঙ্গত' হবে এমনভাবে আয়ের বণ্টন করতে পারে। একেই **পুর্ণবণ্টনের কাজকর্ম** বলে।

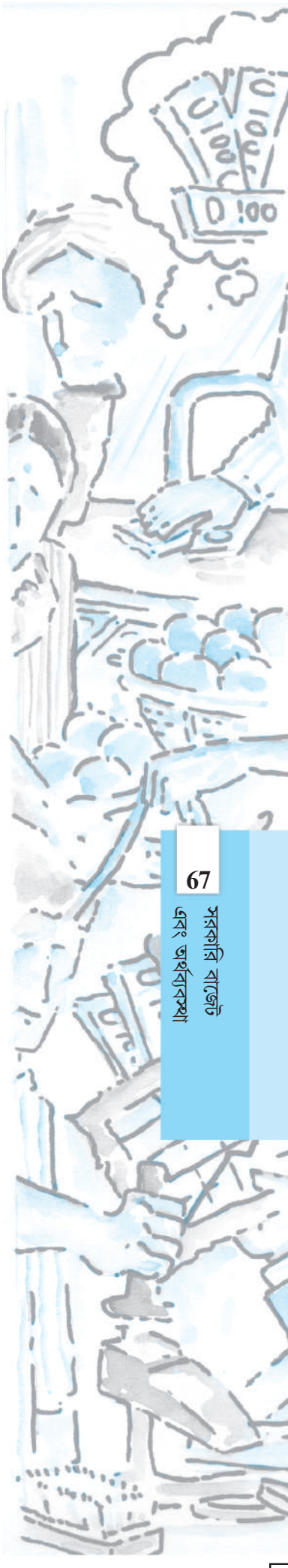

সরকারি বাজেটের স্থিতিকরণ বৃত্তান্ত :

আয় ও নিয়োগের উঠা-নামা সংশোধন করতে হয় সরকারের। অর্থনীতির সার্বিক নিয়োগ ও দামস্তর নির্ভর করে অর্থনীতির সম্মিলিত চাহিদার উপর। এই সম্মিলিত চাহিদা আবার নির্ভর করে, সরকারের ব্যয়ের সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকেও, লক্ষ লক্ষ বেসরকারি আর্থিক এজেন্টগুলোর ব্যয়জনিত সিদ্ধান্তের উপর। এই সিদ্ধান্ত সমূহ আবার অনেক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হয়, যেমন আয় এবং ঋণের সহজলভ্যতা যে-কোনো সময়ে অর্থনীতির চাহিদার স্তরের উপযোগী নাও হতে পারে যেখানে অর্থনীতির মোট শ্রমের এবং অন্য সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করা যায়। এখন যেহেতু মজুরি এবং দাম একটি স্তরের নীচে নামে না তাই নিয়োগকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আগের স্তরে নিয়ে যাওয়া যায় না। এই কারণে সামগ্রিক চাহিদা বাড়াতে সরকারের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়।

অন্যদিকে, এমন অবস্থাও দেখা দিতে পারে, যখন উচ্চ নিয়োগের অবস্থায় চাহিদা প্রাপ্ত উৎপাদনকে ছাপিয়ে যায় এবং ফলশ্রুতিতে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যেতে পারে। এইরকম অবস্থায়, চাহিদা হ্রাস করতে নিয়ন্ত্রণের শর্তগুলোর প্রয়োজন হতে পারে।

সরকার চাহিদার প্রসার বা হ্রাসে যে হস্তক্ষেপ করে তাকে **স্থিতিকরণ কার্য** বলে।

5.1.2 আয়ের শ্রেণিবিভাগ

রাজস্ব আয় বা প্রাপ্তি : রাজস্ব আয় বা প্রাপ্তি হল সেই প্রাপ্তি, যার সত্ব সরকারের কাছে দাবি করা যায় না। অতএব, এইগুলোকে অ-পুণরুদ্ধারযোগ্য বলা যায়। এদেরকে কর রাজস্ব বা অ-কর রাজস্ব বা কর বহির্ভূত রাজস্বে ভাগ করা হয়। কর রাজস্ব, রাজস্ব সংগ্রহের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর এই দুইভাগে দীর্ঘকাল ধরেই কর রাজস্বকে ভাগ করা হচ্ছে। প্রত্যক্ষ করের মধ্যে পড়ে ব্যক্তিগত আয়কর এবং ফার্মের কর্পোরেশন বা কর্পোরেট কর। অপরদিকে পরোক্ষ করে অন্তর্ভুক্ত করগুলো হল আবগারি শুল্ক (দেশে উৎপাদিত দ্রব্যে যে কর আরোপ করা হয়) কাষ্টম ডিউটি (আমদানি দ্রব্যের উপর এবং ভারত থেকে যে সকল দ্রব্য রপ্তানি করা হয় তাদের উপর যে কর লাগু হয়) এবং পরিষেবা কর। অন্যান্য প্রত্যক্ষ করের মধ্যে আছে সম্পদ কর, দান কর, সম্পত্তি কর (যা এখন বিলুপ্ত) যেগুলো থেকে কখনোই খুব বেশি মাত্রায় রাজস্ব সংগ্রহ হয়নি এবং এই কারণে এগুলোকে **'কাগজী কর'** বলা হয়।

আয় পূর্ণবণ্টনের উদ্দেশ্য সাধন করতে প্রগতিশীল করারোপের মাধ্যমে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। যেখানে আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে করের হারও বাড়তে থাকে। ফার্মগুলোতে আনুপাতিক ভিত্তিতে কর ধার্য করা হয়। এখানে কর হার মুনাফার একটি নির্দিষ্ট অংশমাত্র। আবগারি শুল্ক বা উৎপাদন শুল্কের ক্ষেত্রে যেসকল দ্রব্য জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য তাদেরকে করের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয় অথবা স্বল্প হারে কর আরোপ করা হয়। আরামদায়ক এবং বিলাসী দ্রব্যের উপর মাঝারি হারে এবং বিলাস প্রিয় দ্রব্য, তামাক এবং পেট্রোলিয়াম পণ্যের উপর উচ্চহারে কর ধার্য করা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের কর বহির্ভূত রাজস্বের মধ্যে মূলত রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা প্রদেয় ঋণ থেকে প্রাপ্ত সুদ, সরকারি বিনিয়োগ বাবদ প্রাপ্ত লভ্যাংশ ও মুনাফা এবং সরকারি পরিষেবা বাবদ সংগৃহীত ফি ও অন্যান্য আদায়। এর মধ্যে বিদেশী রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো থেকে প্রাপ্ত নগদ আর্থিক অনুদান ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অর্থবিলে[2] প্রস্তাবিত করের প্রভাব বিস্তার করে রাজস্ব সংগ্রহের হিসাবকে গণনায় আনা হয়।

মূলধন আয় বা প্রাপ্তি : সরকার ঋণ নিয়ে অথবা নিজস্ব সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে অর্থরাশি সংগ্রহ করে। সরকার যে সংস্থা থেকে ঋণ নেয় তাদেরকে তা পরিশোধ করতে হয়। এইভাবে সরকারের দেনা হয়। সরকারি সম্পত্তির

[1] 1 জুলাই, 2017 থেকে কেন্দ্রীয় সরকার যে জিএসটি প্রবর্তন করে তা 27 টি রাজ্য ও 7 টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে চালু হয়।

[2] বার্ষিক আর্থিক বিবরণের সাথে ফিনান্স বিল বা অর্থবিল পেশ করা হয়। এই বিলে বিস্তারিতভাবে বাজেটে প্রস্তাবিত কর আরোপ, কর বিলুপ্তি, করের পরিবর্তন ও কর নিয়ন্ত্রণের বিষয়গুলো থাকে।

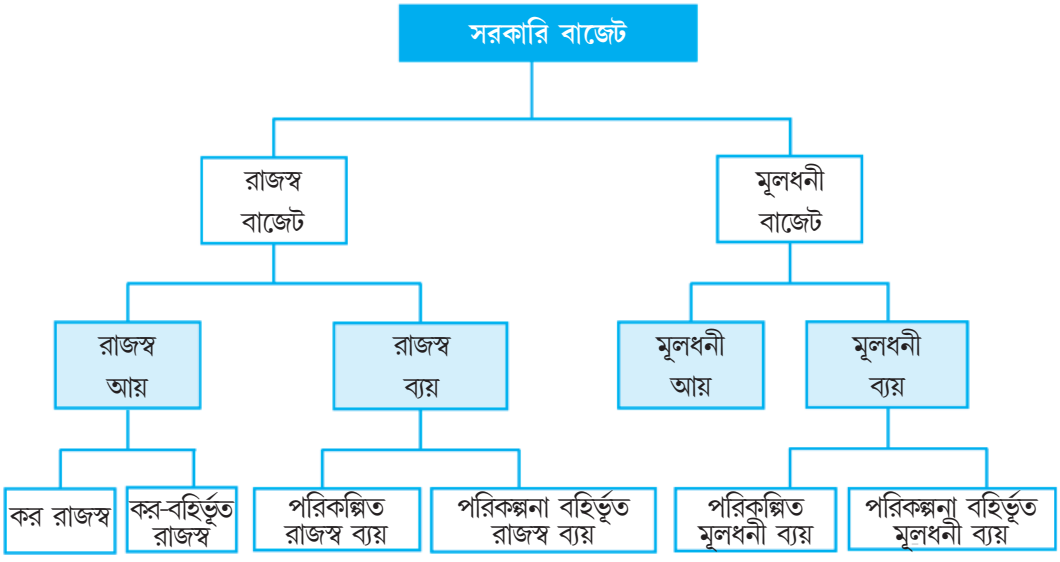

চার্ট 1: সরকারি বাজেটের উপাদানসমূহ

বিক্রি, যেমন সরকার অধিগৃহীত সংস্থা (PSUs)'র অংশীদারি বিক্রি হল PSU-এর বিলগ্নিকরণ, যা সরকারের মোট আর্থিক সম্পদের পরিমাণ হ্রাস করে। এই ধরনের সকল আয় বা প্রাপ্তি যা সরকারের দায় সৃষ্টি করে অথবা আর্থিক সম্পদের পরিমাণ হ্রাস করে তাকে বলে মূলধনী প্রাপ্তি। যখন সরকার নতুন ঋণ গ্রহণ করে, এর অর্থ হবে যে, ভবিষ্যতে এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে এবং ঋণের উপরে ধার্য হওয়া সুদও প্রদান করতে হবে। একইভাবে, সরকার যখন সম্পদ বিক্রি করে তখন সম্পদ থেকে ভবিষ্যৎ উপার্জনের সুযোগ ফুরিয়ে যায়। অতএব, এই প্রাপ্তিগুলোকে ঋণ সৃষ্টিকারী কিংবা অ-ঋণ সৃষ্টিকারী এই দুইভাগে ভাগ করা যায়।

5.1.3. ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ

রাজস্ব ব্যয়

বস্তুগত অথবা আর্থিক সম্পদ সৃষ্টি করা ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার অন্য উদ্দেশ্যে যে ব্যয় করে তাকে রাজস্ব ব্যয় বলে। সরকারি দফতরের স্বাভাবিক কাজকর্ম এবং পরিষেবা চালু রাখা, সরকারের ঋণ বাবদ সুদ প্রদান এবং রাজ্য সরকারগুলোকে প্রদেয় অনুদান এবং অন্যান্য খাতের (যদিও এমন কিছু অনুদান, সম্পদ সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হতে পারে) ব্যয়সমূহ রাজস্ব ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বাজেট বিবরণীতে সরকারের মোট ব্যয়কে **পরিকল্পিত** এবং **পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়**[3] ভাগ করা হয়। এটি সারণি 5.1 এর 6-তম ক্রমিক নং-এ দেখানো হয়েছে যার মধ্যে রাজস্ব ব্যয়ের ক্ষেত্রেও পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়ের পার্থক্য টানা হয়েছে। এই শ্রেণিবিভাগ অনুসারে, পরিকল্পিত রাজস্ব ব্যয় হল কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা (পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা) এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য কেন্দ্রীয় সহায়তা বাবদ ব্যয়। পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়ের অধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল রাজস্ব ব্যয়। এই ব্যয়ে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সাধারণ, আর্থিক এবং সামাজিক পরিষেবা সচল রাখার উপর বিপুল খরচ অন্তর্ভুক্ত হয়। পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়ের খাতগুলো হল সুদ প্রদান, প্রতিরক্ষা পরিষেবা, ভর্তুকি, বেতন এবং পেনশন।

[3] এই ধরনের শ্রেণিবিভাজনের বিপক্ষে একটি বিষয় প্রকাশ্যে এসেছে, বর্তমানে চালু প্রকল্পগুলোর ক্ষমতা এবং সেবা প্রদানের গুরুত্বকে তুচ্ছ করে নতুন কর্মসূচী। প্রকল্প করার ঝোঁক বাড়ছে। এই কারণে একটি ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয় উত্তরাধিকার সূত্রে অপচয়মূলক এবং বিশ্রীভাবে প্রভাব ফেলছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো সামাজিক ক্ষেত্রের উপর, যেখানে বেতন হল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

বাজারের ঋণ, বৈদেশিক ঋণ এবং বিভিন্ন রিজার্ভ তহবিল থেকে নেওয়া ঋণ বাবদ সুদে যে খরচ হয় তা হল পরিকল্পনা বহির্ভূত রাজস্ব ব্যয়ের একক বৃহত্তম অংশ। প্রতিরক্ষা ব্যয় হল সরকারের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যয় যা জাতীয় সুরক্ষার প্রশ্নের সাথে জড়িয়ে রয়েছে। এই ব্যয়ে ব্যাপক কাঁটছাট করার সুযোগ খুব কম। ভর্তুকি হল সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত হাতিয়ার বিশেষ। ভর্তুকির লক্ষ্য হল জনসাধারণের কল্যাণ সাধন। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ন্যায় সরকারি দ্রব্য ও পরিষেবার দাম নীচু স্তরে বেঁধে রাখতে সরকার ঢালাও হারে অ-প্রকাশ্য ভর্তুকি দেয়। এছাড়াও সরকার প্রকাশ্যভাবে খাদ্যদ্রব্য, রাসায়নিক সার, রপ্তানি ও ঋণের সুদেও ভর্তুকি প্রদান করে। 2014-15 সালে ভর্তুকির পরিমাণ ছিল জিডিপি'র 2.02 শতাংশ এবং 2015-16 সালে (বাজেটীয় হিসেবে) ছিল জিডিপি'র 1.7 শতাংশ।

মূলধনী ব্যয়

সরকারের এমন কিছু ব্যয় আছে যা বস্তুগত অথবা আর্থিক সম্পদ সৃষ্টি করে কিংবা আর্থিক দায় হ্রাস করে। এই ব্যয়গুলো হল জমি, দালানবাড়ি, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদি অধিগ্রহণ বাবদ খরচ, শেয়ারে বিনিয়োগ, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোতে কেন্দ্র ঋণ ও আগাম বাবদ যে খরচ করে এবং পি এস ইউ ও অন্যান্য সংস্থাসমূহে কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থ ব্যয় করে। বাজেট বিবরণে মূলধনী ব্যয়কে পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা বহির্ভূত ব্যয়ে ভাগ করা হয়। পরিকল্পিত মূলধনী ব্যয় অনেকটা রাজস্ব ব্যয়ের অনুরূপ। ব্যয়ের এই খাতে কেন্দ্রের পরিকল্পনা রূপায়ণের সাথে সম্পর্কিত খরচ এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পরিকল্পনা বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্য অন্তর্ভুক্ত হয়। পরিকল্পনা বহির্ভূত মূলধনী ব্যয় সরকারি বিভিন্ন সাধারণ, সামাজিক এবং আর্থিক পরিষেবার সংস্থান করে।

বাজেট কেবলমাত্র আয় ও ব্যয়ের বিবরণ নয়। স্বাধীন ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হওয়ার সময় থেকে বাজেটকে একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় পলিসি স্টেইটমেন্ট হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। বাজেট সম্পর্কে এই যুক্তি দেওয়া হয় যে, এর মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির অবয়বের একটি ছবি পাওয়া যায় এবং বাজেটের মাধ্যমে দেশের মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের চালচিত্র ফুটে উঠে। ফিসক্যাল রেস্পন্সিবিলিটি অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট, 2003 (FRBMA)[4] অনুসারে বাজেটের সাথে নীতিকর্মসূচীর বিবরণ (Policy Statement) পেশ করা বাধ্যতামূলক। মিডিয়াম টার্ম ফিসক্যাল পলিসি স্টেইটমেন্টে কতগুলো নির্দিষ্ট রাজকোষ সূচকের আগামী তিন বছরের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয় এবং পরীক্ষা করে দেখা হয়, রাজস্ব আয় ও রাজস্ব ব্যয়ের সুস্থিতি বজায় আছে কিনা। সাথে সাথে এটাও দেখা হয়, বাজারের ঋণের অন্তর্ভুক্তি সহ, সরকারের মূলধনী আয় কতটা উৎপাদনশীলভাবে ব্যয় করা হচ্ছে। ফিসক্যাল পলিসি স্ট্রেটিজি স্টেইটমেন্ট সরকারের রাজকোষ ক্ষেত্রের অগ্রাধিকারগুলো স্থির করে, বর্তমানে চালু আর্থিক নীতিগুলোর যৌক্তিকতা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এবং রাজকোষীয় ব্যবস্থাপনায় কোনো বিচ্যুতি আছে কিনা তা যাচাই করে। দ্যা ম্যাক্রোইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক স্টেটমেন্ট জিডিপি-র বৃদ্ধির হারের প্রেক্ষিতে অর্থনীতির অগ্রগতি নির্ধারণ করে, কেন্দ্রীয় সরকারের রাজকোষ ভারসাম্য ও বৈদেশিক ক্ষেত্রে ভারসাম্যের[5] পরিমাপ নির্ণয় করে।

5.2 ভারসাম্যযুক্ত, উদ্বৃত্ত এবং ঘাটতি বাজেট

সরকারের ব্যয় যখন সরকারের রাজস্ব আদায়ের সমান হয় তখন তাকে **ভারসাম্যযুক্ত বাজেট** বলে। সরকারকে যদি বাড়তি ব্যয় করতে হয় তাহলে করের মাধ্যমে এই বাড়তি অর্থ সংগ্রহ করে বাজেটে ভারসাম্য রক্ষা করতে

[4]বাক্স 5.2 টি সরকারি অর্থ সংস্থান সংক্রান্ত এই আইনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে।

[5]ভারত সরকারের 2005-06 সালের বাজেটে একটি বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল যেখানে লিঙ্গ সংবেদনশীল বাজেটীয় বরাদ্দগুলো হাইলাইট করা হয়েছে। লিঙ্গ বাজেট রূপায়ণ হল একটি প্রক্রিয়া যেখানে লিঙ্গ বৈষম্য নিরসনে সরকারের প্রতিশ্রুতিগুলোর উল্লেখ থাকে। এছাড়াও লিঙ্গ বাজেটে মহিলাদের ক্ষমতায়ণে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং নারীর ক্ষমতায়ণে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তার যথাযথ ব্যবহার করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা এবং সরকারি ব্যয় ও নীতির কি প্রভাব পড়ছে নারীর অবস্থার উন্নতিতে তাও অনুসন্ধান করে দেখা হয়। 2006-07-এর বাজেটে পূর্ববর্তী বিবরণের আরো বিস্তৃতি ঘটানো হয়েছে।

হয়। যখন কর সংগ্রহ প্রয়োজনীয় ব্যয়ের চেয়ে বেশি হয় তখন তাকে উদ্বৃত্ত বাজেট বলা হয়। যদিও বাজেটের খুব সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, সরকারি ব্যয় আয়কে ছাপিয়ে যায়। এই অবস্থায় সরকারকে ঘাটতি বাজেট নিয়ে চলতে হয়।

5.2.1 সরকারি ঘাটতির পরিমাপ

যখন সরকার রাজস্ব সংগ্রহ অপেক্ষা বেশি ব্যয় করে, তখন বাজেটে ঘাটতি হয়।[6] সরকারের বাজেট ঘাটতি বেঁধে রাখার বিভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে এবং অর্থ ব্যবস্থায় ঘাটতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাসমূহের প্রত্যেকটির আলাদা গুরুত্ব রয়েছে।

রাজস্ব ঘাটতি : সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের চেয়ে রাজস্ব ব্যয় বেশি হলে তাকে রাজস্ব ঘাটতি বলে।

রাজস্ব ঘাটতি = রাজস্ব ব্যয় – রাজস্ব আয়

সারণি **5.1:** কেন্দ্রিয় সরকারের আয় ও ব্যয়, **2015-16** (বাজেটীয় হিসেব)

	(GDP-এর শতাংশ)
1. রাজস্ব আয় (a+b)	8.1
(a) কর রাজস্ব (রাজ্য সমূহের নীট অংশ)	6.5
(b) কর বহির্ভূত রাজস্ব	1.6
2. রাজস্ব ব্যয়ের মধ্যে যেগুলো রয়েছে	10.9
(a) সুদ প্রদান	3.2
(b) মুখ্য ভর্তুকিসমূহ	1.6
(c) প্রতিরক্ষা ব্যয়	1.1
3. রাজস্ব ঘাটতি (2–1)	2.8
4. মূলধনী আয় (a+b+c) যার মধ্যে রয়েছে	4.5
(a) ঋণ পরিশোধ	0.1
(b) অন্য আয় (প্রধানত পি এস ইউ[6]-র বিলগ্নিকরণ)	0.5
(c) ঋণ ও অন্যান্য দায়সমূহ	3.9
5. মূলধনী ব্যয়	1.7
6. মোট ব্যয় [2+5=6(a)+6(b)]	12.6
(a) পরিকল্পনা খাতে ব্যয়	3.3
(b) পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে ব্যয়	9.3
7. ফিসক্যাল বা রাজকোষ ঘাটতি [6-1-4(a)-4(b)] অথবা [3+5-4(a)-4(b)]	3.9
8. প্রাথমিক ঘাটতি [7–2(a)]	0.7

উৎস : *আর্থিক সমীক্ষা*, 2015-16

[1] সরকার অধিগৃহীত সংস্থা

সারণি 5.1-এর ক্রমিক নং 3-এ দেখা যায় যে, 2015-16 সালে রাজস্ব ঘাটতি ছিল GDP'র 2.8 শতাংশ। রাজস্ব ঘাটতি কেবলমাত্র সেই সমস্ত লেনদেনকে অন্তর্ভুক্ত করে যা সরকারের চলতি আয় ও ব্যয়কে প্রভাবিত করে। সরকারের রাজস্ব ঘাটতি হওয়ার অর্থ হল, সরকার বি-সঞ্চয় (dissaving) করছে এবং অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের সঞ্চয়কে ভেঙ্গে ভোগ ব্যয়ের অংশ বিশেষের অর্থ সংস্থানের জন্য ব্যবহার করছে। এই ব্যাপারটা এই সত্যকে সামনে নিয়ে আসে যে, সরকারকে বিনিয়োগের জন্য অর্থ সংস্থানে কেবল ঋণ নিতে

[6]অধিক যথাযথভাবে এর দ্বারা বোঝায়, মোট আয় (রাজস্ব ও মূলধন উভয় খাতেই) অপেক্ষা মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন উভয়ক্ষেত্রেই) বেশি হয়। 1997-98 সালের বাজেট থেকে ভারতে বাজেট ঘাটতি দেখানোর অনুশীলন বন্ধ হয়ে গেছে।

হয় না ভোগের প্রয়োজন পূরণেও ঋণ নিতে হয়। এর পরিণতিতে সরকারের ঋণের বোঝা বাড়ে এবং সুদের দায়ও বৃদ্ধি পায়। ফলস্বরূপ সরকার বাধ্য হয় ব্যয় কাঁটছাট করতে। যেহেতু রাজস্ব ব্যয়ের বৃহৎ অংশটি হল সরকারের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যয় তাই এই ব্যয় ছাঁটা সম্ভব নয়। এই কারণে সরকার প্রায়শই উৎপাদনশীল মূলধনী ব্যয় অথবা কল্যাণমূলক ব্যয় হ্রাস করে। এর প্রভাবে আর্থিক প্রবৃদ্ধির গতি শ্লথ হয় এবং কল্যাণকর কর্মসূচীর রূপায়ণের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

রাজকোষ (ফিসক্যাল) ঘাটতি : সরকারের মোট ব্যয় এবং ঋণ ব্যতীত মোট আয়ের মধ্যে যতখানি ফারাক, তাই হল রাজকোষ ঘাটতি।

মোট রাজকোষ ঘাটতি = মোট ব্যয় – (রাজস্ব আয় + ঋণ ব্যতিরেকে সৃষ্ট মূলধনী আয়)

ঋণ ব্যতীত সৃষ্ট মূলধনী আয় হল সেই সকল আয় যা ধার বা কর্জ করা হয় না। তাই এই আয় ঋণগ্রস্ততা বাড়ায় না। ঋণ পুনরুদ্ধার এবং পি এস ইউ বিক্রি থেকে উপার্জিত আয় হল ঋণ ব্যতীত সৃষ্ট মূলধনী আয়ের উদাহরণ। সারণি 5.1 থেকে আমরা দেখতে পাই যে ঋণ ব্যতিরেকে সৃষ্ট মূলধনী আয় হল GDP'র 0.6 শতাংশ। মোট মূলধনী আয় থেকে ঋণ এবং অন্য দায় বাদ দিয়ে (4.5 – 3.9) এই অংকটা পাওয়া যায়। ফলশ্রুতিতে রাজকোষ ঘাটতি GDP'র 3.9 শতাংশ হবে। ঋণের মাধ্যমে রাজকোষ ঘাটতি মিটতে হবে। ঘাটতির এই অবস্থা, সকল উৎস থেকে সরকারের মোট অংকের ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে। অর্থের ব্যবস্থাপনার দিক থেকে,

মোট রাজকোষ ঘাটতি = নিট অভ্যন্তরীণ ঋণ + রিজার্ভ ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণ + বিদেশ থেকে প্রাপ্ত ঋণ

দেশের নিট অভ্যন্তরীণ ঋণের হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়, ঋণ হাতিয়ারের সাহায্যে সরাসরি জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ (উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প) এবং বিধিবদ্ধ তারল্য অনুপাতের (এস এল আর) মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে পরোক্ষভাবে ঋণ সংগ্রহ। মোট রাজকোষ ঘাটতি, সরকারি ক্ষেত্রের আর্থিক স্বাস্থ্যের হালচাল এবং অর্থ ব্যবস্থার স্থায়িত্ব নির্ধারণের একটি মুখ্য চলক। উপরে বর্ণিত হিসেব-নিকেশে মোট রাজকোষ ঘাটতি যেভাবে পরিমাপ করা হয় তা থেকে দেখা যায় যে রাজস্ব ঘাটতি হল রাজকোষ ঘাটতির একটি অংশ (রাজকোষ ঘাটতি = রাজস্ব ঘাটতি + মূলধনী ব্যয় – ঋণ ব্যতিরেকে সৃষ্ট মূলধনী আয়)। রাজকোষ ঘাটতির একটি বড়ো অংশ যদি রাজস্ব ঘাটতি হয় তবে বুঝতে হবে, সরকারি ঋণের একটি বড়ো অংশ বিনিয়োগ না হয়ে ভোগ ব্যয় মেটাতে খরচ করা হচ্ছে।

প্রাথমিক ঘাটতি : আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, সরকারের ঋণ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে পূর্বে নেওয়া ঋণের সুদের দায়ও হিসেবে ধরতে হয়। প্রাথমিক ঘাটতি পরিমাপের মূল লক্ষ্য হল বর্তমানে রাজকোষের ভারসাম্যহীনতার প্রতি আলোকপাত করা। চলতি ব্যয় ও চলতি আয়ের হিসেবে সরকারের ঋণের অংক পরিমাপ করতে আমাদের প্রাথমিক ঘাটতির হিসেব কষতে হবে। এই হিসেব সহজভাবে বের করা যায়, রাজকোষ ঘাটতি থেকে প্রদেয় সুদ বিয়োগ করে।

মোট প্রাথমিক ঘাটতি = মোট রাজকোষ ঘাটতি – নিট সুদ বাবদ দায়।

নিট সুদ বাবদ দায়ের হিসেব পাওয়া যায় সরকারের নিট অভ্যন্তরীণ ঋণে যে সুদ দিতে হয় এবং সরকার যে সুদ পায় তার বিয়োগফল থেকে।

বাক্স 5.1: রাজকোষ নীতি

কেইনেসর 'দি জেনারেল থিওরি অফ এমপ্লয়মেন্ট, ইন্টারেস্ট ও মানি' বইটির অন্যতম মুখ্য ধারণাগুলোর মধ্যে একটি ছিল যে, উৎপাদন ও নিয়োগের স্তরকে সুস্থিত অবস্থায় রাখতে সরকারের রাজকোষ নীতি ব্যবহার করতে হবে। ব্যয় ও করের পরিবর্তন ঘটিয়ে সরকার উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেয় এবং অর্থনীতির উত্থান ও পতনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। এইভাবে রাজকোষ নীতির কারণে সৃষ্টি হয় একটি উদ্বৃত্ত (যখন মোট আয় মোট ব্যয়কে ছাপিয়ে যায়) অথবা একটি ঘাটতি বাজেট (যখন মোট ব্যয় ছাপিয়ে মোট আয়কে) অথবা

একটি ভারসাম্য বাজেট (যেখানে আয় ও ব্যয় সমান হয়)। এখন আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় সরকারি ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে আয় নির্ধারণের বিশ্লেষণ করব।

সরকার প্রত্যক্ষভাবে দুটি বিশেষ উপায়ে ভারসাম্য আয়ের স্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করে — সরকার দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করে (G) সম্মিলিত চাহিদা ও কর বৃদ্ধি করে এবং এই হস্তান্তর আয় (Y) এবং ব্যয়যোগ্য আয়ের (YD) সম্পর্কে প্রভাব ফেলে। উল্লেখ্য যে, ব্যয়যোগ্য আয় হল সেই আয় যা পারিবারিক ভোগ ও সঞ্চয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।

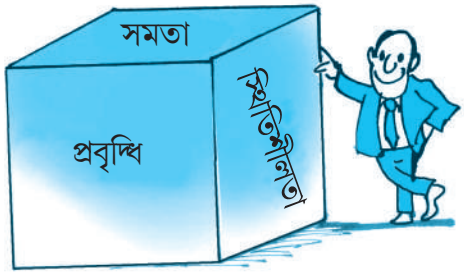

রাজকোষ নীতি কীভাবে তার মৌলিক লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করে ?

সর্বপ্রথমে আমরা কর নিয়ে আলোচনা করছি। আমরা অনুমান করি যে, সরকার যে করারোপ করে তা আয়ের উপর নির্ভর করে না। একে এককালীন **নির্দিষ্ট পরিমাণ কর (lump-sum taxes)** বলে। এটি T-এর সমান হয়। সমগ্র আলোচনায় আমরা অনুমান করে নিয়েছি, সরকার একটি নির্দিষ্ট মাত্রায়, $\bar{TR}$, হস্তান্তর করে। এখন ভোগ অপেক্ষকটি হবে

$$C = \bar{C} + cYD = \bar{C} + c(Y - T + \bar{TR}) \quad (5.1)$$

যেখানে YD = ব্যয়যোগ্য আয়

আমরা জানি, করসমূহ ব্যয়যোগ্য আয় এবং ভোগ হ্রাস করে। উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক, কেউ 1 লক্ষ টাকা উপার্জন করে এবং 10,000 টাকা কর দেয়। অন্যদিকে, অপর এক ব্যক্তির আয় 90,000 টাকা কিন্তু উনি কোনো কর দেন না। অর্থাৎ উভয় ব্যক্তির ক্ষেত্রেই ব্যয়যোগ্য আয় একই হবে। সরকারের অন্তর্ভুক্তির ফলে বর্ধিত সম্মিলিত চাহিদা হবে

$$AD = \bar{TR} + c(Y - T + \bar{TR}) + I + G \quad (5.2)$$

লেখচিত্রে, আমরা দেখি যে, এককালীন নির্দিষ্ট পরিমাণ কর ভোগ তালিকাকে সমান্তরালভাবে নীচের দিকে স্থানান্তরিত করে এবং ফলশ্রুতিতে সামগ্রিক চাহিদা রেখা অনুরূপভাবে স্থানান্তরিত হয়। দ্রব্যের বাজারে আয় নির্ধারণের শর্ত হবে $Y = AD$, যাকে এইভাবে লেখা যায়

$$Y = \bar{C} + c\,(Y - T + \bar{TR}) + I + G \quad (5.3)$$

ভারসাম্য আয়ের স্তর নির্ধারণের জন্য সমাধান করে আমরা পাই,

$$Y^* = \frac{1}{1-c}(\bar{C} - cT + c\,\bar{TR} + I + G) \quad (5.4)$$

সরকারি ব্যয়ে পরিবর্তন

এখন আমরা করকে স্থির রেখে, সরকারি ক্রয় (G) বৃদ্ধির প্রভাব বিচার করব। যখন T অর্থাৎ কর অপেক্ষা G অর্থাৎ সরকারি ক্রয় অধিক হয় তখন সরকার ঘাটতিতে চলে। কারণ, G হল সামগ্রিক ব্যয়ের একটি অংশ, তাই G বাড়লে পরিকল্পিত সামগ্রিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়। পরিণতিতে সামগ্রিক চাহিদা সূচি AD' পর্যন্ত স্থানান্তরিত হয়। উৎপাদনের প্রারম্ভিক স্তরে চাহিদা, যোগানকে ছাড়িয়ে যায় এবং ফার্ম উৎপাদন বাড়ায়। নতুন ভারসাম্য বিন্দু হয় E' বিন্দু। গুণক প্রক্রিয়া (চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে) কার্যকর হয়। সরকারি ব্যয় গুণক নিম্নরূপে নির্ণয় করা হয় :

ধরি G একটি নতুন স্তরে $(G+\Delta G)$ উন্নীত হয়েছে এবং ফলস্বরূপ Y একটি নতুন স্তরে $(Y^* + \Delta Y)$ পৌঁছেছে। G এবং Y-এর নতুন স্তরটি (5.4) সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$(Y^* + \Delta Y) = \frac{1}{1-c}\left(\bar{C} - cT + c\overline{TR} + I + G + \Delta G\right) \qquad (5.4a)$$

সমীকরণ (5.4a) থেকে সমীকরণ (5.4) বিয়োগ করে পাই,

$$\Delta Y = \frac{1}{1-c}\Delta G \qquad (5.5)$$

বা,

$$\frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{1}{1-c} \qquad (5.6)$$

চিত্র 5.1-এ, সরকারি ব্যয় G থেকে বৃদ্ধি পেয়ে G' হয় এবং ফলস্বরূপ ভারসাম্য আয় Y থেকে বৃদ্ধি পেয়ে Y' হয়।

করের পরিবর্তন

আমরা লক্ষ করি যে, কর হ্রাসের ফলে আয়ের প্রতিটি স্তরে ব্যয়যোগ্য আয় (Y – T) বৃদ্ধি পায়। এই কর হ্রাসে সম্মিলিত ব্যয় সূচীর ঊর্ধ্বমুখী স্থানান্তর হয় যা ভগ্নাঙ্ক c দ্বারা সূচিত হয়েছে। চিত্র 5.2 তে দ্রষ্টব্য।

সরকারি ব্যয় সূচক নির্ণয়ের পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা 5.3 সমীকরণ থেকে কর গুণকের হিসেব করতে পারি

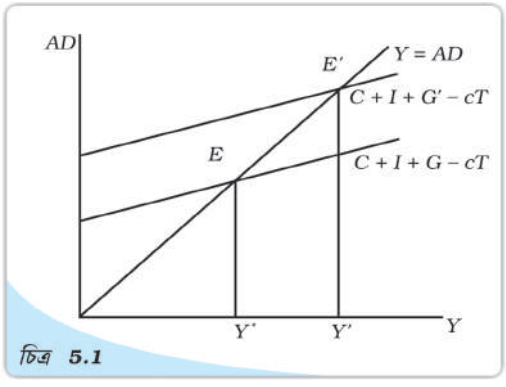

চিত্র 5.1

উচ্চ সরকারি ব্যয়ের প্রভাব

$$\Delta Y^* = \frac{1}{1-c}(-c)(\Delta T) \qquad (5.7)$$

কর গুণক

$$= \frac{\Delta Y}{\Delta T} = \frac{-c}{1-c} \qquad (5.8)$$

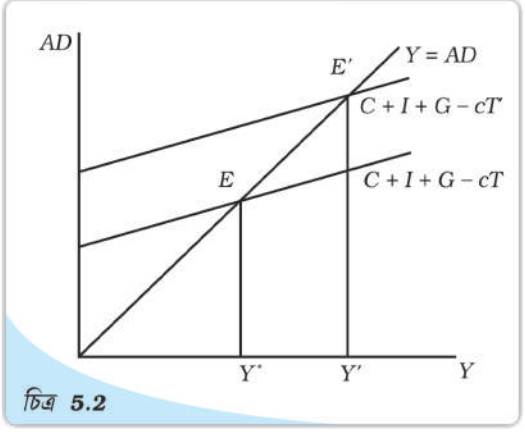

চিত্র 5.2

কর হ্রাসের প্রভাবে

কর হ্রাসের (বৃদ্ধির) কারণে ভোগ এবং উৎপাদন বৃদ্ধি (হ্রাস) হবে, কর গুণকটি তাই ঋণাত্মক গুণক হবে। সমীকরণ (5.6) এবং (5.8) তুলনা করে আমরা পাই যে, কর গুণকটি সরকারি ব্যয় গুণকের তুলনায় পরম মানে ক্ষুদ্রতর হয়। এর কারণ সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি সরাসরি মোট ব্যয়কে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে, কর ব্যয়োপযোগী আয়কে প্রভাবিত করে গুণক প্রক্রিয়াতে যোগদান করে, এবং পরিবারের ভোগকে (মোট ব্যয়ের অংশ) প্রভাবিত করে। অতএব, ΔT পরিমাণ কর হ্রাসে, ভোগ ব্যয়, এবং এই কারণে মোট ব্যয় প্রথম অবস্থায় $c\Delta T$ পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। দুটি গুণক কীভাবে আলাদা হয়, তা অনুধাবন করতে আমরা নিম্নের উদাহরণটি বিচার করব।

উদাহরণ 5.1

ধরো যে, প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা হল 0.8। তাহলে সরকারি ব্যয় গুণকটি হবে,

$\frac{1}{1-c} = \frac{1}{1-0.8} = \frac{1}{0.2} = 5$।

সরকারের ব্যয় 100 বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্য আয় বেড়ে হবে

$500(\frac{1}{1-c}\Delta G = 5 \times 100)$ কর গুণকটি হবে,

$\frac{-c}{1\ \ c} = \frac{-0.8}{1-0.8} = \frac{-0.8}{0.2} = -4.$

কর 100 কমানো হলে ($\Delta T = -100$) ভারসাম্য আয় 400 বাড়বে। অতএব, এইক্ষেত্রে ভারসাম্য আয়ের যে বৃদ্ধি ঘটে সেটি G বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে পরিমাণ বাড়ত তার চাইতে কম বাড়বে।

গরীব লোকটি কাঁদছে কেন? তার চোখের জল মুছতে কিছু ব্যবস্থার সুপারিশ কর।

বর্তমান কাঠামোতে, যদি আমরা প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার বিভিন্ন মান নিই এবং দুটি গুণকের মান নির্ণয় করি, তবে আমরা দেখি যে কর গুণকের মান সর্বদাই সরকারি ব্যয় গুণকের মান অপেক্ষা পরম মানে এক কম হয়। এর একটি মনোজ্ঞ তাৎপর্য রয়েছে। যদি সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির অনুরূপভাবে কর বৃদ্ধি করা হয়, যাতে বাজেটে ভারসাম্য বজায় থাকে, তবে উৎপাদন বাড়বে, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণের ভিত্তিতে। এই দুইটি কর্মসূচী গুণককে যোগ করলে

$$\text{ভারসাম্য বাজেট গুণক} = \frac{\Delta Y^*}{\Delta G} = \frac{1}{1-c} + \frac{-c}{1\ \ c} = \frac{1-c}{1-c} = 1 \qquad (5.9)$$

একটি ভারসাম্য বাজেট গুণকের মান একক হওয়ার অর্থ হল, G বৃদ্ধি 100 হলে আয়ও সর্বসাকুল্যে 100 বাড়ে। এখানে G-এর এই বৃদ্ধির জন্য অর্থসংস্থানের উৎস হল করের 100 বৃদ্ধি। উদাহরণ-1 এ এই ঘটনাটি দেখা যায়। এখানে G-এর 100 বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন 500 বেড়েছে। কর বৃদ্ধি আয়কে 400 তে নামিয়ে আনবে এবং সাথে সাথে আয়ের নিট বৃদ্ধি 100-এর সমান হবে। ভারসাম্য আয় বলতে সর্বশেষ পর্যায়ের আয়কে বোঝায় - যেখানে একটি দীর্ঘ সময়কালে গুণকের সকল পর্বগুলোর মধ্যকার কাজ শেষ হওয়ার পর আয় পৌঁছায়। আমরা দেখেছি যে, G-র বৃদ্ধির সাথে সমতা রেখে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় যেখানে কর বৃদ্ধির কারণে প্রণোদিত ভোগ ব্যয় থাকে না। ভারসাম্য বাজেট গুণক 1 হয় কেন তা দেখতে আমরা গুণক প্রক্রিয়াটি পরীক্ষা করে দেখব। সরকারি ব্যয়ের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি প্রত্যক্ষভাবে আয়কে সেই পরিমাণ বাড়ায় এবং তারপর পরোক্ষভাবে গুণক শৃঙ্খলের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করে :

$$\Delta Y = \Delta G + c\Delta G + c^2\Delta G + \ldots = \Delta G\ (1 + c + c^2 + \ldots) \qquad (5.10)$$

কিন্তু কর বৃদ্ধি গুণক প্রক্রিয়ায় কেবলমাত্র তখনই প্রবেশ করে যখন ব্যয়যোগ্য আয়ের কাঁটছাটের ফলে ভোগ হ্রাস পায় যা কর হ্রাসের c গুণ হয়। অতএব, কর বৃদ্ধির কারণে আয়ের উপর প্রভাব হল

$$\Delta Y = -\ c\Delta T - c^2\Delta T + \ldots = -\ \Delta T(c + c^2 + \ldots) \qquad (5.11)$$

দুটোর ব্যবধান থেকে আয়ের উপর নিট প্রভাব নির্ণয় করা যায়। যেহেতু $\Delta G = \Delta T$, সমীকরণ 5.10 এবং 5.11 থেকে আমরা পাই, $\Delta Y = \Delta G$, অর্থাৎ সরকারি ব্যয় যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায় সেই পরিমাণ আয় বৃদ্ধি পায় এবং ভারসাম্য বাজেটের গুণকের মান এক হয়। এই গুণকটি নিম্নলিখিতভাবে সমীকরণ 5.3 থেকে নির্ণয় করা যায়,

$\Delta Y = \Delta \bar{G} + c\,(\Delta Y - \Delta T)$ যেহেতু বিনিয়োগ হয় না $(\Delta I = 0)$ (5.12)

যেহেতু, $\Delta \bar{G} = \Delta T$, আমরা পাই

$$\frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{1-c}{1-c} = 1 \qquad (5.13)$$

সমানুপাতিক করের ক্ষেত্রে : অধিক বাস্তবসম্মত অনুমান হবে যে, সরকার কর হিসাবে আয়ের একটি স্থির অংশ, t, সংগ্রহ করে। ফলে $T = tY$ হয়। আনুপাতিক কর সহ ভোগ অপেক্ষকটি নিম্নরূপে লেখা হয়।

$$C = \bar{C} + c\,(Y - tY + \bar{TR}) = \bar{C} + c\,(1 - t)\,Y + c\bar{TR} \qquad (5.14)$$

উল্লেখ্য যে, আনুপাতিক কর কেবলমাত্র আয়ের প্রতিটি স্তরে ভোগ কমায় না উপরন্তু ভোগ অপেক্ষকের ঢাল কমিয়ে দেয়। আয়ের বাইরে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা $c\,(1 - t)$ পর্যন্ত নেমে আসে। নতুন সামগ্রিক চাহিদাসূচী AD'-এর ছেদাংশ বড়ো কিন্তু চেপ্টা হয় যা চিত্র 5.3-এ দেখানো হয়েছে।

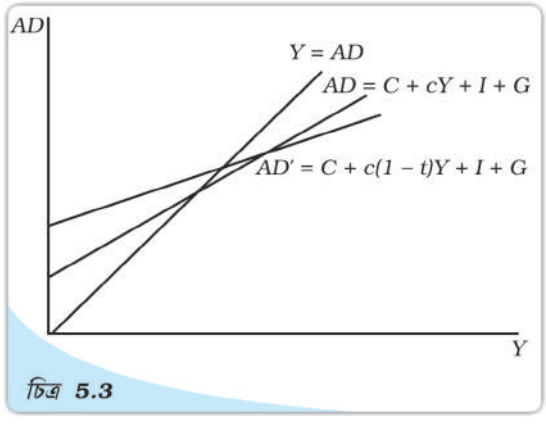

চিত্র 5.3

সরকার এবং সামগ্রিক চাহিদা (সমানুপাতিক কর AD সূচীর চ্যাপ্টা রূপ দেয়।

এখন আমরা পাই,

$$AD = \bar{C} + c(1 - t)Y + c\bar{TR} + I + G = \bar{A} + c(1 - t)Y \qquad (5.15)$$

যেখানে $\bar{A}$ = স্বয়ম্ভূত ব্যয় যা $\bar{C} + c\bar{TR} + I + G$ -এর সমান। পণ্যের বাজারে আয় নির্ধারণের শর্ত হল, $Y = AD$ থাকে। একে লেখা যায় এরূপে

$$Y = \bar{A} + c\,(1 - t)Y \qquad (5.16)$$

আয়ের ভারসাম্য স্তরের জন্য সমাধান করে পাই,

$$Y^* = \frac{1}{1 - c(1-t)}\bar{A} \qquad (5.17)$$

সুতরাং, গুণকটিকে নিম্নরূপে লেখা যায়

$$\frac{\Delta Y}{\Delta \bar{A}} = \frac{1}{1 - c(1-t)} \qquad (5.18)$$

এককালীন নির্দিষ্ট পরিমাণ (lump-sum) করের ক্ষেত্রে গুণকের মানের সাথে এটির তুলনা করে দেখা যায় মানটি ছোটো হয়েছে। এককালীন নির্দিষ্ট করের ঘটনায় সরকারি খরচ বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে যখন আয় বাড়ে তখন ভোগ বাড়ে আয় বৃদ্ধির c গুণ। সমানুপাতিক কর সহযোগেও ভোগ বৃদ্ধি পাবে যা আয় বৃদ্ধির $(c - ct = c\,(1 - t))$ গুণ কম হবে।

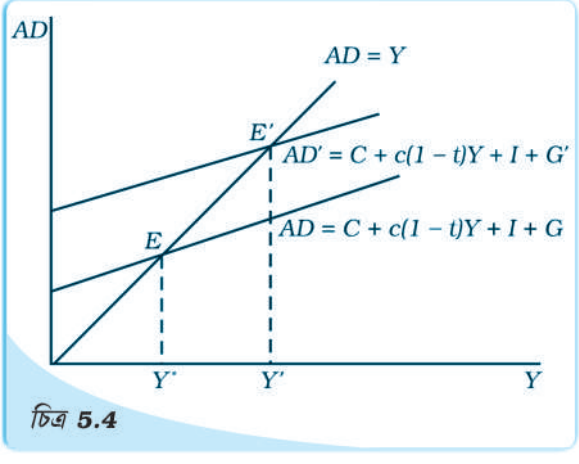

চিত্র 5.4

সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি (সমানুপাতিক কর ধারা)

সরকারি ব্যয় G-এর পরিবর্তনের জন্য গুণকটিকে এখন এভাবে প্রকাশ করা যায়,

$$\Delta Y = \Delta \bar{G} + c\,(1 - t)\Delta Y \qquad (5.19)$$

$$\Delta Y = \frac{1}{1 - c(1-t)}\Delta \bar{G} \qquad (5.20)$$

চিত্র 5.4-এ দেখা যায়, আয় Y^* থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে Y'। কর হ্রাসের প্রভাব কাজ করে ভোগ প্রবণতা বৃদ্ধির অনুরূপ যা 5.5 চিত্রে দেখানো হয়েছে। AD রেখাটি উপরদিকে AD' -এ স্থানান্তরিত হয়। আয়ের প্রারম্ভিক স্তরে, দ্রব্যের সামগ্রিক চাহিদা উৎপাদনকে ছাড়িয়ে যায় কারণ কর হ্রাসের ইন্ধনে ভোগ বৃদ্ধি পায়। নতুন উচ্চ আয়ের স্তর হয় Y'।

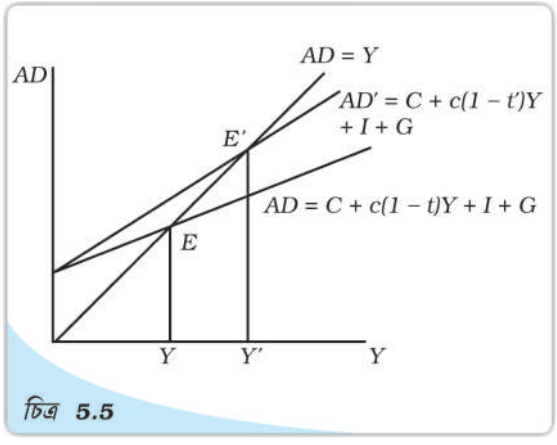

চিত্র 5.5

সমানুপাতিক কর হার হ্রাসের প্রভাব

উদাহরণ 5.2

উদাহরণ 5.1-এর ক্ষেত্রে যদি আমরা করের হার 0.25 ধরে নিই তাহলে আমরা দেখব যে, এখন ভোগ 0.60 ($c\,(1 - t) = 0.8 \times 0.75$) বাড়বে প্রতি একক আয়ের বৃদ্ধির জন্য। পূর্বে ভোগ 0.80 বেড়েছিল। এখন 0.60 বাড়বে। অর্থাৎ পূর্বের তুলনায় ভোগ কম বাড়বে। এখন সরকারি ব্যয় গুণক হবে, $\frac{1}{1-c(1-t)} = \frac{1}{1-0.6} = \frac{1}{0.4} = 2.5$ এখানে গুণকের মান এককালীন নির্দিষ্ট মাত্রার কর আরোপে প্রাপ্ত গুণকের মান অপেক্ষা কম হবে। এখন যদি সরকারি ব্যয় 100 বৃদ্ধি পায় তবে উৎপাদন সরকারি ব্যয় গুণকের গাণিতিক রূপে বাড়বে। অর্থাৎ, $2.5 \times 100 = 250$ বাড়বে। এককালীন নির্দিষ্ট পরিমাণ কর আরোপে যে উৎপাদন বাড়ে এইটি তার চাইতে কম বাড়বে।

এইভাবে সমানুপাতিক আয় কর স্বয়ংক্রিয় সুস্থিত অবস্থা সৃষ্টিকারী হিসাবে কাজ করে। এইটি আকস্মিক আঘাত সহনকারী হিসাবে কাজ করে। এইটি আকস্মিক আঘাত সহনকারী এই কারণে যে, এইটি ব্যয়যোগ্য আয় নিরূপণ করে এবং ফলশ্রুতিতে ভোক্তার ব্যয় নিরূপণ করে। কিন্তু সমানুপাতিক আয় কর জিডিপি-র টানাপোড়নের ক্ষেত্রে কম সংবেদনশীল। জিডিপি বাড়লে একই সাথে ব্যয়যোগ্য আয়ও বাড়ে কিন্তু ব্যয়যোগ্য আয়ের বৃদ্ধি জিডিপি-র বৃদ্ধি অপেক্ষা কম হয়। এর কারণ হল, ব্যয়যোগ্য আয়ের একটি অংশ কর হিসেবে বের হয়ে যায়। এটি ভোগ ব্যয়ের উর্ধ্বমুখী দোলনের সীমা নির্ধারণে সাহায্য করে। আর্থিক মন্দার সময় যখন জিডিপি নিম্নমুখী হয় তখন ব্যয়যোগ্য আয়ের পতন কম দ্রুততার সাথে ঘটে এবং ভোগ ততটা নেমে আসে না যতটা অন্যভাবে হ্রাস পেতে পারে যখন — কর বাবদ দায় অপরিবর্তিত থাকে। এই প্রক্রিয়া সম্মিলিত চাহিদার পতনকে কমায় এবং অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ফিসক্যাল নীতির এই সকল হাতিয়ার সমূহ বিনিয়োগের চাহিদার অনাকাঙ্খিত স্থানান্তরের প্রভাবে সমতা এনে এর পরিবর্তন ঘটাতে পারে। অর্থাৎ যদি বিনিয়োগ I_0 থেকে কমে I_1 হয়, সরকারি ব্যয় G_0 থেকে বেড়ে G_1 হতে পারে, তখন স্বয়ম্ভূত ব্যয় ($C + I_0 + G_0 = C + I_1 + G_1$) এবং ভারসাম্য আয় একই থাকবে। অর্থব্যবস্থার স্থায়িত্ব আনতে এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত কর্মপ্রচেষ্টাকে বলা হয় স্বেচ্ছাধীন ফিসক্যাল নীতি। এটি ফিসক্যাল ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয় স্থায়িত্ব আনয়নকারী ব্যবস্থা কখনোই অর্থব্যবস্থায় সম্পূর্ণভাবে স্থায়িত্ব আনতে পারে না। তাই প্রয়োজন হয় স্বেচ্ছাধীন ফিসক্যাল নীতির প্রয়োগ। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অর্থব্যবস্থার ঊর্ধ্বমুখী এবং নিম্নমুখী চলনে স্থায়িত্ব আনতে সাহায্য করে সমানুপাতিক কর। কল্যাণজনক হস্তান্তরও একইভাবে সাহায্য করে আয়ের স্থায়িত্ব আনতে। আর্থিক সমৃদ্ধির বছরগুলোতে কর্মসংস্থানের প্রচুর বৃদ্ধি ঘটে, এর ফলে বর্ধিত খরচ মিটানোর জন্য কর সংগ্রহের বৃদ্ধি

ভারসাম্যমূলক চাপ তৈরি করে উচ্চ ভোগ ব্যয়ে। পক্ষান্তরে মন্দার সময় এই ধরনের উন্নয়নমূলক ব্যয় ভোগকে বজায় রাখতে সাহায্য করে। উপরন্তু, প্রাইভেট সেক্টরেও নিজস্ব স্থায়িত্ব রক্ষাকারী ব্যবস্থা রয়েছে। স্বল্পকালে আয়ের পরিবর্তনের সময় কোম্পানিগুলো তাদের ডিভিডেন্ট বজায় রাখার চেষ্টা করে এবং পরিবারগুলো তাদের পূর্ববর্তী জীবনযাত্রার মান অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করে। এইসব ব্যবস্থাসমূহ আঘাতকারীর ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের কোনো প্রচেষ্টা নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। এর অর্থ হল, ব্যবস্থাসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে। যদিও নিজস্ব সুস্থিত অবস্থা সৃষ্টিকারী কাজকর্ম অর্থনীতির ওঠানামার একটি নির্দিষ্ট অংশকে হ্রাস করে ফলে অর্থনীতির অবশিষ্ট অংশকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে উদ্দেশ্যমুখী নীতি গ্রহণ করতে হবে।

হস্তান্তর : আমরা ধরে নিচ্ছি যে, দ্রব্য ও পরিষেবায় সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির পরিবর্তে, সরকার হস্তান্তর প্রদান $\overline{TR}$ বৃদ্ধি করে। এখানে স্বয়ম্ভূত ব্যয়, $\bar{A}$, $c\Delta\overline{TR}$ মাত্রায় বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং উৎপাদন বাড়বে। কিন্তু এই বৃদ্ধি সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে যে উৎপাদন বাড়ে তার চাইতে কম হবে। এর কারণ হল হস্তান্তর প্রদানের যে-কোনো পরিমাণ বৃদ্ধির একটি অংশ সঞ্চিত হবে। সরকারি ব্যয় গুণক এবং কর গুণক নির্ণয়ের পূর্বের পদ্ধতি ব্যবহার করে হস্তান্তর পাওনার পরিবর্তনে ভারসাম্য আয়ের পরিবর্তন ঘটবে,

$$\Delta Y = \frac{c}{1-c}\Delta TR \tag{5.21}$$

বা,
$$\frac{\Delta Y}{\Delta TR} = \frac{c}{1-c} \tag{5.22}$$

উদাহরণ 5.3

আমরা ধরে নিচ্ছি যে, প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার মান হল 0.75 এবং আমাদের এককালীন নির্দিষ্ট মাত্রায় কর রয়েছে। যখন সরকারি ক্রয়ের 20 বৃদ্ধি ঘটে তখন ভারসাম্য আয়ের পরিবর্তন হবে $\Delta Y = \frac{1}{1-0.75}\Delta G = 4 \times 20 = 80$। হস্তান্তরের 20 বৃদ্ধি ভারসাম্য আয়ের বৃদ্ধি করবে $\Delta Y = \frac{0.75}{1\ \ 0.75}\Delta TR = 3 \times 20 = 60$ । সুতরাং, আমরা দেখতে পাই যে, সরকারি ক্রয় বৃদ্ধির তুলনায় কম বৃদ্ধি হয় আয়ের।

ঋণ

সরকারি বাজেটে ঘাটতি দেখা দিলে হয় তা কর সংগ্রহ করে, ঋণ নিয়ে অথবা নোট ছাপিয়ে সরকারকে অর্থের সংস্থান করতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারগুলো ঘাটতি মিটাতে ঋণের উপর নির্ভরশীল হয়। ফলশ্রুতিতে সরকারি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই দিক থেকে ঘাটতি ও ঋণের ধারণা দুইটি নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ। ঘাটতিকে একটি প্রবাহ হিসাবে ভাবা হলে তা ঋণের পরিমাণ বাড়ায়। সরকার বছরের পর বছর ধারাবাহিকভাবে ঋণ নিতে থাকলে সরকারি ঋণের থলি স্ফীত হবে এবং সরকারকে সুদ বাবদ বেশি বেশি টাকা মিটাতে হবে। সুদ মিটাতে গিয়ে ঋণের পরিমাণ বাড়বে।

সরকারি ঋণের সঠিক পরিমাণের প্রসঙ্গ : এই বিষয়টির দুইটি আন্তঃসম্পর্কের দিক রয়েছে। এর একটি হল, সরকারি ঋণ কি একটি বোঝা এবং অপরটি হল, ঋণের দেনা মিটানোর জন্য অর্থসংস্থানের বিষয়টি। সরকারি ঋণের বোঝা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণের সময় এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর ঋণের ক্ষেত্রে যা সঠিক বলে বিবেচিত হবে সেটা সরকারি ঋণের ক্ষেত্রে সঠিক নাও হতে পারে এবং এই বিশ্লেষণে আলাদা আলাদা করে 'অংশ'-কে কাঁটাছেড়া না করে 'সমগ্র'কে কেন্দ্রে টেনে বিশ্লেষণ করতে হবে। অন্যথায় কোনো একজন ব্যবসায়ীর ন্যায় সরকারও কর আরোপ করে বা নোট ছাপিয়ে সম্পদ বাড়ানোর প্রচেষ্টা নিতে পারত। সরকারি ঋণের ভার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর স্থানান্তরিত হয়। ফলে ভবিষ্যৎ

বংশধরের ভোগ হ্রাস পায়। এর কারণ হল, সরকার বাজারে বণ্ড ছেড়ে বর্তমান প্রজন্মের কাছ থেকে ঋণ সংগ্রহ করে। কিন্তু বিশ বছর পর কর বাড়িয়ে বণ্ড পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এর ফলে পরিশোধের বোঝা আরোপিত হবে দেশের যুব সম্প্রদায়ের উপর যারা সবেমাত্র কর্মবাহিনীতে নাম লিখিয়েছে। পরিণতিতে যুব সম্প্রদায়ের ব্যয়যোগ্য আয় কমবে এবং সাথে সাথে ভোগও কমবে। এর প্রভাবে জাতীয় সঞ্চয় হ্রাস পাবে বলে যুক্তি দেখানো হয়। একইভাবে, জনসাধারণের কাছ থেকে সরকারের ঋণ নেওয়ার জন্য বেসরকারি ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সঞ্চয়ে টান পড়ে। যেহেতু এর ফলে মূলধন গঠন এবং বৃদ্ধি হোঁচট খায় তাই ঋণ ভবিষ্যৎ বংশধরের কাছে 'বোঝা' হয়ে দাঁড়ায়।

চিরাচরিতভাবে এইরকম যুক্তি দেওয়া হয় যে, যখন সরকার কর কমায় এবং সরকার বাজেট ঘাটতি নিয়ে চলে তখন ভোক্তারা কর থেকে বেঁচে যাওয়া আয় হাতে পেয়ে খরচ বাড়িয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এই ধরনের লোকেরা সম্ভবত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নয় এবং তারা হয়তো ঘাটতি বাজেটের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে না। তাই তারা এরকম প্রতিক্রিয়া দেখায়। তারা উপলব্ধি করতে পারে না যে, ভবিষ্যতের কোনো এক সময়ে সরকার ঋণ ও সুদ পরিশোধ করতে কর বাড়াবে। এমনকি যদি তারা এটি উপলব্ধি করতে পারে যে ভবিষ্যতে কর বাড়বে তথাপি তারা প্রত্যাশা করে যে, বোঝাটা ভবিষ্যৎ বংশধরদের উপর চাপবে।

এর পাল্টাযুক্তি হিসেবে বলা হয়, ভোক্তারা ভবিষ্যৎকে হিসেবে রেখে কাজ করে। তারা তাদের খরচপাতির পরিসর শুধুমাত্র বর্তমান আয়ের নিরিখে ঠিক করে না বরং প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ আয়কে হিসেবের মধ্যে নিয়ে খরচের পরিসর ঠিক করে। তারা বুঝতে পারে যে, আজকে ঋণ নেওয়ার অর্থ হল আগামীদিনে বেশি কর দিতে হবে। উপরন্তু ভোক্তারা তাদের পরিবার এবং সন্তান-সন্ততিসহ পরবর্তী প্রজন্মের কথাও বিবেচনায় রাখবেন এবং ভোক্তাদের কাছে পরিবারের সদস্যরাই হবেন প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের একক। পরিবারসমূহ এখন সঞ্চয় বৃদ্ধি করবে এবং এই পারিবারিক সঞ্চয় বৃদ্ধি সরকারি বি-সঞ্চয়কে পুষিয়ে দেবে। পরিণতিতে জাতীয় সঞ্চয় অপরিবর্তিত থাকবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্‌দের মধ্যে একজন ছিলেন ডেভিড রিকার্ডো। রিকার্ডোর জাতীয় সঞ্চয় অপরিবর্তিত থাকার এই মতামতকে **রিকার্ডিয়ান সমতুল্যতা** বলে। তিনিই প্রথম যুক্তি দিয়েছিলেন যে, বড়সড় ঘাটতির সময় জনসাধারণ বেশি সঞ্চয় করেন। এ ঘটনাকে সমতুল্যতা বলা হয় কারণ কর ও ঋণের সমতুল্যতার অর্থ হল ব্যয়ের জন্য অর্থ সংস্থান, সরকার আজকে ঋণ করে ব্যয় বাড়ালে ভবিষ্যতে কর বাঁচিয়ে সেই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। অর্থনীতিতে এই ঘটনার যে প্রভাব পড়বে সেটা এখন কর বাড়িয়ে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির প্রভাবের অনুরূপ হবে।

এমন যুক্তি দেওয়া হচ্ছে যে 'ঋণ কোনো বিষয় নয় কারণ আমরা নিজেদের জন্য নিজেদের কাছ থেকে ঋণ করি'। এই বক্তব্যের পেছনের যুক্তি হল, ঋণের মাধ্যমে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে সম্পদের স্থানান্তর ঘটলেও দেশের মধ্যেই ক্রয় ক্ষমতা অবস্থান করে। বিদেশ থেকে ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে বাড়তি যে দায়িত্ব আসে তা হল সুদ প্রদানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দ্রব্যসামগ্রী বিদেশে পাঠাতে হয়।

ঘাটতি এবং ঋণের অন্য প্রেক্ষাপট : ঘাটতি নিয়ে সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে যে বক্তব্যটি রয়েছে তা হল, ঘাটতি মুদ্রাস্ফীতিতে ইন্ধন জোগায়। এর কারণ হল, সরকার যখন ব্যয় বৃদ্ধি করে কিংবা কর ছাঁটাই করে তখন সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ফার্ম চলতি দামে চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন বাড়াতে সমর্থ নাও হতে পারে। তাই বাজার দাম বৃদ্ধি পাবে। তথাপি, যদি অব্যবহৃত সম্পদ থেকে যায়, তবে চাহিদার অভাবে উৎপাদন থমকে পড়বে। উচ্চ ফিসক্যাল ঘাটতির সাথে অধিকতর চাহিদা এবং অত্যধিক উৎপাদন যদি হাত ধরাধরি করে থাকে তবে মুদ্রাস্ফীতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

এই যুক্তিও দেওয়া হয় যে, প্রাইভেট সেক্টর থেকে যে পরিমাণ সঞ্চয় সাধারণত পাওয়া যায় তা যদি হ্রাস পায় তবে বিনিয়োগেও ভাঁটার টান পড়ে। এর কারণ হল, সরকার ঘাটতি ব্যয় সামলাতে বণ্ড ছেড়ে জনসাধারণের কাছ থেকে যদি ঋণ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয় তবে এই সরকারি বণ্ডগুলো কর্পোরেট বণ্ড ও অন্য আর্থিক হাতিয়ার সমূহের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে অর্থের জোগানের লভ্যতার জন্য। এই অবস্থায় যদি কয়েকজন ব্যক্তিগত সঞ্চয়কারী বণ্ড ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন সঞ্চয়কারীদের হাতে বিনিয়োগ করার উপযোগী অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ কমে আসবে। এর ফলে কিছু ব্যক্তিগত ঋণকারী অর্থের বাজার থেকে ছিটকে পড়বে। যদিও আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে, অর্থনীতিতে সঞ্চয়ের প্রবাহ স্থির হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না

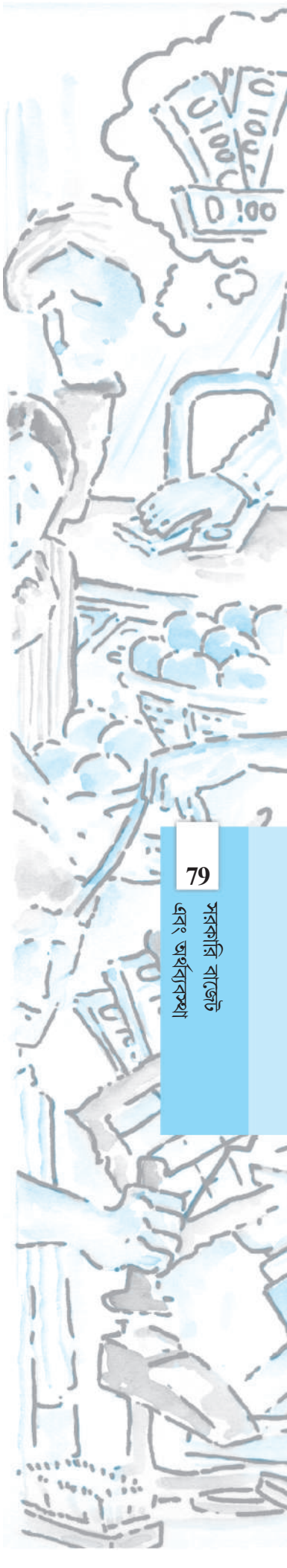

আমরা এই অনুমান করি যে, আয় বৃদ্ধি করা সম্ভবপর নয়। যদি সরকারের ঘাটতি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য পূরণে সফল হয় তবে অর্থনীতিতে অধিক আয় এবং অধিক সঞ্চয় হবে। এই অবস্থায় সরকার এবং শিল্প উভয়েই অধিক পরিমাণে ঋণ করতে পারবে।

তাছাড়াও, সরকার যদি পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ করে, তবে ভবিষ্যত প্রজন্ম অধিক স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে। তবে এ ধরনের বিনিয়োগের প্রতিদান সুদের হারের চেয়ে বেশি হতে হবে। ঋণের দেনা মিটানো যাবে উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা। ঋণকে তাই বোঝা হিসাবে দেখা উচিত হবে না। সামগ্রিক অর্থব্যবস্থার বিকাশের প্রেক্ষিতে ঋণের বৃদ্ধিকে বিচার করতে হবে।

ঘাটতি হ্রাস : কর বৃদ্ধি অথবা ব্যয় সাশ্রয় করে সরকারি ঘাটতি হ্রাস করা যায়। ভারত সরকার প্রত্যক্ষ করের উপর বেশি জোর দিচ্ছে রাজস্ব বাড়ানোর জন্য (পরোক্ষ করগুলো অধোগতিশীল প্রকৃতির — এর প্রভাব সমস্ত আয় গোষ্ঠীর উপর সমানভাবে পড়ে)। সরকার অধিগৃহীত সংস্থার শেয়ার বিক্রি করেও আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। তবে সরকারি ব্যয় সংকোচনের দিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সুপরিকল্পিত কার্যক্রম এবং সুশাসনের মাধ্যমে কার্যকলাপকে আরো দক্ষ করে এটি অর্জন করা যেতে পারে। পরিকল্পনা কমিশনের সাম্প্রতিককালের এক গবেষণায় হিসেব নিকেশে দেখা যায় যা, গরিবদের হাতে সরকারের 1 টাকা পৌঁছাতে 3.65 টাকা খাদ্য ভর্তুকি বাবদ সরকার ব্যয় করে। এই পরিসংখ্যান থেকে পরিলক্ষিত যে, নগদ হস্তান্তর কল্যাণ বৃদ্ধি করবে। সরকারের ব্যয় সংকোচন প্রক্রিয়াকে সফল করতে হলে সরকারি কাজকর্মে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। আর এই দক্ষতা বাড়ানোর জন্য কর্মসূচী নেওয়ার আগে রূপায়ণের উন্নত পরিকল্পনা করতে হবে এবং উত্তম প্রশাসনিক ব্যবস্থাও দরকার হবে। ব্যয় হ্রাসের আর একটি উপায় হল সরকারের কাজের পরিধি কমানো। অর্থাৎ সরকার আগে যে ক্ষেত্রগুলোতে কাজ করত এখন সেগুলো থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়া। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র দূরীকরণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে সরকারি কর্মসূচী ছাটা হলে দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে। অধিকাংশ দেশের সরকারগুলো বিরাট পরিমাণ ঘাটতি নিয়ে চলছে যা সরকারগুলোকে বাধ্য করছে স্ব-আরোপিত বাধা সরিয়ে পূর্ব নির্দিষ্ট স্তর ছাড়িয়ে ব্যয় বৃদ্ধি করতে (বাক্স 5.2-তে এফ আর বি এম এ-র মূল বৈশিষ্ট্যগুলো দেওয়া হয়েছে)। সরকারি ব্যয় হ্রাসের এই ব্যবস্থাগুলো লাগু করার ক্ষেত্রে উপরের বিষয়গুলোকে পরখ করে অগ্রসর হতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ঘাটতির বড়সড় অংক সবসময় ফিসক্যাল নীতির সম্প্রসারণশীলতাকে বুঝায় না। একই ফিসক্যাল ব্যবস্থাপনার মধ্যেও বেশি অথবা কম ঘাটতি সৃষ্টি হতে পারে যা অর্থনীতির অবস্থার উপর নির্ভর করবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো অর্থনীতিতে মন্দা দেখা যায় এবং জিডিপি কমে তাহলে ফার্ম ও পরিবারসমূহ কম কর জমা দেবে কারণ তারা কম আয় করবে। ফলে কর রাজস্বও কমবে। এর অর্থ হল, মন্দার সময় ঘাটতি বাড়ে এবং অর্থনীতির সুদিনে ঘাটতি কমে, যদিও এখানে ফিসক্যাল নীতির কোনো পরিবর্তন হয়নি।

[7] কার্যক্রম মূল্যায়ণ সংস্থা, পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক "লক্ষ্যমুখী গণবণ্টন ব্যবস্থার পারদর্শিতা মূল্যায়ণ"

সারসংক্ষেপ

1. পাবলিক গুডস্ ও প্রাইভেড গুডস্কে সহজেই পৃথক করা গেলেও আমরা সম্মিলিতভাবেই এদের ভোগ করি। পাবলিক গুডস্রের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল - এই সকল দ্রব্যের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। এর অর্থ হল, একজন ব্যক্তি তৃপ্তি মেটানোর জন্য পাবলিক গুডস্রের ভোগ বাড়ালে অন্যদের ভোগে টান পড়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। এছাড়াও পাবলিক গুডস্রের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল এই সকল দ্রব্যের ভোগ থেকে কাউকে বাদ দেওয়া যায় না। এর অর্থ হল পাবলিক গুডস্রের সুবিধা উপভোগ করার অধিকার সবার জন্যই রয়েছে। সাধারণত ব্যক্তিগত উদ্যোগপতিরা এই সকল দ্রব্যের জোগান দেন না মূলত এই কারণে যে, ভোক্তাদের কাছ থেকে দ্রব্য ব্যবহারের ফি আদায় করা খুবই কঠিন। এই কারণে, সরকারকে পাবলিক গুডস্রের জোগান দিতে হয়।
2. বরাদ্দ, পুনর্বণ্টন এবং স্থিতিকরণের কাজ তিনটি পরিচালনা করা হয় সরকারের ব্যয় এবং প্রাপ্তির মাধ্যমে।
3. বাজেট হল সরকারের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ। রাজস্ব বাজেট ও মূলধনী বাজেট-এই দুই ভাগে বাজেটকে ভাগ করা হয়। বাজেটকে এই দুইভাগে ভাগ করার ফলে বর্তমান আর্থিক প্রয়োজন সমূহ এবং দেশের মুলধনী ভাণ্ডারে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা এই দুই ক্ষেত্রের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যায়।
4. ফিসক্যাল ঘাটতির শতাংশের হিসেবে রাজস্ব ঘাটতির বৃদ্ধি ঘটলে বোঝা যায়, সরকারি খরচের গুণমানের অবনমন ঘটেছে এবং মূলধন গঠনও ঝিমিয়ে পড়েছে।
5. সমানুপাতিক কর স্বাধীন ব্যয় গুণকের মান কমায়। এর পেছনের কারণ হল কর আয়ের বাহিরেও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা হ্রাস করে।
6. সরকারি ঋণ বোঝা হয়ে উঠবে যদি ঋণ ভবিষ্যৎ উৎপাদন বৃদ্ধিকে নিম্নগামী করে।

মূল ধারণা

সরকারি দ্রব্য
স্বয়ংক্রিয় সুস্থিত অবস্থা সৃষ্টি
বিচক্ষণ রাজকোষনীতি
রিকার্ডের সমতুল্যতা

বাক্স 5.2: ফিসক্যাল রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট, 2003 (FRBMA)

বহুদলীয় সংসদীয় ব্যবস্থায় নির্বাচকদের মনজয় করার প্রসঙ্গটি সরকারের ব্যয়নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি বলা হয় যে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সরকারকে একটি আইনি ব্যবস্থাপনার মধ্যে রাখা প্রয়োজন যাতে সরকার ঘাটতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। 2003 সালের আগস্ট মাসে এফ আর বি এম এ আইন প্রণয়ন হওয়াকে ফিসক্যাল সংস্কারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে গণ্য করা হয়। এই আইন একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বেড়াজালের মধ্যে থেকে সরকারকে বিচক্ষণ ফিসক্যাল নীতি রূপায়ণে বাধ্য করে। এই আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারকে এমন ফিসক্যাল নীতি প্রণয়ন করতে হবে যাতে প্রজন্মান্তরে সাম্য বজায় থাকে এবং দীর্ঘমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অটুট থাকে। আর এই কাজ সম্পাদনে সরকারকে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে পর্যাপ্ত রাজস্ব উদ্বৃত্ত হয়, আর্থিক নীতি রূপায়ণের পথে ফিসক্যাল বাধা দূর হয় এবং ঘাটতি ও ঋণকে সীমার মধ্যে বেঁধে রেখে ঋণ-ব্যবস্থাপনাকে কার্যকরি করা যায়। এই আইনের আয়ত্তাধীন বিধিসমূহ বিজ্ঞাপিত হয় এবং সেগুলো 2004 সালের জুলাই মাসে লাগু হয়।

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :

1. এই আইন কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করে ফিসক্যাল ঘাটতিকে জিডিপি-র তিন শতাংশের নীচে বেঁধে রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে এবং 2009[৪] সালের মার্চ মাসের শেষ দিনের মধ্যে রাজস্ব ঘাটতিকে মুছে ফেলতে। এরপর পর্যাপ্ত রাজস্ব উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হবে।

[৪] আইনটি সময়কাল পুণর্নির্ধারিত হয় এক বছরের, 2009-10-এর জন্য। পরিকল্পনা খাতের রাজস্ব ব্যয়ের নিবিড় কর্মসূচী ও প্রকল্প রূপায়ণে অগ্রাধিকার প্রদানে এই সময়সীমার পরিবর্তন করা হয়।

2. ঘাটতিকে এই গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখতে হলে প্রতিবছর জিডিপি-র 0.3 শতাংশ হারে ফিসক্যাল ঘাটতি হ্রাস করা প্রয়োজন হবে এবং রাজস্ব ঘাটতিকে জিডিপি-র 0.5 শতাংশ হারে কমাতে হবে। যদি কর রাজস্বের মাধ্যমে ঘাটতিকে বাগে আনা না যায় তবে ব্যয় কাঁটছাট করে প্রয়োজনীয় ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।
3. কেবলমাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগ জাতীয় সুরক্ষা বা অন্য কোনো ব্যতিক্রমী অবস্থায়, যা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নির্দিষ্ট করা হতে পারে, প্রকৃত ঘাটতি পূর্ব নির্দিষ্টি লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।
4. স্বাভাবিক অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া থেকে ঋণ করতে পারবে না। কিন্তু শুধুমাত্র সরকারের নগদ আদায় থেকে নগদ বিতরণ বেশি হলে তা মোকাবিলা করতে সাময়িকভাবে শীর্ষ ব্যাঙ্ক থেকে অগ্রিম বাবদ অর্থ নিতে পারবে।
5. ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে 2006-07 সাল হতে কেন্দ্রীয় সরকারের জারিকৃত জামিনের (সিকিওরিটির) প্রাথমিক শেয়ার ক্রয় করতে হবে না।
6. ফিসক্যাল কর্মকাণ্ডে অধিকতর স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
7. সংসদের উভয় কক্ষে তিনটি বিবরণ পেশ করতে হয় কেন্দ্রীয় সরকারকে। এই বিবরণগুলো হল - মিডিয়াম টার্ম ফিসক্যাল পলিসি স্টেটম্যান্ট, দ্যা ফিসক্যাল পলিসি স্ট্রেটেজি স্টেটমেন্ট, দ্যা ম্যাক্রোইকোনমিক ফ্রেমওয়ার্ক স্টেটমেন্ট। এর সাথে থাকে অ্যানুয়াল ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট।
8. বাজেটের সাথে সম্পর্কিত আয় ও ব্যয়ের প্রবণতার ত্রৈমসিক মূল্যায়নও সংসদের উভয়কক্ষে পেশ করতে হয়।

এই আইনের আওতায় রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। যদিও 26টি রাজ্য ইতিমধ্যে ফিসক্যাল দায়বদ্ধতা আইন পাশ করেছে যেখানে সরকার ফিসক্যাল সংস্কার কর্মসূচীর প্রেক্ষাপটে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এখানে সরকার এফ আর বি এম এ-কে প্রাতিষ্ঠানিক কার্য সাধন পদ্ধতি হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে যার মাধ্যমে ফিসক্যাল শৃঙ্খলা বজায় থাকবে এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছানো যাবে। তবে এখানে একটি উদ্বেগের দিকও রয়েছে যে, এই আইনের বাধ্যতামূলক লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে গিয়ে জনকল্যাণমুখী ব্যয় ছাঁটা হতে পারে।

এফ আর বি এম পর্যালোচনা কমিটি

এফ আর বি এম আইন চালু হওয়ার পরবর্তী তেরো বছরে ভারতীয় অর্থনীতি মধ্য আয়ের দেশের অর্থনীতি হিসেবে উন্নীত হয়েছে। এই আইন প্রণয়নের সময় এই ধারণাটা প্রচলিত ছিল যে বিচক্ষণতার চাইতে আর্থিক বিধি অধিক ফলপ্রসূ। কিন্তু তখন থেকেই উন্নত দেশগুলোর এই ধারণা থেকে সরে আসা শুরু হয়। কিন্তু ভারত সরকার FRBM দ্বারা প্রবর্তিত ফিসক্যাল নীতির উপর আস্থা বজায় রেখেছে। 2003 সালে রচিত মৌলিক কর্মকাঠামো বজায় রাখার লক্ষ্যেই সমর্থন ব্যক্ত হয়। একইসাথে ভবিষ্যতের দিকে নজর রেখে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে এফ আর বি এমকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার দায়িত্ব এফ আর বি এম পর্যালোচনা কমিটির হাতে অর্পণ করা হয়।

বাক্স 5.3: পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) : এক দেশ, এক কর, এক বাজার

পণ্য ও পরিষেবা কর বা জিএসটি হল একটি সুসংহত পরোক্ষকর। এই নতুন কর চালু হয়েছে 2017 সালের 1 জুলাই থেকে। উৎপাদক থেকে শুরু করে অন্তিম ব্যবহারকারী বা ভোক্তা পর্যন্ত পণ্য ও পরিষেবার সরবরাহের প্রতিটি ধাপে জিএসটি আদায় করা হবে। এটি পণ্য ও পরিষেবা ব্যবহার করার উপর বা ভোগের উপর গন্তব্যভিত্তিক কর যেখানে সরবরাহ চেইনে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের সুবিধা রয়েছে। ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের অর্থ হল কোনো বিশেষ ধাপে কর-এর ক্ষেত্রে ঠিক আগের ধাপে দেওয়া করের পরিমাণ ক্রেডিটরূপে গণ্য হবে। এক ধরনের পণ্য অথবা পরিষেবার জন্য সারা দেশে একই হারে কর প্রযোজ্য হবে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অনেকগুলো কর ও সেসকে জিএসটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পণ্য ও পরিষেবার উৎপাদন বা বিক্রি অথবা সেবা প্রদানের উপর ধার্য ও আদায়কৃত একাধিক করকে ছেঁটে দিয়েছে জিএসটি।

অর্থনীতিতে অনেক মধ্যবর্তী পর্যায়ের দ্রব্য বা সেবা রয়েছে যেগুলো উৎপাদন বা সরবরাহ করা হয়। জিএসটি চালু হওয়ার আগে দ্রব্য উৎপাদনের প্রতি ধাপে মূল্য সংযোজনের উপর কর আরোপ না করে পণ্য ও

সেবার মোট মূল্যের উপর কর ধার্য করা হত। ফলে এক্ষেত্রে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের সুবিধা পাওয়ার ন্যূনতম সুযোগ ছিল না। জিএসটি চালু হওয়ার আগে অন্তবর্তী দ্রব্য বা পরিষেবায় যে কর প্রদান করা হত সেগুলো মোট মূল্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হত। এভাবে করের উপর কর বসানোকে কাসকেডিং এফেক্ট অব ট্যাক্স বলা হয়। কিন্তু জিএসটিতে সরবরাহের প্রত্যেক ধাপে কর দিতে হয়। তবে কোনো বিশেষ ধাপে কর-এর ক্ষেত্রে ঠিক আগের ধাপে দেওয়া করের পরিমাণ ক্রেডিট রূপে গণ্য হবে। সংক্ষেপে বলতে হয় সরবরাহের প্রতিটি ধাপে যে মূল্যযুক্ত হবে তার উপর কর দিতে হবে। আমাদের দেশের বৃহৎ ও দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতিতে কর ব্যবস্থায় সমতা আনতে জিএসটি সাহায্য করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে এবং সকল পণ্য এবং সেবায় মূল্যযুক্ত কর কাঠামোর নীতি রূপায়ণে সাহায্য করবে জিএসটি।

বিভিন্ন রকমের কর বা সেস যা কেন্দ্র এবং রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত সরকারগুলো ধার্য ও সংগ্রহ করত সেগুলোকে হটিয়ে দিয়েছে জিএসটি। কেন্দ্র যে করগুলো ধার্য করত তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হল — কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক, পরিষেবা কর, কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার কে কে সি (কৃষক কল্যাণ সেস) এবং এসবিসি-র (স্বচ্ছ ভারত সেস) মতো সেসগুলোকে আদায় করত। রাজ্য যে প্রধান করগুলো পেত সেগুলো হল — বাজি ধরা বা জুয়ার উপর কর, পণ্য দ্রব্যে আরোপিত রাজ্যের সেস ইত্যাদি। এগুলো সব জিএসটি-র ছাতার তলায় চলে আসবে।

পাঁচটি পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যকে কিছুদিনের জন্য জিএসটি-র আওতার বাইরে রাখা হয়েছে, তবে আগামীদিনে তাদের জিএসটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। রাজ্য সরকারগুলো মানুষের ভোগের ব্যবহৃত মাদক পানীয়ের উপর যে ভ্যাট সংগ্রহ করে তা চালু থাকবে। তামাক এবং তামাকজাত পণ্যতে জিএসটি এবং কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক উভয়ই চালু থাকবে। সারা দেশে পণ্য কিংবা পরিষেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে ছয়টি নির্দিষ্ট হারে জিএসটি সংগ্রহ করা হবে। এই হারগুলো হল যথাক্রমে 0%, 3%,5%, 12%,18% এবং 28%।

স্বাধীন ভারতে কর সংস্কারের লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল জিএসটি। 2017 সালের 30 জুন/1 জুলাই মধ্যরাতে সংসদের বিশেষ অধিবেশনে জিএসটি বিল পাশ করা হয়। 2016 সালের 8 সেপ্টেম্বর সংবিধানের 101-তম সংশোধনী রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে। সংশোধনের ফলে 246A ধারা সংবিধানে যুক্ত হয়। এই ধারার ফলে পণ্য ও পরিষেবা করের সাথে সঙ্গতি রেখে আইন প্রণয়নে সংসদ ও রাজ্য বিধানসভাগুলোকে অধিকার দেওয়া হয়। এরপর সিজিএসটি অ্যাক্ট, ইউটিজিএসটি অ্যাক্ট এবং এসজিএসটি অ্যাক্ট এই আইনগুলো জিএসটি'র জন্য প্রণয়ন করা হয়। আগে করের ক্ষেত্রে যে জটিলতা ছিল তা সরলীকৃত করে জিএসটি। এই প্রণীত আইনগুলো সারা দেশে করের হারে সমতা আনে। জিএসটি পণ্য ও পরিষেবার চলাচলের ক্ষেত্রে স্বাধীনতাকে প্রোৎসাহিত করে এবং একটি সাধারণ দেশব্যাপী বাজার সৃষ্টি করে। এই কর ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল ব্যবসায়িক কাজকর্মের খরচ কমানো এবং বাণিজ্যে বিভিন্ন করের কাসকেডিং এফেক্ট-এ হ্রাস টানা। এটি সার্বিকভাবে উৎপাদনের খরচ কমিয়েছে। এর ফলে ভারতীয় পণ্য ও সেবা দেশীয় ও বিদেশের বাজারে আরও বেশি প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠবে। জিএসটি দেশের অর্থনীতির বিকাশের গতিকে বেগবান করবে। আশা করা হচ্ছে, জিএসটি আর্থিক বিকাশের হারের 2 শতাংশ বৃদ্ধি করবে। কর আনুগত্যের বিষয়টা আরও সহজতর হবে। কর প্রদান সম্পর্কিত যাবতীয় পরিষেবা যেমন রেজিস্ট্রেশন, রিটার্ন দাখিল, কর জমা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য কমন পোর্টাল www.gst.gov.in. -তে পাওয়া যাবে। জিএসটি করের ভিত্তিকে আরও বিস্তৃত করবে। এই ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা থাকবে। করদাতা ও সরকারের মধ্যে মানুষের হস্তক্ষেপ কমবে এবং স্বস্তিতে ব্যবসা বাণিজ্য করে উন্নতি বিধান করবে।

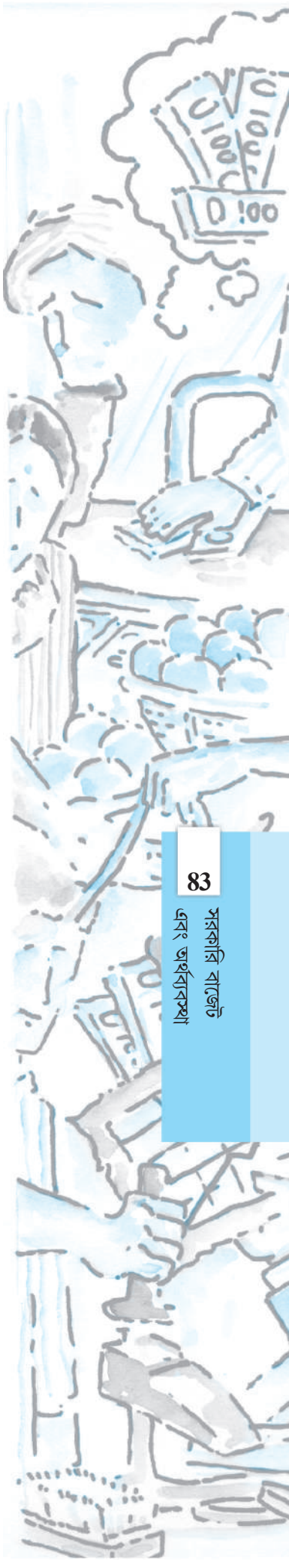

অনুশীলনী

1. পাবলিক গুডস বা সরকারি দ্রব্যের জোগান দেবার দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হয় কেন তা ব্যাখ্যা করো।
2. রাজস্ব ব্যয় এবং মূলধনী ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।
3. 'রাজকোষ ঘাটতির কারণে সরকারকে ঋণ নিতে হয়।' বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করো।
4. রাজস্ব ঘাটতি এবং ফিসক্যাল ঘাটতির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করো।
5. ধরো, একটি নির্দিষ্ট অর্থনীতিতে, বিনিয়োগের পরিমাণ হল 200, সরকারি ক্রয়ের অংক হল 150, নিট কর (অর্থাৎ এককালীন নির্দিষ্ট কর বা লাম্প-সাম ট্যাক্স থেকে হস্তান্তর বিয়োগ হল 100 এবং ভোগ অপেক্ষকটি

হল $C = 100 + 0.75Y$ । (a) এক্ষেত্রে ভারসাম্য আয়ের স্তর কি হবে? (b) সরকারি ব্যয় গুণক ও কর গুণকের মান নির্ণয় করো। (c) যদি সরকারি ব্যয় বেড়ে 200 হয়, তবে ভারসাম্য আয়ের পরিবর্তন নির্ণয় করো।

6. ধরো, একটি অর্থনীতির নিম্নলিখিত অপেক্ষকগুলো দেওয়া আছে : $C = 20 + 0.80Y$, $I = 30$, $G = 50$, $TR = 100$ (a) এই মডেল অর্থব্যবস্থার ভারসাম্য আয়ের স্তর এবং স্বয়ম্ভূত ব্যয় গুণক নির্ণয় করো। (b) যদি সরকারি ব্যয়ের 30 বৃদ্ধি হয়, তবে ভারসাম্য আয়ের উপর প্রভাব কী হবে? (c) যদি সরকারি ক্রয় বাড়াতে একসাথে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় কর 30 যোগ করা হয়, তবে ভারসাম্য আয়ের কতটা পরিবর্তন হবে?
7. উপরের প্রশ্নে, 10 শতাংশ হস্তান্তরের বৃদ্ধিতে এবং লাম্প-সাম ট্যাক্সের 10 শতাংশ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদনের উপর প্রভাব নির্ণয় করো। দুটি প্রভাবের মধ্যে তুলনা করো।
8. মনে করো যে, $C = 70 + 0.70Y\ D$, $I = 90$, $G = 100$, $T = 0.10Y$ (a) ভারসাম্য আয় নির্ণয় করো। (b) ভারসাম্য আয়ে কর রাজস্ব কত হবে? এক্ষেত্রে সরকারের বাজেটে ভারসাম্য রয়েছে কি?
9. ধরো, প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা 0.75 এবং সমানুপাতিক আয় কর হল 20 শতাংশ। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ভারসাম্য আয়ের পরিবর্তন নির্ণয় করো (a) সরকারি ক্রয়ের 20 বৃদ্ধি করা হল (b) হস্তান্তর 20 হ্রাস পেল।
10. চূড়ান্ত বা পরমমানে কর গুণকের মান, সরকারি ব্যয় গুণক অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।
11. সরকারি ঘাটতি এবং সরকারি ঋণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো।
12. সরকারি ঋণ কি বোঝা চাপায়? ব্যাখ্যা করো।
13. রাজকোষ ঘাটতি কি দামস্ফীতি ঘটায়?
14. ঘাটতি হ্রাস পদ্ধতি আলোচনা করো।
15. পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) বলতে কি বুঝ? পুরানো কর ব্যবস্থার তুলনায় জিএসটি ব্যবস্থা কীভাবে ভালো? এর বিভাগগুলো উল্লেখ করো।

Suggested Readings

1. Dornbusch, R. and S. Fischer. 1994. *Macroeconomics*, sixth edition. McGraw-Hill, Paris.
2. Mankiw, N.G., 2000. *Macroeconomics*, fourth edition. Macmillan Worth publishers, New York.
3. *Economic Survey*, Government of India, various issues.

অধ্যায় 6

মুক্ত অর্থব্যবস্থা সমষ্টিগত অর্থনীতি

মুক্ত অর্থব্যবস্থা হল সেই অর্থ ব্যবস্থা যেখানে একটি দেশ বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে বিভিন্ন উপায়ে পারস্পরিক আদান-প্রদানে লিপ্ত হয়। এতদিন পর্যন্ত আমরা মুক্ত অর্থব্যবস্থার ধারণাটি বিবেচনা না করে শুধুমাত্র বন্ধ অর্থনীতি সম্পর্কেই আলোচনা করেছি, যেখানে বহির্বিশ্বের দেশগুলোর সঙ্গে কোনো যোগসূত্র ছিল না। বিশ্লেষণকে সহজবোধ্য করতে এবং সমষ্টিগত অর্থব্যবস্থার প্রাথমিক কর্মপদ্ধতির বিষয়গুলোকে সহজ সরলভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা বন্ধ অর্থনীতির পরিসরে আলোচনা করেছি। আসলে বেশিরভাগ আধুনিক অর্থব্যবস্থা হল মুক্ত অর্থব্যবস্থা।

এখানে তিনটি উপায় রয়েছে যার মাধ্যমে দেশগুলোর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

1. **উৎপাদনের বাজার :** একটি অর্থব্যবস্থা, অন্যান্য দেশের সঙ্গে দ্রব্য ও সেবার বাণিজ্যে আবদ্ধ হতে পারে। এর ফলে পছন্দের সীমা চওড়া হয়। অর্থাৎ ভোক্তারা ও উৎপাদকেরা দেশীয় ও বিদেশী দ্রব্যের মধ্যে পছন্দসই দ্রব্যটি নির্বাচন করতে পারেন।
2. **আর্থিক বাজার :** প্রায়শই একটি অর্থব্যবস্থা অন্য দেশ হতে আর্থিক সম্পদ ক্রয় করতে পারে। এর ফলে অন্তঃদেশীয় এবং বিদেশের সম্পত্তির মধ্য থেকে পছন্দসই সম্পদ ক্রয় করার সুযোগ পায় বিনিয়োগকারীরা।
3. **শ্রমের বাজার :** ফার্ম কোথায় উৎপাদন করবে এবং শ্রমিকরা কোথায় কাজ করবে তা তারা নির্বাচন করতে পারে। এমন অনেক অভিবাসন আইন আছে যেগুলো দুটি দেশের মধ্যে শ্রমের চলাচলের উপর বাধানিষেধ আরোপ করে।

দ্রব্যের চলাচলকে চিরাচরিতভাবে শ্রমের চলাচলের বিকল্প হিসাবে দেখানো হয়েছে। আমরা প্রথমে এই দুইয়ের যোগসূত্রের উপর আলোকপাত করব। সুতরাং, মুক্ত অর্থব্যবস্থা হল এমন একটি অর্থব্যবস্থা যেখানে অন্যান্য দেশের সঙ্গে দ্রব্য ও সেবার বাণিজ্য হয় এবং প্রায়শই অনুরূপভাবে আর্থিক সম্পদের বাণিজ্য হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসাবে, ভারতীয়রা ওই সমস্ত পণ্য দ্রব্য ভোগ করতে পারে যেগুলো বিশ্বের অন্যান্য দেশে উৎপাদিত হয় এবং ভারতে উৎপাদিত কিছু দ্রব্য অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা হয়।

অতএব, বৈদেশিক বাণিজ্য ভারতের সামগ্রিক চাহিদাকে দুইভাবে প্রভাবিত করে। প্রথমত ভারতীয়রা যখন বিদেশের দ্রব্য ক্রয় করে তখন এই বাবদ খরচটা আয়ের চক্রাকার প্রবাহ থেকে **নির্গত** হয়ে হারিয়ে যায় এবং সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস করে। দ্বিতীয়ত, বিদেশীদের কাছে আমাদের রপ্তানি আয়ের চক্রাকার প্রবাহে **অন্তঃক্ষেপণ** হিসেবে প্রবেশ করে দেশীয় অর্থনীতিতে দ্রব্যের সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি করে।

যখন দ্রব্যের চলাচল দেশের সীমার বাইরে হয় তখন লেনদেনের জন্য অবশ্যই **অর্থের** ব্যবহার হয়। আন্তর্জাতিক স্তরে এমন কোনো একক মুদ্রা নেই যা কোনো একটি ব্যাংক চালু

করেছে। বিদেশের অর্থনৈতিক এককগুলো কোনো একটি জাতীয় মুদ্রাকে তখনই গ্রহণ করবে যখন তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবে যে, তারা যে মুদ্রা ব্যবহার করে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করবে সেই মুদ্রার মান ঘন ঘন পরিবর্তন হবে না। অন্যভাবে বলা যায় যে, মুদ্রাটি একটি স্থিতিশীল ক্রয়ক্ষমতা বজায় রাখবে। এই বিশ্বাস সৃষ্টি করা না গেলে বিনিময়ের আন্তর্জাতিক মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হবে না এবং হিসেবের একক রূপেও এর ব্যবহার হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে একটি নির্দিষ্ট মুদ্রাকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেবে।

অতীতে সরকারগুলো মুদ্রার সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের আস্থা অর্জনের জন্য এই ঘোষণা করতো যে জাতীয় মুদ্রা সহজভাবে একটি নির্দিষ্ট দামে অন্য সম্পদে রূপান্তরযোগ্য হবে। অনুরূপভাবে, মুদ্রা বিনিময়কারী সংস্থার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না সেই সম্পদের মূল নির্ধারণে যা মুদ্রায় রূপান্তরিত হবে। এই অন্য সম্পদ প্রায়শই হত স্বর্ণ অথবা অন্য দেশের জাতীয় মুদ্রা। এই প্রতিশ্রুতির দুইটি প্রেক্ষিত রয়েছে যার মাধ্যমে পদ্ধতিটির বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষিত হয় সেগুলো হল — অসীম পরিমাণ মুদ্রা সহজে রূপান্তর করা যাবে এবং যে দামে রূপান্তর ঘটবে তা অপরিবর্তিত থাকবে। আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতাকে সুনিশ্চিত করতে এবং মুদ্রা বিনিময় বিষয়ক সমস্যাগুলোকে মোকাবিলা করতে **আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থার** উদ্ভব ঘটে।

লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে জাতীয় মুদ্রাগুলোর রূপান্তরের সময় স্বর্ণকে সম্পদরূপে গচ্ছিত রাখা হত (বাক্স 6.2 দেখো)। যদিও কয়েকটি জাতীয় মুদ্রার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা ছিল যা দুইটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেনে ব্যবহৃত হত। উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকাতে তৈরি একটি দ্রব্য একজন ভারতীয় ক্রয় করতে যদি চায় তাহলে ডলারের প্রয়োজন হয় যার মাধ্যমে সে এই লেনদেন সম্পূর্ণ করতে পারে। যদি স্বর্ণের দাম 10 ডলার হয়, তাহলে ব্যক্তিকে জানতে হবে কি পরিমাণ তাকে খরচ করতে হবে ভারতীয় মুদ্রায়। এর অর্থ হল, টাকার নিরিখে ডলারের মূল্য তাকে জানতে হবে। কোনো একটি মুদ্রার দামকে **বৈদেশিক বিনিময় হার** বলা হয় বা **সরলরূপে বিনিময় হার** বলা হয়। আমরা এইটি পরিচ্ছেদ 6.2-এ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

6.1 লেনদেন উদ্বৃত্ত

কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে, সাধারণত এক বছরে, এক দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের যাবতীয় অর্থনৈতিক লেনদেনের ধারাবাহিক হিসাবকে ওই দেশের লেনদেনের উদ্বৃত্ত বা লেনদেনের হিসাব বলে। লেনদেন উদ্বৃত্তের দুটি মুখ্য খাত আছে — চলতি খাত এবং মূলধনী খাত[1] ।

6.1.1 চলতি খাত

চলতি খাতে দ্রব্য ও সেবার বাণিজ্য এবং হস্তান্তর পাওনার রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত হয়। চিত্র 6.1-এ এই খাতের উপাদানগুলো সচিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। দ্রব্যের বাণিজ্যের মধ্যে দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি অন্তর্ভুক্ত হয়। পরিষেবার বাণিজ্যের মধ্যে উপকরণ আয় ও অ-উপকরণ আয়জনিত লেনদেন অন্তর্ভুক্ত হয়। হস্তান্তর পাওনা বা হস্তান্তর আয়সমূহ (Transfer payments) হল দেশের নাগরিকদের আয় যা তারা দ্রব্য ও সেবা সরবরাহ না করেই 'বিনা খরচায়' পায়। হস্তান্তর আয় / হস্তান্তর পাওনার মধ্যে উপহার, বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ (রেমিট্যান্স), অনুদান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়। হস্তান্তর আয় সরকারের তরফে কিংবা বিদেশে বসবাসকারী কোনো নাগরিক পাঠায়।

[1] লেনদেন উদ্বৃত্তের আর একটি নতুন শ্রেণিবিন্যাস রয়েছে যেখানে লেনদেনকে তিনটি হিসেবের খাতে ভাগ করা হয়েছে। এই বিভাগগুলো হল — চলতি খাত, আর্থিক খাত এবং মূলধনী খাত। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আই এম এফ) দ্বারা প্রকাশিত ব্যালেন্স অব পেমেন্ট অ্যাণ্ড ইন্টারন্যাশানাল ইনভেস্টমেন্ট পজিশন ম্যানুয়ালের (BPM6) ষষ্ঠ সংস্করণে এই নতুন হিসাব রক্ষা পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। আই এম এফ-এর সাথে সঙ্গতি রেখে ভারতও পদ্ধতির পরিবর্তন করে। কিন্তু আর বি আই পুরানো পদ্ধতিতে হিসেব করে তথ্য পরিবেশন করে চলেছে।

বিদেশী দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের জন্য আমাদের দেশের খরচ হবে এবং যে দেশ থেকে ক্রয় করা হবে সেই দেশের আয় হবে। সুতরাং, বিদেশী দ্রব্য ক্রয় বা আমদানির ফলে আমাদের দেশের দ্রব্য ও সেবার অভ্যন্তরীণ চাহিদা হ্রাস পায়। একইভাবে, বিদেশে দ্রব্য বিক্রি করলে বা রপ্তানি করলে আমাদের দেশের আয় বৃদ্ধি পায় এবং আমাদের দেশের অভ্যন্তরে দ্রব্য ও সেবার সামগ্রিক চাহিদা বাড়ে।

চিত্র 6.1: চলতি খাতের উপাদানসমূহ

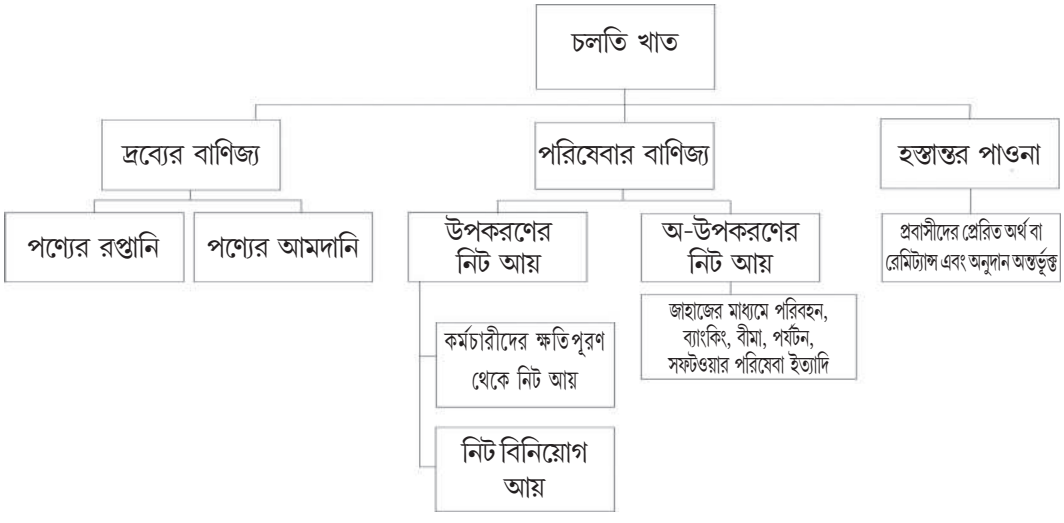

চলতি খাতে ভারসাম্য

চলতি খাতে তখনই সমতা বা ভারসাম্য আসে যখন চলতি খাতে প্রাপ্ত আয় ও চলতি খাতের ব্যয় সমান হয়। চলতি খাতে উদ্বৃত্ত হওয়ার অর্থ হল, দেশটি অন্য দেশগুলোকে ধার দেয় এবং চলতি খাতে ঘাটতির অর্থ হল দেশটি অন্য দেশসমূহের কাছ থেকে ঋণ নেয়।

চলতি খাতের উদ্বৃত্ত	চলতি খাতে ভারসাম্য	চলতি খাতে ঘাটতি
প্রাপ্তি > প্রদান	প্রাপ্তি = প্রদান	প্রাপ্তি < প্রদান

চলতি খাতে ভারসাম্যে দুটি উপাদান থাকে:

- বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত বা উদ্বৃত্ত-বাণিজ্য
- অদৃশ্য খাতে উদ্বৃত্ত

বাণিজ্য উদ্বৃত্ত (BOT) এটি হল একটি দেশের একটি নির্দিষ্ট সময়কালে পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি মূল্য ও আমদানি মূল্যের মধ্যে পার্থক্য। বাণিজ্য উদ্বৃত্তের জমার খাতে ঢোকানো হয় পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি। আর বাণিজ্য উদ্বৃত্তের খরচের হিসেবে আসে পণ্যের আমদানি। একে ট্রেইড ব্যালেন্সও বলা হয়।

পণ্যের রপ্তানি ও আমদানি সমান হলে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছায়। ট্রেইড ব্যালেন্সে উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হয় যখন দেশটি আমদানির চাইতে বেশি দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানি করে। আর বিওটি-তে ঘাটতি দেখা যায় যখন দেশটি রপ্তানির তুলনায় বেশি পণ্য আমদানি করে। **নিট অদৃশ্য** সমূহ হল, একটি দেশের একটি সময়কালের অদৃশ্য রপ্তানি মূল্য ও অদৃশ্য আমদানি মূল্যের মধ্যে পার্থক্য। অদৃশ্য হল যা দৃশ্যমান হয় না বা চোখে দেখা যায় না। অদৃশ্য রপ্তানি ও আমদানি বলতে সেবার দেওয়া-নেওয়াকে বুঝায়। এর মধ্যে রয়েছে পরিষেবার বাণিজ্য।

অর্থাৎ উপকরণের আয় ও অ-উপকরণের আয় উভয়েই রয়েছে। উপকরণের আয় বা ফ্যাক্টর ইনকামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় উৎপাদনের উপকরণের নিট আন্তর্জাতিক উপার্জনসমূহ (যেমন শ্রম, জমি এবং মূলধন)। আর অ-উপকরণের আয় হল সেবা উৎপাদনের বিক্রি যেমন জাহাজ পরিবহন, ব্যাংক পরিষেবা, পর্যটন, সফটওয়্যার পরিষেবা ইত্যাদি।

6.1.2 মূলধনী খাত

সম্পদের সকল আন্তর্জাতিক লেনদেনের রেকর্ড রাখা হয় মূলধনী খাতে। সম্পদ হল সেই সকল দ্রব্য যাদের অর্থমূল্য আছে। উদাহরণস্বরূপ, টাকাকড়ি, স্টক, বণ্ড এবং সরকারের ঋণ ইত্যাদি। সম্পদের ক্রয় করা হলে তা মূলধনী খাতের খরচের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। যদি একজন ভারতীয় একটি ব্রিটেনের শাড়ির কোম্পানি ক্রয় করে তাহলে এই অর্থটা মূলধনী হিসাবের খরচের বিষয়রূপে অন্তর্ভুক্ত হবে (যেহেতু ভারত থেকে বৈদেশিক মুদ্রার বহিঃ প্রবাহ ঘটেছে)। অপরদিকে সম্পদের বিক্রয়কে মূলধনী খাতের জমার ঘরে রাখা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন চিনা খরিদ্দারের নিকট ভারতীয় কোম্পানির শেয়ার বিক্রিটা হবে সম্পদের বিক্রয় এবং সেটা মূলধনী হিসাবের জমার ঘরে স্থান পাবে। মূলধনী খাতের লেনদেনের বিষয়গুলোকে 6.2 চিত্রে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। এই বিষয়গুলো হল বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (FDIs), বৈদেশিক প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ (FIIs), বৈদেশিক ঋণ এবং সাহায্য।

চিত্র 6.2: মূলধনী খাতের উপাদানসমূহ

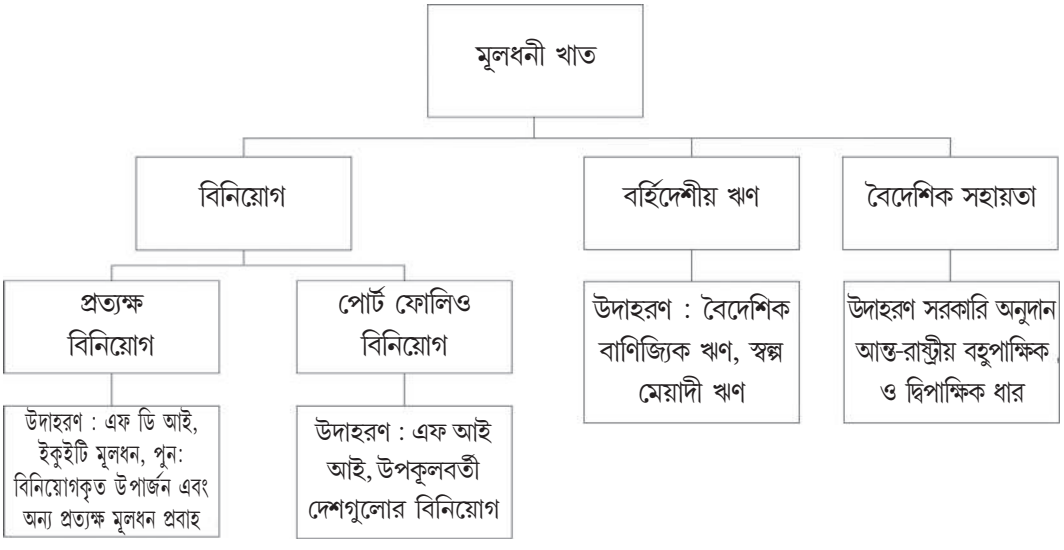

মূলধনী খাতে ভারসাম্য

মূলধনীখাতে ভারসাম্য দেখা দেবে যখন মূলধনের অন্তঃপ্রবাহ (যেমন বিদেশ থেকে ঋণ নেওয়া, সম্পদের বিক্রি অথবা বিদেশের কোম্পানির শেয়ার বিক্রি) ও মূলধনের বহিঃপ্রবাহ সমান হবে। মূলধনের বহিঃপ্রবাহের উদাহরণ হল ঋণ পরিশোধ, সম্পদ ক্রয় বা বিদেশের শেয়ার ক্রয়। মূলধনী খাতে উদ্বৃত্ত দেখা দেবে যখন মূলধনের বহিঃ প্রবাহ থেকে মূলধনের অন্তঃপ্রবাহ বেশি হবে। আর এই খাতে ঘাটতির সৃষ্টি হবে যখন মূলধনের অন্তঃপ্রবাহ থেকে মূলধনের বহিঃপ্রবাহ বেশি হবে।

6.1.3 লেনদেন ব্যালেন্সে ঘাটতি ও উদ্বৃত্ত

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেনের মূল বিষয় হল যে, বহির্বাণিজ্যে দেশটি আয়ের চাইতে চলতি খাতে ব্যয় বেশি করলে তাকে এই বাড়তি খরচ মিটাতে, হয় বাহির থেকে ঋণ করতে হবে বা সম্পদ বিক্রি করতে হবে যেমনটা

আয় থেকে ব্যয় বেশি করেন এমন ব্যক্তিকে যেভাবে আয় ও ব্যয়ের ব্যবধান ঘুচানোর জন্য ঋণ করতে হয় অথবা সম্পদ বিক্রি করতে হয়। সুতরাং, চলতি খাতে যে-কোনো ঘাটতি মেটানো হয় মূলধনী খাতের উদ্বৃত্তের সাহায্যে। একেই নিট মূলধনের অন্তঃপ্রবাহ বলা হয়।

চলতি খাত + মূলধনী খাত h 0

এই বিশেষ অবস্থাটিকে বলা হয় লেনদেন উদ্বৃত্তে সাম্য অবস্থা। এক্ষেত্রে চলতি খাতের ঘাটতিকে সম্পদের প্রবাহ ছাড়াই মিটানো হয় আন্তর্জাতিক ঋণের সাহায্যে।

বিকল্প রাস্তায় ব্যালেন্স অব পেমেন্টের ঘাটতি মিটাতে দেশটি বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয়কেও ব্যবহার করতে পারে। ঘাটতির সময়ে রিজার্ভ ব্যাংক সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রি করতে পারে। একে **সরকারিভাবে সঞ্চয় বিক্রি** বলা হয়। সরকারি সঞ্চয়ের হ্রাসকে (বৃদ্ধিকে) বলা হয় **সামগ্রিকভাবে ব্যালেন্স অব পেমেন্ট ঘাটতি (উদ্বৃত্ত)**। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল, ব্যালেন্স অব পেমেন্টে ঘাটতি (অথবা যে-কোনো উদ্বৃত্তের গ্রাহক) দেখা দিলে আর্থিক কর্তৃপক্ষ সমূহই অর্থ সংস্থানের শেষ কথা বলে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সরকারি সঞ্চয়ের লেনদেন পদ্ধতি খুবই প্রাসঙ্গিক হয় যখন মুদ্রা বিনিময়ের হার স্থির থাকে। কিন্তু বিনিময়ের হার বাজার নির্ভর হলে এই পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে কম কার্যকর হয়। (পরিচ্ছেদ 6.2.2-এর উপ শিরোনাম 'স্থির বিনিময় হার' দেখো)।

স্বয়ম্ভূত ও সমতাকারক ক্রিয়াকলাপ

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক লেনদেনগুলোকে **স্বয়ম্ভূত** লেনদেন বলা হবে যখন লেনদেন উদ্বৃত্তের ব্যবধান পূরণ না করেই অন্য কোনো কারণে লেনদেন সংঘটিত হয়, অর্থাৎ যখন দেশ দুইটি ব্যালেন্স অব পেমেন্টের অবস্থাকে নিয়ে উদাসীন থাকে। এর একটি কারণ হতে পারে মুনাফা অর্জন করা। লেনদেন উদ্বৃত্তে এই সকল বিষয়গুলোকে বলা হয় লাইনের উপরের বিষয়। লেনদেন উদ্বৃত্তকে তখনই উদ্বৃত্ত (ঘাটতি) বলা হবে যখন স্বয়ম্ভূত পাওনা স্বয়ম্ভূত দেনা অপেক্ষা বেশি (কম হয়)।

অপরদিকে **সমতাকারক ক্রিয়াকলাপ** ('লাইনের নীচের বিষয়' বলে উল্লেখিত হয়) লেনদেন উদ্বৃত্তের ব্যবধান নির্ধারণ করে। অর্থাৎ লেনদেন উদ্বৃত্তে ঘাটতি অথবা উদ্বৃত্ত আছে কিনা তা নির্ণয় করে। অন্যভাবে বলা যায় সমতাকারক ক্রিয়াকলাপগুলো স্বয়ম্ভূত লেনদেনের নিট ফলাফল যাচাই করে। যেহেতু সরকারি সঞ্চয়ের লেনদেন বিওপি-র ব্যবধান গোছানোর সেতু তৈরি করে তাই তাদেরকে বিওপি-র সমতাকারক উপাদান হিসেবে দেখা হয় (এছাড়া অন্যসবগুলো হবে স্বয়ম্ভূত)।

ত্রুটি ও বিচ্যুতি

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকল লেনদেন নিখুঁতভাবে রেকর্ড করার কাজটা কঠিন। সুতরাং, বিওপি-র একটি তৃতীয় খাত আমাদের রয়েছে (মূলধনী ও চলতি হিসেবের খাত ব্যতীত) যাতে **ত্রুটি ও বিচ্যুতি** বলে।

সারণি 6.1 এতে ভারতের লেনদেন উদ্বৃত্তের একটি নমুনা পেশ করা হয়েছে। সারণিটি লক্ষ করলে দেখবে, এখানে বাণিজ্য ঘাটতি এবং চলতি খাতে ঘাটতি রয়েছে কিন্তু মূলধনী খাতে উদ্বৃত্ত রয়েছে। ফলশ্রুতিতে, বিওপিতে ভারসাম্য রয়েছে।

BoP-তে ঘাটতি	**BoP**-তে ভারসাম্য	**BoP**-তে উদ্বৃত্ত
সার্বিক ভারসাম্য < 0	সার্বিক ভারসাম্য = 0	সার্বিক ভারসাম্য > 0
সঞ্চয়ের পরিবর্তন > 0	সঞ্চয়ের পরিবর্তন = 0	সঞ্চয়ের পরিবর্তন < 0

বাক্স 6.1: পূর্বে আলোচিত লেনদেন উদ্বৃত্তের হিসেবে লেনদেনগুলোকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে — চলতি খাত ও মূলধনী খাত। আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার বা আই এম এফ লেনদেন উদ্বৃত্তের ক্ষেত্রে নতুন হিসেব পদ্ধতি চালু করে। আই এম এফ-এর প্রতিবেদন ব্যালেন্স অব পেমেন্টস অ্যাণ্ড ইন্টার ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট পজিশান ম্যানুয়ালের ষষ্ঠ সংস্করণে (BPM6) এই নতুন হিসেব পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়। এর সাথে সঙ্গতি রেখে আরবিআই ব্যালেন্স অব পেমেন্টের হিসাব-রক্ষার ক্ষেত্রে গঠনগত পরিবর্তন আনে। নতুন শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে লেনদেনসমূহকে তিনটি খাতে ভাগ করা হয়েছে। এই খাতগুলো হল চলতি খাত, আর্থিক খাত ও মূলধনী খাত। এক্ষেত্রে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে পরিবর্তনটি হয়েছে তা হল, আর্থিক সম্পদের বাণিজ্যের, যেমন, বণ্ড, ইকুইটি শেয়ারের লেনদেন, প্রায় সবগুলো লেনদেনই এখন থেকে আর্থিক খাতে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। যদিও আরবিআই লেনদেন উদ্বৃত্তের যে তথ্য প্রকাশ করে সেখানে পুরানো পদ্ধতিতেই হিসেব কষা হয়। এই কারণে নতুন পদ্ধতির বিস্তৃত আলোচনা এখানে করা হয়নি। বিস্তারিতভাবে নতুন পদ্ধতিটি আলোচনা করা হয়েছে 2010-এর সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত আর বি আই-এর ব্যালেন্স অব পেমেন্ট ম্যানুয়াল ফর ইণ্ডিয়াতে।

সারণি 6.1: ভারতে লেনদেন উদ্বৃত্ত (মার্কিন মিলিয়ন ডলারে)

নং.	বিষয়	মার্কিন ডলার (মিলিয়নে)
1.	রপ্তানি (শুধুমাত্র দ্রব্যের জন্য)	150
2.	আমদানি (শুধুমাত্র দ্রব্যের জন্য)	240
3.	বাণিজ্য উদ্বৃত্ত [2 – 1]	–90
4.	(নিট) অদৃশ্যসমূহ [4a + 4b + 4c]	52
	a. অ-উপকরণ সেবা	30
	b. আয়	–10
	c. হস্তান্তর	32
5.	চলতি খাতে ভারসাম্য [3+ 4]	–38
6.	মূলধন খাতে ভারসাম্য [6a + 6b + 6c + 6d + 6e + 6f]	41.15
	a. বহির্দেশীয় সহায়তা (নিট)	0.15
	b. বর্হিদেশীয় বাণিজ্যিক ধার (নিট)	2
	c. স্বল্পকালীন ঋণ	10
	d. ব্যাংকিং মূলধন (নিট) যার মধ্যে	15
	অনাবাসিক আমানত (নিট)	9
	e. বিদেশী বিনিয়োগ (নিট) যার মধ্যে [6eA + 6eB]	19
	A. এফ ডি আই (নিট)	13

	B. পোর্টফেলিও (নিট)	6
	f. অন্যান্য অর্থপ্রবাহ (নিট)	–5
7.	ত্রুটি ও বিচ্যুতি	3.15
8.	সার্বিক ভারসাম্য [5 + 6 + 7]	0
9.	সঞ্চয়ের পরিবর্তন	0

6.2 বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বাজার

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক লেনদেনের হিসাব পদ্ধতি নিয়ে বিবেচনা করেছি। আমরা এখন কোনো একজন ব্যক্তির লেনদেনকে বিবেচনায় আনব। আমরা ধরে নিই যে, একজন ভারতীয় বাসিন্দা ছুটির সময় লণ্ডনে যেতে চাইছেন (পর্যটন সেবার আমদানি)। তাকে সেখানে অবস্থানের জন্য পাউণ্ডে দাম মিটাতে হবে। তাকে জানতে হবে কোথা থেকে পাউণ্ড সংগ্রহ করতে হয় এবং কি দামে তা পাওয়া যাবে। এই অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই দামকে বলা হয় মুদ্রার বিনিময় হার। যে বাজারে জাতীয় মুদ্রার কেনাবেচা হয় তাকে **বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের বাজার** বলে।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বাজারের প্রধান অংশগ্রহণকারী হল বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের ডিলার, অন্যান্য অনুমোদন প্রাপ্ত ডিলার এবং আর্থিক কর্তৃপক্ষসমূহ। এটি গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বাজারে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ক্রয়-বিক্রয়ের কেন্দ্র রয়েছে। এই বাজারটির মধ্যে নিবিড় ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ থাকে এবং বাজারে কর্মরত সংস্থাগুলো একসাথে একাধিক বাজারে কারবার চালায়।

6.2.1 বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার (যাকে ফোরেক্স হারও বলা হয়) হল অন্য কোনো দেশের মুদ্রার নিরিখে কোনো একটি দেশের মুদ্রার দাম। বিনিময় হার বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যয় ও দামের তুলনা করতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমাদের 1 ডলারের জন্য 50 টাকা দিতে হয় তবে বিনিময় হার হবে 50 টাকা প্রতি ডলার।

বিষয়টিকে আরো সহজ করে বোঝানোর জন্য চলো আমরা ধরে নিই, ভারত ও আমেরিকা এই দুইটি দেশই বিশ্বে বর্তমান। তাই কেবলমাত্র একটি বিনিময় হার নির্ধারণ করার প্রয়োজন হবে।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের চাহিদা

মানুষের কাছে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদার কারণগুলো হল তারা অন্য দেশগুলো থেকে দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে চায়, তারা বিদেশে উপহার পাঠাতে চায় এবং কোনো একটি নির্দিষ্ট দেশের আর্থিক সম্পত্তি ক্রয় করতে চায়।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের দাম বাড়লে বিদেশের দ্রব্য ক্রয়ের খরচাও বাড়বে (ভারতীয় টাকায়)। এর ফলে আমদানির চাহিদা হ্রাস পাবে এবং ফলস্বরূপ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের চাহিদাও হ্রাস পাবে, যখন অন্য বিষয়গুলো স্থির থাকবে।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের যোগান

নিম্নলিখিত কারণে একটি দেশে বৈদেশিক মুদ্রার আগমন ঘটে। এগুলো হল - একটি দেশের রপ্তানির অর্থ হল, বিদেশীরা দেশটির অন্ত:দেশীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে যার মধ্য দিয়ে দেশটিতে বৈদেশিক মুদ্রার যোগান হয়। বিদেশীরা উপহার পাঠালে এবং হস্তান্তর করলে এবং দেশের সম্পদ বিদেশীরা ক্রয় করলেও বৈদেশিক মুদ্রার যোগান বাড়ে।

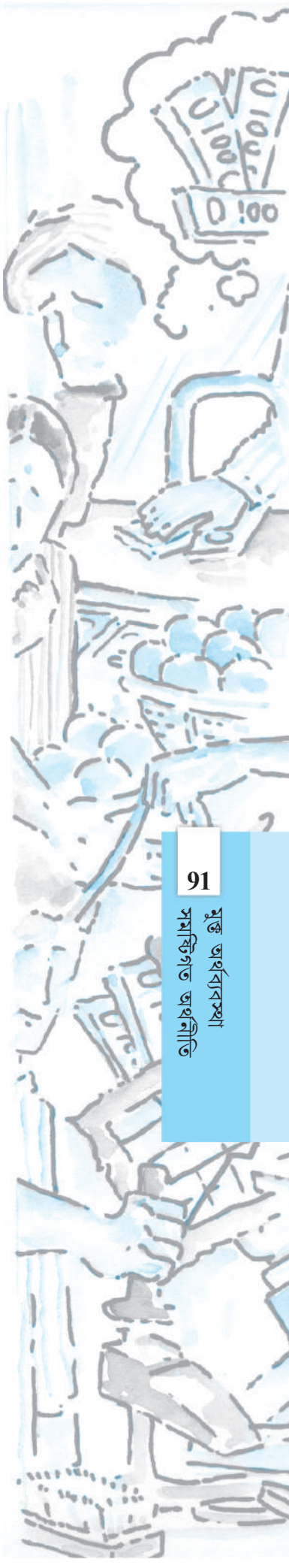

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় - দাম বাড়লে বিদেশীদের ভারতীয় দ্রব্য ক্রয় বাবদ খরচ (আমেরিকার ডলারের সাপেক্ষে) হ্রাস পায়, যখন অন্য বিষয়সমূহ অপরিবর্তিত থাকে। এই ঘটনা ভারতীয় পণ্যের রপ্তানি বাড়াবে এবং পরিণতিতে বৈদেশিক মুদ্রার যোগান বাড়বে (যদিও বিষয়টি নির্ভর করে অনেকগুলো উপাদানের উপর। বিশেষ করে নির্ভর করে রপ্তানি ও আমদানির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর)।

6.2.2 বিনিময় হার নির্ধারণ

অর্থের বিনিময় হার নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতি চালু রয়েছে। এইটি নমনীয় বাজার নির্ভর বিনিময় হার, স্থির বিনিময় হার অথবা ব্যবস্থাধীন বাজার নির্ভর বিনিময় হার হতে পারে।

নমনীয় বিনিময় হার

এই বিনিময় হার বাজারের চাহিদা ও যোগানের শক্তি দ্বারা নির্ধারিত হয়। একে ***ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেইট*** বা ***বাজার নির্ভর বিনিময় হারও*** বলা হয়। চিত্র 6.1-এ দেখানো হয়েছে যে চাহিদা রেখা যেখানে যোগান রেখাকে ছেদ করেছে সেখানেই বিনিময় হার নির্ধারিত হয়েছে। অর্থাৎ y-অক্ষের উপর e বিন্দুতে। x -অক্ষের q বিন্দু মার্কিন ডলারের পরিমাণ স্থির করে যা e বিনিময় হারে চাহিদা ও যোগান নির্দেশ করে। সম্পূর্ণ নমনীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক বিনিময় বাজারে হস্তক্ষেপ করে না।

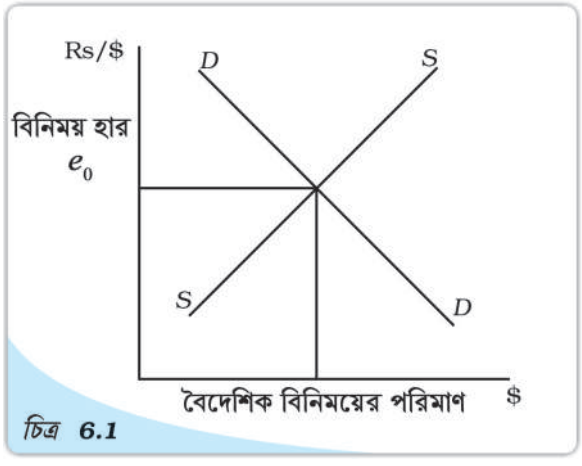

নমনীয় বিনিময় হারে ভারসাম্য

ধরো, বিদেশী দ্রব্য ও সেবার চাহিদা বাড়ছে (উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ভারতীয়দের বহির্বিশ্বে ভ্রমণের ঘটনা বাড়ার কারণে) তখন চিত্র 6.2-এর ন্যায় চাহিদা রেখাটি মূল চাহিদা রেখার উপরের দিকে ও ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়। বৈদেশিক দ্রব্য ও সেবার চাহিদার বৃদ্ধি হলে বিনিময় হারের পরিবর্তন হয়। এখানে প্রাথমিক বিনিময় হার $e_0 = 50$, বোঝায় যে আমাদের 1 ডলারের জন্য 50 টাকা দিতে হবে। নতুন ভারসাম্যে, বিনিময় হার হবে, $e_1 = 70$, যার মানে হল আমাদেরকে 1 ডলারের জন্য এখন আরো বেশি টাকা দিতে হবে (অর্থাৎ দিতে হবে 70 টাকা)। এই অবস্থা নির্দেশ করে যে, ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য কমেছে এবং টাকার তুলনায় ডলারের মূল্য বেড়েছে। বিনিময় হারের বৃদ্ধির অর্থ হল, দেশীয় মুদ্রার (টাকার) সাপেক্ষে বৈদেশিক মুদ্রার (ডলার) দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। এটাকে বিদেশী মুদ্রার (ডলার) সাপেক্ষে দেশীয় মুদ্রার (টাকা) মূল্য হ্রাস বোঝায়। একে বৈদেশিক মুদ্রার (ডলারের) তুলনায় দেশীয় মুদ্রার (টাকার) ক্রয় শক্তি হ্রাস বা **অবচয়** বা **ডেপ্রিসিয়েশন** বলে।

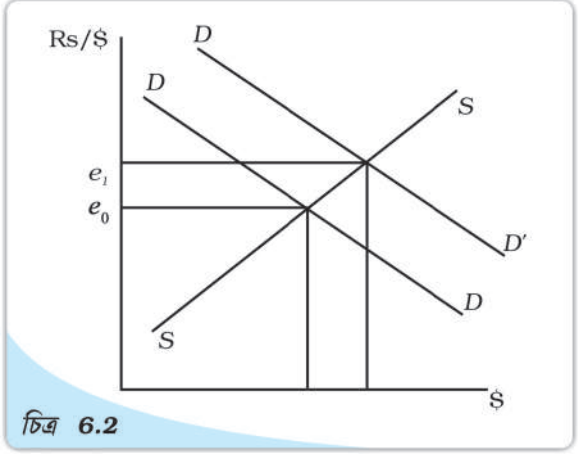

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বাজারে আমদানির চাহিদা বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া

অনুরূপভাবে, নমনীয় মুদ্রা বিনিময় হারের অধীনে যখন দেশীয় মুদ্রার (টাকার) দাম বৈদেশিক মুদ্রার (ডলারের) তুলনায় বৃদ্ধি পায় তখন তাকে দেশীয় মুদ্রার ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি বা **উপচয়** বা **এপ্রিসিয়েশন** বলেন। এর অর্থ

হল, ডলারের তুলনায় টাকার দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের এক ডলারের বিনিময়ের সময় কম টাকা দিতে হবে।

ফাঁটকা কারবার

প্রতিটি দেশের ক্ষেত্রেই অর্থ হল সম্পদ। যদি ভারতবাসীর মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, টাকার তুলনায় ব্রিটিশ পাউন্ডের মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে তাহলে ভারতবাসী চাইবে হাতে পাউন্ড রেখে দিতে। এর প্রভাব মুদ্রা বিনিময় হারেও পড়বে। এখানে মানুষ এই প্রত্যাশায় হাতে বিদেশী মুদ্রা রেখে দেবে যে, বিদেশী মুদ্রার এপ্রিসিয়েশন হবে বা ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং এই কারণে তারা লাভবান হবে। এই প্রত্যাশার পরিণতিতে মুদ্রা বিনিময় হারে পরিবর্তন ঘটতে পারে। নিম্নে দেখানো হয়েছে কীভাবে এই পরিবর্তন ঘটতে পারে। যদি চালু বিনিময় হারে 1 পাউন্ডের দাম 80 টাকা হয় এবং বিনিয়োগকারীরা বিশ্বাস করে যে, মাসের শেষে পাউন্ডের দাম চড়ে 85 টাকা হবে। এই অবস্থায় বিনিয়োগকারী চিন্তা করবে যে, ডিলারদের কাছ থেকে 80,000 টাকা দিয়ে 1000 পাউন্ড ক্রয় করলে মাসের শেষে এই 1000 পাউন্ডের বিনিময় করে 85,000 টাকা পেতে পারেন। এর ফলে 5000 টাকা মুনাফা হবে। এই প্রত্যাশা পাউন্ডের চাহিদা বৃদ্ধি করবে এবং টাকা-পাউন্ডের বিনিময় হার বৃদ্ধি করবে। এভাবে বিশ্বাস সত্যে পরিণত হবে।

সুদের হার এবং মুদ্রা বিনিময় হার

স্বল্পকালে, মুদ্রা বিনিময় হারের উঠানামা নির্ধারণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পৃথকীকৃত সুদের হার। পৃথকীকৃত সুদের হার হল দেশগুলোর মধ্যে সুদের হারের মধ্যে পার্থক্য। ব্যাংক, বহুজাতিক সংস্থা ও বিত্তবান ব্যক্তিদের নিজস্ব বিশাল সম্পদের ভাণ্ডার রয়েছে। সর্বোচ্চ সুদের হারের খোঁজে সম্পদ মালিকেরা পৃথিবীব্যাপী হদিশ চালায়। যদি আমরা ধরে নিই, A দেশটি সরকারি বণ্ডে 8 শতাংশ হারে সুদ দেয়। অপর দেশ, B, অনুরূপ নিরাপদ বণ্ডে 10 শতাংশ সুদ প্রদান করে। এখানে দুইটি দেশের মধ্যে পৃথকীকৃত সুদের হার হবে 2 শতাংশ। এই প্রেক্ষাপটে, A দেশের বিনিয়োগকারীরা B দেশটির সুদের হারে আকৃষ্ট হবে, নিজ দেশের মুদ্রা বিক্রয় করে, B দেশের মুদ্রা ক্রয় করবে। এই সময়ে B দেশের বিনিয়োগকারীদের কাছে নিজ দেশে বিনিয়োগ অধিক আকর্ষনীয় হয়ে উঠায় তারা এখানেই বিনিয়োগের জায়গা খোঁজবে। তখন A দেশের মুদ্রা চাহিদাহীন মুদ্রায় পরিণত হবে। এর মর্মার্থ হল, A দেশের মুদ্রার চাহিদা রেখার বামদিকে স্থানান্তর ঘটবে এবং যোগান রেখার স্থানান্তর হবে ডানদিকে। এই স্থানান্তরের কারণে A দেশের মুদ্রার ডিপ্রিসিয়েশন হবে এবং B দেশের মুদ্রার এপ্রিসিয়েশন হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, দেশে সুদের হার বাড়লে তা দেশীয় মুদ্রার এপ্রিসিয়েশন ঘটায়। এখানে অন্তর্নিহিত অনুমানটি হল, বিদেশের সরকারগুলো যে বণ্ড ছাড়ে সেগুলো ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনো বাধানিষেধ নেই।

আয় এবং মুদ্রা বিনিময় হার

যখন আয় বাড়ে তখন ভোক্তার খরচ বাড়ে। আমদানি করা দ্রব্যাদি বাবদ ব্যয়ও সম্ভবত বৃদ্ধি পায়। আমদানি বৃদ্ধি পেলে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়। দেশীয় মুদ্রার ডিপ্রিসিয়েশন হয়। একই সাথে বিদেশীদের আয় বাড়লে দেশীয় পণ্য দ্রব্যের রপ্তানি বাড়বে এবং বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের যোগান রেখা বাহিরের দিকে স্থানান্তরিত হবে। ভারসাম্য অবস্থায় দেশীয় মুদ্রার ডিপ্রিসিয়েশন হতেও পারে অথবা নাও হতে পারে। আমদানির চাইতে রপ্তানি বৃদ্ধির গতির দ্রুততার উপর নির্ভর করবে কোনটা হবে। সাধারণত, অন্যান্য বিষয়গুলো সম অবস্থায় থাকলে, একটি দেশের যার সম্মিলিত চাহিদা অবশিষ্ট বিশ্বের দেশসমূহ থেকে দ্রুততর গতিতে বাড়লে, স্বাভাবিক অবস্থায়, দেখা যায় দেশটির মুদ্রার ডিপ্রিসিয়েশন হচ্ছে। এর পেছনের কারণ হল, দেশটির রপ্তানির চাইতে আমদানি দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশটির বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের চাহিদা রেখা স্থানান্তরিত হয় যোগান রেখা অপেক্ষা দ্রুত হারে।

দীর্ঘকালীন মুদ্রা বিনিময় হার

নমনীয় মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থায় বিনিময় হার সম্পর্কে দীর্ঘকালীন পূর্বানুমান করার জন্য ক্রয়ক্ষমতার সমতা তত্ত্ব ব্যবহার করা হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে যতক্ষণ পর্যন্ত না বৈদেশিক বাণিজ্যে বাঁধা যেমন বাণিজ্যে আরোপিত শুল্ক কর এবং কোটা (আমদানির উপর পরিমাণগত সীমা) থাকে না তখন বিনিময় হার এভাবে নির্ধারিত হয় যাতে

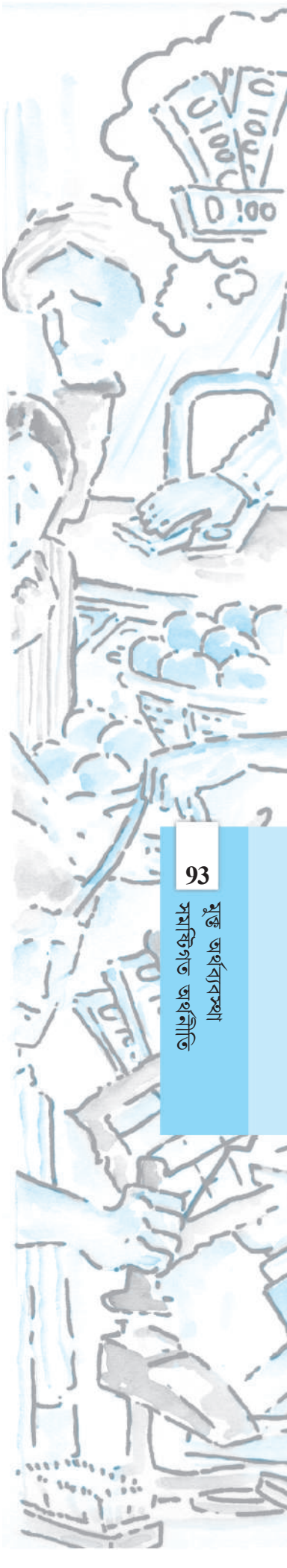

একক পণ্যের খরচ দুইটি দেশেই একই থাকে। যেখানে পণ্যের দাম ভারতের রূপী অথবা মার্কিন ডলার, জাপানের ইয়েন এবং যে-কোনো দেশের মুদ্রাতেই পরিমাপ করা যেতে পারে, কেবলমাত্র পণ্য পরিবহন বাবদ খরচকে বাদ দিতে হবে। সুতরাং, দীর্ঘকালে দুইটি দেশের মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হার পরিবর্তিত হয় যদি দুইটি দেশের আপেক্ষিক দামস্তরে পরিবর্তন আসে।

উদাহরণ 6.1

যদি একটি শার্টের দাম আমেরিকায় 8 ডলার হয় এবং ভারতে 400 টাকা হয় তবে রূপি-ডলার বিনিময় হার 50 টাকা হবে। কেন এই বিনিময় হার হবে তা দেখতে, 50 টাকার বেশি যে-কোনো হারে, ধরি 60 টাকা হারে, শার্টটির দাম আমেরিকাতে হবে 480 টাকা কিন্তু ভারতে দাম হবে মাত্র 400 টাকা। এই অবস্থায় সকল বিদেশী ক্রেতারা ভারত হতে শার্ট কিনবে। অনুরূপভাবে, প্রতি ডলার 50 টাকার কম যে-কোনো বিনিময় হারে শার্টের সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য আমেরিকার কাছে চলে যাবে। এরপরে, আমরা ধরে নিই যে, ভারতে দাম 20 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যেখানে আমেরিকায় 50 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন প্রতিটি ভারতীয় শার্টের দাম পড়বে 480 টাকা যেখানে আমেরিকান শার্টের দাম হবে 12 ইউ এস ডলার। এই দুই দামই হবে সমমূল্যের। অর্থাৎ, 12 ইউ এস ডলার হবে 480 টাকার মূল্যের সমান অথবা এক ডলারের মূল্য হবে 40 টাকা। এখানে ডলারের ডিপ্রিসিয়েশন হয়েছে।

স্থির মুদ্রা বিনিময় হার

এই মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থায় সরকার একটি সুনির্দিষ্ট স্তরে বিনিময় হার নির্ধারণ করে। চিত্র 6.3-এ বাজার নির্ধারিত বিনিময় হার হল e বিন্দু। তথাপি চলো আমরা ধরে নিই যে, কোনো কারণে ভারত সরকার রপ্তানি বৃদ্ধিতে উৎসাহ যোগাতে চাইছে, যার জন্য বিদেশীদের কাছে ভারতীয় টাকাকে আরো সস্তা করে তুলতে সরকার উচ্চতর মুদ্রা বিনিময় হার স্থির করবে। ধরা যাক, সরকার প্রতি ডলারের দাম, এখনকার 50 টাকা থেকে বাড়িয়ে 70 টাকা করল। এখন সরকার দ্বারা স্থির করা নতুন বিনিময় হার হবে e_1। এখানে $e_1 > e$। এই বিনিময় হারে ডলারের যোগান ডলারের চাহিদাকে ছাপিয়ে যাবে। চাহিদা ও যোগানের এই অমিল দূর করতে আর বি আই বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বাজারে হস্তক্ষেপ করবে এবং ডলার ক্রয় করবে। এভাবে আর বি আই ডলারের অতিরিক্ত যোগান শুষে নেবে। চিত্রে AB রেখা ডলারের অতিরিক্ত যোগানকে নির্দেশ করছে। সুতরাং, বাজারে হস্তক্ষেপ করে সরকার অর্থনীতিতে যে-কোনো মুদ্রা বিনিময়ের হারকে অক্ষুন্ন রাখতে পারে। কিন্তু এই সরকারি হস্তক্ষেপ প্রক্রিয়া চলতে থাকলে সরকারের কোষাগারে বেশি বেশি করে বৈদেশিক মুদ্রা জমা হতে থাকবে। অপরদিকে, সরকার যদি e_2 স্তরে মুদ্রা বিনিময় হার স্থির করে তাহলে বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে ডলারের বাড়তি চাহিদা দেখা দেবে। ডলারের এই বাড়তি চাহিদাকে মোকাবেলা করতে সরকারকে পূর্বের জমা রাখা ডলারের ভাণ্ডার থেকে ডলার প্রত্যাহার করতে হবে। সরকার যদি এই কাজ করে উঠতে না পারে তাহলে ডলারের জন্য কালোবাজারী কারবারের উদ্ভব হবে।

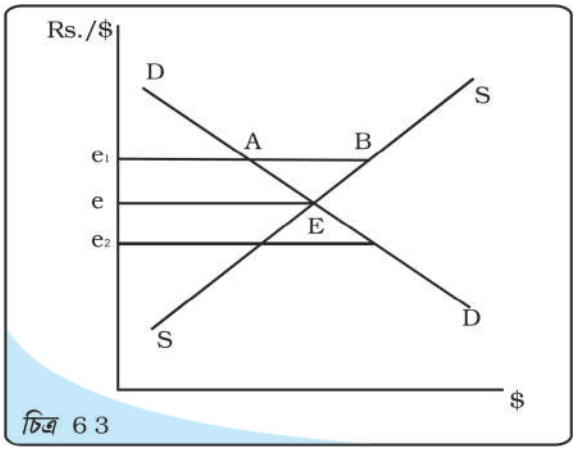

চিত্র 6 3

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় বাজারে স্থির বিনিময় হার

স্থির বিনিময় হার ব্যবস্থায়, যখন সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থায় বিনিময় হার বৃদ্ধি পায় (ফলস্বরূপ দেশীয় মুদ্রা সস্তা হয়) তখন তাকে বলা হয় **অবমূল্যায়ণ** বা **ডিভ্যালুয়েশন**। অপরদিকে **পুণর্মূল্যায়ণ** বা **রিভ্যালুয়েশন** ঘটবে যখন সরকার স্থির বিনিময় হার ব্যবস্থায় বিনিময় হার হ্রাস করে (ফলস্বরূপ দেশীয় মুদ্রার মূল্য আরো মহার্ঘ হয়)।

6.2.3 নমনীয় এবং স্থির মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থার সুফল ও কুফল

স্থির মুদ্রা বিনিময় হারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, সরকারকে এই বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে হবে যে, বিনিময়ের সুনির্দিষ্ট হার বজায় রাখতে সরকার সক্ষম হবে। প্রায়শই স্থির মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থায় বিওপি-তে ঘাটতি দেখা দেয়। এই সময় সরকারকে তার সঞ্চিত সম্পদ ব্যবহার করে এই ঘাটতি দূর করতে হস্তক্ষেপ করতে হয়। যদি জনসাধারণ জানে যে, সরকারি সম্পদের মজুত অপর্যাপ্ত তাহলে তারা বিনিময় হারে স্থিরতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সরকারের সামর্থ্য নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়ে। এর প্রভাবে মুদ্রার অবমূল্যায়ণ হতে পারে বলে আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। এরূপ আশঙ্কার জন্য মুদ্রার আগ্রাসী ক্রয় শুরু হয়, তখন সরকার বাধ্য হয় মুদ্রার অবমূল্যায়ণ করতে। তখন এই ঘটনাকে মুদ্রার উপর ফাটকা আক্রমণ হিসেবে অবিহিত করা হয়। স্থির বিনিময় হারে মুদ্রার উপর এই ধরনের আক্রমনের সম্ভাবনা বেশি হয়। ব্রেটন উড্‌স ব্যবস্থার ভেঙ্গে পড়ার পূর্বেও এই ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।

নমনীয় বিনিময় হার ব্যবস্থা সরকারকে আরো নমনীয় করে তুলে এবং এক্ষেত্রে সরকারকে বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডার স্ফীত করার প্রয়োজন পড়ে না। নমনীয় বিনিময় হারের বড়ো সুবিধা হল যে, বিনিময় হারের পরিবর্তন BoP-র উদ্বৃত্ত বা ঘাটতিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামাল দেয়। এছাড়াও দেশগুলো অধিক স্বাধীনতা পায় নিজেদের আর্থিক নীতি রূপায়ণে। এখানে দেশগুলোকে বিনিময় হার নির্ধারণে হস্তক্ষেপ করতে হয় না। কারণ বাজারই স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিনিময় হার নির্ধারণ করে।

6.2.4 নিয়ন্ত্রণাধীন পরিবর্তনীয় ব্যবস্থা

কোনো বৈধ আন্তর্জাতিক চুক্তি ছাড়াই বিশ্বে এক উত্তম বিনিময় প্রণালীর উদয় হয়েছে যা নিয়ন্ত্রণাধীন পরিবর্তনীয় বিনিময় হার ব্যবস্থা নামে পরিচিত। এটি নমনীয় বিনিময় হার ব্যবস্থা (নিয়ন্ত্রিত অংশটি) এবং স্থির বিনিময় হার ব্যবস্থার (প্রবাহিত অংশটি) সংমিশ্রণ। ন্যক্কারজনক ভাসমানতা (**dirty floating**) নামক এই ব্যবস্থাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিনিময় হারকে সহনীয় করার জন্য যে-কোনো সময়ে বিদেশী মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করে হস্তক্ষেপ করতে পারে। সুতরাং, সরকারি রিজার্ভের লেনদেন এই কারণে কখনো শূন্যের সমান হয় না।

বক্স 6.2 বিনিময় হার নিরূপণ : আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা

স্বর্ণমান : 1870 থেকে 1914 সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনাপর্ব পর্যন্ত সময়ে স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল এবং স্বর্ণ মানই ছিল স্থির বিনিময় হার ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। সে সময় সব ধরনের মুদ্রাই নির্ধারিত হত স্বর্ণমানের ভিত্তিতে। এর মধ্যে কিছু কিছু মুদ্রা স্বর্ণ দ্বারা তৈরি হত। স্বর্ণ মানে ব্যবহারকারী প্রত্যেকটি দেশই তাদের মুদ্রার স্থির দামে স্বাধীনভাবে স্বর্ণ মানে রূপান্তরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকত। এর অর্থ দাঁড়াল, একটি দেশের নাগরিকের হাতে থাকা দেশীয় মুদ্রা যা নির্দিষ্ট বিনিময় মূল্যের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য অন্য সম্পদে (স্বর্ণে) রূপান্তর করা যায়। এর ফলে, প্রত্যেক মুদ্রারই নির্দিষ্ট দামে অন্য মুদ্রায় রূপান্তর সম্ভব হত। কোনো মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারিত হত স্বর্ণের মূল্যের মাপকাঠিতে (যেখানে মুদ্রা স্বর্ণ দ্বারা তৈরি হত সেখানে মুদ্রায় উপস্থিত প্রকৃত পরিমাণ স্বর্ণের ভিত্তিতে)। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক, এক একক মুদ্রা A-এর মূল্য হল এক গ্রাম স্বর্ণের মূল্য এবং B মুদ্রার এক এককের মূল্য দুই গ্রাম স্বর্ণের মূল্যের সমান। অর্থাৎ, মুদ্রা B হল মুদ্রা A অপেক্ষা দ্বিগুণ মূল্যের। এখন অর্থনৈতিক এজেন্টসমূহ এক একক মুদ্রা B কে সরাসরি দুই একক মুদ্রা A তে রূপান্তর করতে পারবে। এক্ষেত্রে মুদ্রার রূপান্তরে প্রথমে স্বর্ণ কিনে পরে তা বিক্রি করার প্রয়োজন হবে না। এখানে বিনিময় হার একটি ঊর্ধ্ব ও নিম্ন সীমার মধ্যে উঠানামা করতে পারে। এই সীমা দুটি নির্ধারিত হত দুইটি মুদ্রার[3] গলানোর, জাহাজ পরিবহন ও মুদ্রায় রূপদানের খরচের ভিত্তিতে। প্রত্যেক দেশের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সমতা বজায় রাখতে প্রয়োজন হত পর্যাপ্ত স্বর্ণের সঞ্চয় ভাণ্ডারের। স্বর্ণ মানে প্রত্যেক দেশের ছিল স্থিতিশীল বিনিময় হার।

তখন যে প্রশ্নটা উঠে এসেছিল — একটি দেশ কি তার স্বর্ণের সকল মজুত হারিয়ে ফেলবে না যদি না দেশটি বেশি পরিমাণে আমদানি করে (এবং বিওপি-র ঘাটতিও রয়েছে)? এর উত্তরে বাণিজ্যবাদীদের[4] বক্তব্য ছিল, যদি না রাষ্ট্র রপ্তানিতে শুল্ক অথবা কোটা অথবা ভরতুকি আরোপের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করত তাহলে একটি দেশ সকল স্বর্ণ হারাত এবং দেশটি খুবই সঙ্গীন অবস্থার মুখোমুখি হত। প্রখ্যাত দার্শনিক ডেভিড

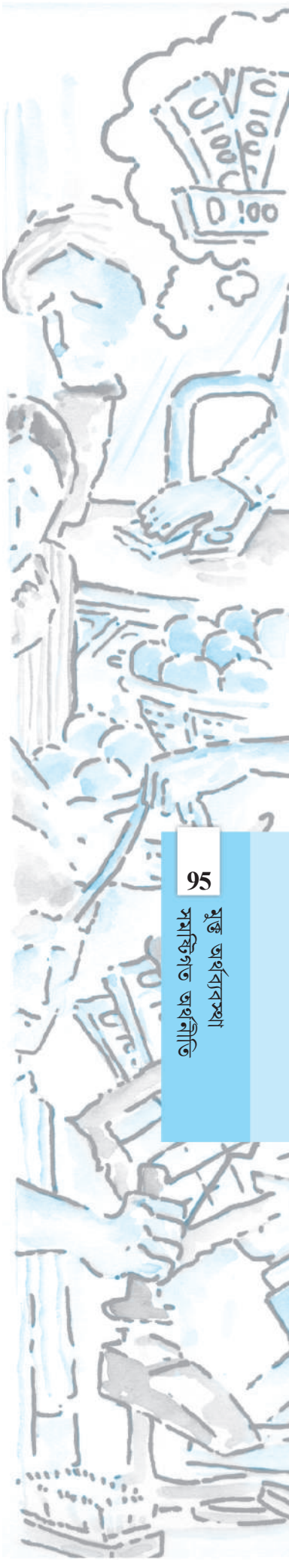

হিউম 1752 সালে এক প্রবন্ধে এই যুক্তি খণ্ডন করেন এবং দেখিয়েছিলেন যে, যদি স্বর্ণের সঞ্চয় কমে যায় তাহলে সকল দাম ও খরচ আনুপাতিক হারে কমতে শুরু করবে এবং এর পরিণতিতে দেশের কোনো মানুষেরই অবস্থা খারাপ হবে না। একসাথে দেশে পণ্য সামগ্রীর দাম কম হওয়ায় আমদানি কমবে এবং রপ্তানি বাড়বে (এটিই হবে প্রকৃত মুদ্রা বিনিময় হার যা প্রতিযোগিতায় দক্ষতা বাড়াবে)। যে দেশটি থেকে আমরা আমদানি করছিলাম এবং আমদানি বাবদ দেনা স্বর্ণের মাধ্যমে প্রদান করছিলাম সে দেশটিতে দাম ও খরচ উভয়েই বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং, এই সময় দেশটিতে ব্যয়বহুল রপ্তানি কমবে এবং প্রথম দেশটি থেকে তাদের সস্তা দ্রব্যের আমদানি বাড়বে। প্রাইস স্পীসী-ফ্লো বা দাম-মূল্যবান ধাতু প্রবাহ (অষ্টাদশ শতাব্দীতে মূল্যবান ধাতুকে 'স্পীসী' বলা হতো) প্রক্রিয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবে যে দেশ স্বর্ণ হারাচ্ছে তার বিওপি-র উন্নতি হয় এবং অনুকূল বাণিজ্য ভারসাম্যযুক্ত দেশের হাল খারাপ হতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারসাম্য আপেক্ষিক দামে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় যা আমদানি ও রপ্তানিতে ভারসাম্য নিয়ে আসে, পুনরায় নিট স্বর্ণের প্রবাহ না ঘটিয়ে। ভারসাম্য স্থায়ী এবং স্ব-সংশোধনযোগ্য হয়। এরজন্য কোনো ট্যারিফ এবং সরকারি ব্যবস্থা গ্রহনের প্রয়োজন হয় না। এইভাবে স্থির বিনিময় হারগুলো অক্ষুণ্ণ থাকত স্বয়ংক্রিয় ভারসাম্যকারী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

বিভিন্ন সংকটের কারণে স্বর্ণমান পর্যায়ক্রমে ভেঙ্গে পড়ত। উপরন্তু বিশ্বে স্বর্ণের দামস্তর নতুন স্বর্ণের ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়ার উপর নির্ভর করত। এটি অপরিণত অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব (crude Quantity Theory of Money) দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এই তত্ত্বের, $M = kPY$ ধারণা অনুসারে, যদি উৎপাদন (জিএনপি) বার্ষিক 4% হারে বৃদ্ধি পায় তবে দামস্তরের স্থিরতা রক্ষা করতে স্বর্ণের যোগানও বার্ষিক 4% হারে বৃদ্ধি করতে হবে। কিন্তু খনি থেকে সেই হারে স্বর্ণ উত্তোলন করা সম্ভব না হওয়ায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সারা বিশ্বে দামস্তর পড়তে থাকে যার দরুণ সামাজিক অস্থিরতা বেড়ে গিয়েছিল। একটি সময়কালের জন্য, স্বর্ণের বিকল্প হিসাবে রূপার ব্যবহার শুরু হয়েছিল। এটাকে দ্বিধাতুমান বা বাইমেটেললিসম বলা হয়। এছাড়াও, **ভগ্নাংশিক রিজার্ভ ব্যাংকিং** স্বর্ণ সাশ্রয়ে সহায়তা করেছিল। কাগজী মুদ্রামূল্য পুরোপুরি সোনার ভিত্তিতে নির্ধারণ না হওয়াতে; প্রতিনিধিত্বকারী দেশগুলো তাদের কাগজী মুদ্রার বিপরীতে এক চতুর্থাংশ স্বর্ণ হিসাবে জমা রাখত। স্বর্ণ সাশ্রয়ের আরেকটি পদ্ধতি হল **'স্বর্ণ বিনিময় মান'**, যা অনেক দেশ গ্রহণ করেছিল। এই পদ্ধতিতে স্থির দামের অর্থের বিনিময়ে স্বর্ণ গচ্ছিত রাখা হলেও কম স্বর্ণ রাখা হত বা কোনো স্বর্ণ রাখা হত না। সেইসব দেশ স্বর্ণের পরিবর্তে, কিছু বড়ো দেশের মুদ্রা (ইউ এস এ, ইউ কে) নিজের কাছে রাখত যা স্বর্ণ মানের মতোই কাজ করত। এই সকল বিষয়সমূহ এবং ক্লোনডিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকাতে স্বর্ণের আবিষ্কার সার্বিক সংকোচনকে বা ডিফ্লেশনকে 1929 সাল পর্যন্ত দূরে রাখতে পেরেছিল। অর্থনীতির ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেন এমন কয়েকজনের মতে, তারল্যের এই ঘাটতিই মহামন্দাকে ইন্ধন জুগিয়েছিল। 1914 থেকে 1945 সাল পর্যন্ত সময়কালে মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থাকে চালিয়ে নেওয়ার মতো কোনো সার্বজনীন পদ্ধতি ছিল না। কিন্তু এই সময়কালে একদিকে যেমন স্বর্ণমানে স্বল্পকালীন প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল এবং নমনীয় বিনিময় হার ব্যবস্থাও একটি সময়কালের জন্য দেখা গিয়েছিল।

ব্রেটন উড্‌স ব্যবস্থা : 1944 সালে ব্রেটন উড্‌স সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আই এম এফ) এবং বিশ্বব্যাঙ্ক গঠন করা হয় এবং স্থির বিনিময় হারের একটি ব্যবস্থার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই ব্যবস্থাটি জাতীয় মুদ্রার রূপান্তরে সম্পদের পছন্দের দিক থেকে আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান থেকে ভিন্নধর্মী ছিল। এখানে দ্বিস্তরীয় ব্যবস্থায় মুদ্রার রূপান্তর হত যার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ডলার। আমেরিকার আর্থিক কর্তৃপক্ষ অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল প্রতি আউন্স স্বর্ণকে 35 ডলার স্থির দামে রূপান্তরের। এই অবস্থায় দ্বিতীয় স্তরটি ছিল ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি আই এম এফ সদস্যের আর্থিক কর্তৃপক্ষের অঙ্গীকার যে দেশসমূহের মুদ্রা স্থির দামে ডলারে রূপান্তর করা যাবে। এই দ্বিতীয় স্তরটিকে বলা হত সরকারি বিনিময় হার। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যদি ফ্রান্সের মুদ্রা ফ্রাঙ্ককে ডলারে রূপান্তর করা হত তাহলে ডলার পিছু 5

[3]যদি বিনিময় হারের পার্থক্য লেনদেনের খরচ অপেক্ষা বেশি হয়, তাহলে সালিসির মাধ্যমে মুনাফা স্থির হতে পারে, তখন মুদ্রা কেনার প্রক্রিয়া সস্তা হবে এবং মুদ্রা বিক্রয় ব্যয়বহুল হবে।

[4]বাণিজ্যবাদী চিন্তাধারা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপের জাতি রাষ্ট্র (nation-state) উন্মেষের সাথে সম্পৃক্ত ছিল।

ফ্রাঙ্কে বিনিময় হত এবং তখন ডলার বিনিময় করা যেত প্রতি আউন্স স্বর্ণ সমান 35 ডলার হারে, যার মাধ্যমে ফ্রাঙ্ক ও স্বর্ণের বিনিময় হার নির্ধারিত হত এক আউন্স স্বর্ণ সমান 175 ফ্রাঙ্ক (এখানে, 1 ডলার = 5 ফ্রাঙ্ক। সুতরাং, 35 ডলার সমান 175 ফ্রাঙ্ক)। এই সম্পর্ক থেকে প্রতি আউন্স স্বর্ণের দাম হল 175 ফ্রাঙ্ক)। বিনিময় হারের পরিবর্তন কেবলমাত্র তখনই অনুমোদনযোগ্য হত যখন দেশটির বিওপি-তে 'মৌলিক ভারসাম্যহীনতা' দেখা দিত। এই মৌলিক ভারসাম্যহীনতার অর্থ হল, দেশটির বিওপি-র উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে দীর্ঘস্থায়ী ঘাটতি বিরাজ করছে।

মুদ্রা বিনিময়ের এই ধরনের সুবিন্যস্থ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল এই কারণে যে স্বর্ণের সঞ্চয় ভাণ্ডারের অসম বণ্টন ছিল পৃথিবীর দেশগুলোতে এবং কেবলমাত্র আমেরিকাতেই বিশ্বের স্বর্ণ ভাণ্ডারের প্রায় 70 শতাংশ জমা ছিল। এইজন্য অন্য মুদ্রার স্বর্ণে রূপান্তরের বিশ্বাসযোগ্যতা আনার জন্য প্রয়োজন ছিল স্বর্ণের মজুতের ব্যাপক হারে পুনবণ্টন। এছাড়াও এইরূপ একটা বিশ্বাস জন্মেছিল যে, বিদ্যমান স্বর্ণের মজুত অপর্যাপ্ত হবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তারল্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে সামাল দিতে। স্বর্ণের সাশ্রয়ের একটি পদ্ধতি ছিল দ্বিস্তরীয় রূপান্তর ব্যবস্থা যেখানে প্রধান মুদ্রাগুলোকে স্বর্ণে রূপান্তর করা যেত এবং অন্য মুদ্রাগুলোকে প্রধান মুদ্রায় রূপান্তর সম্ভব হত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, যুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশগুলোর পুনর্নির্মাণের জন্য অত্যধিক সম্পদের প্রয়োজন ছিল। আমদানির বৃদ্ধি হয়েছিল এবং আমদানিজনিত ঘাটতিকে মেটানোর জন্য সঞ্চিত মুদ্রা ভাণ্ডার ব্যবহার করা হচ্ছিল। ওই সময় অবশিষ্ট বিশ্বে আমেরিকান ডলার মুদ্রা ভাণ্ডারের প্রধান উপাদান হিসাবে ব্যবহার হত এবং ওই মজুত বিস্তৃতি লাভ করছিল ইউ এস-এর ধারাবাহিক লেনদেন উদ্বৃত্তের ঘাটতির কারণে (অন্য দেশগুলো আগ্রহী ছিল ওই সকল ডলারকে মজুত সম্পদ হিসেবে ধরে রাখতে। এর কারণ ছিল দেশগুলো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল তাদের নিজস্ব মুদ্রা ও ডলারের মধ্যে রূপান্তর যোগ্যতা বজায় রাখতে)।

সমস্যাটা ছিল, যদি ইউ এস ডলারের স্বল্পকালীন দায়বদ্ধতা তার স্বর্ণ ভাণ্ডারের সাপেক্ষে অনবরত বৃদ্ধি পেতো, তাহলে নির্দিষ্ট দামে ডলারকে স্বর্ণে পরিবর্তন করার আমেরিকার প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাসযোগ্যতায় ধস নামত। এই কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলোর কাছে একটি উদ্দীপনা ছিল মজুত ডলারকে স্বর্ণে রূপান্তর করার এবং এই উদ্দীপনা বিপরীতভাবে ইউ এসের উপর চাপ সৃষ্টি করত তার প্রতিশ্রুতি পরিত্যাগ করতে। এটিই ছিল ট্রিফেন উভয়-সংকট। রবার্ট ট্রিফেন ছিলেন ব্রেটন উড্‌স ব্যবস্থার প্রধান সমালোচক। ট্রিফেন পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, আই এম এফ-কে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলোর ডিপোজিট ব্যাঙ্ক-এ রূপান্তরিত করতে এবং আই এম এফ-এর নিয়ন্ত্রণে একটি 'রিজার্ভ অ্যাসেট' সৃষ্টি করতে। 1967 সালে স্পেশাল ড্রয়িং রাইট্‌স (SDRs) সৃষ্টির ফলে স্বর্ণের স্থান চ্যুতি ঘটে। এর আর একটা পরিচিতি ছিল 'পেপার গোল্ড' বা কাগজী সোনা হিসেবে। এর উদ্দেশ্য ছিল আই এম এফ-এর তহবিলে আন্তর্জাতিক সম্পদের মজুত বৃদ্ধি করা। সাধারণভাবে এস ডি আর-কে স্বর্ণের নিরিখে সংজ্ঞায়িত করা হয় যেখানে 35 SDRs হল এক আউন্স স্বর্ণের সমান (ব্রেটন উড্‌স পদ্ধতির ডলার-স্বর্ণ হার)। 1974 সাল পর্যন্ত একাধিকবার একে পুনঃ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিদিন এর গণনা 5টি দেশের (ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, ব্রিটেন ও আমেরিকা) চারটি মুদ্রার সাথে (ইউরো, ডলার, জাপানি ইয়েন, পাউণ্ড স্টার্লিং) ডলারের মূল্যের ভারযুক্ত সমষ্টিরূপে হিসাব করা হয়। আই এম এফ-এর সদস্য দেশগুলো এসডিআর-কে রিজার্ভ মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করতে থাকায় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলোর মধ্যে জাতীয় মুদ্রাগুলোর বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রদানের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার হতে থাকায় ওই কাগজী সোনা বিশেষ ক্ষমতা অর্জন করে। এসডিআর-এর মৌলিক কিস্তিগুলো সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বণ্টন করা হত তহবিলে দেশগুলোর কোটা অনুসারে (ব্যাপকভাবে এই কোটা সম্পর্কিত ছিল দেশগুলোর গুরুত্বের সাথে যা নির্ধারিত হত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেশগুলোর গুরুত্বের ভিত্তিতে)।

ব্রেটন উড্‌স পদ্ধতির ভেঙ্গে পড়ার পূর্বে অনেক ঘটনা ঘটেছিল। যেমন 1967 সালে পাউণ্ডের অবমূল্যায়ণ, 1968 সালে ডলার থেকে স্বর্ণের দিকে উড়ান ধাবিত হওয়ার ফলে দ্বিস্তরীয় স্বর্ণ বাজারের আবির্ভাব ঘটে (সরকার নির্ধারিত দর 35 ডলার প্রতি আউন্স স্বর্ণ ছিল এবং বেসরকারি দর বাজার দ্বারা নির্ধারিত হত), এবং অবশেষে 1971 সালের আগস্টে ব্রিটেন দাবি করে যে, আমেরিকা যেন নিজের রক্ষিত ডলারের নিরিখে স্বর্ণমূল্যের নিশ্চয়তা দেয়। এর প্রভাবে আমেরিকান ডলার ও স্বর্ণের মধ্যেকার সম্পর্ক

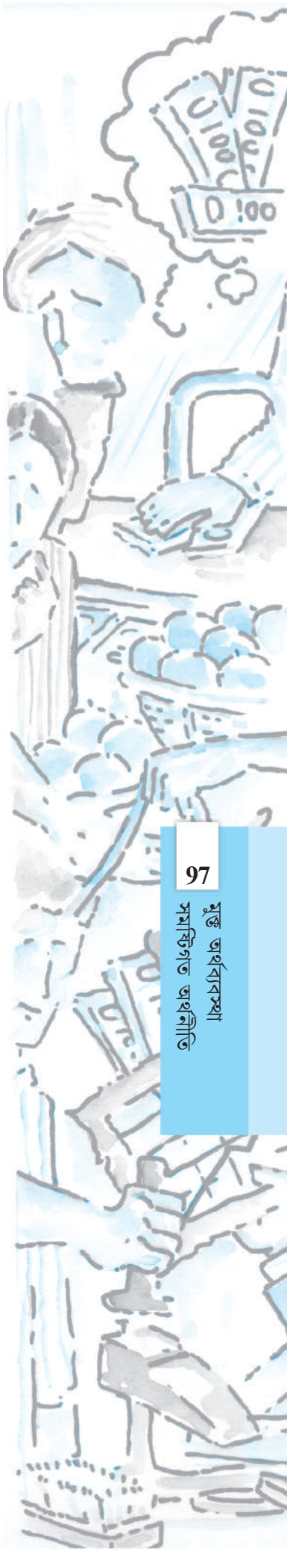

পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইউ এস এ তখন ঘোষণা করে যে, তারা আর 35 ডলার প্রতি আউন্স মূল্যে ডলারকে স্বর্ণে রূপান্তরে ইচ্ছুক নয়।

1971 সালের স্মিথসোনিয়ান চুক্তিতে বিনিময় হারের মার্জিনের উঠানামার সীমা প্রশস্থ করে নতুন 'কেন্দ্রীয় হারের' 2.5 শতাংশ উপরে বা নীচে পর্যন্ত অনুমোদন করা হয়েছিল এই আশায় যে ঘাটতি দেশগুলোর চাপ কমবে। তবে এই ব্যবস্থা মাত্র 14 মাস স্থায়ী হয়েছিল। উন্নত বাজার অর্থনীতিগুলো, যার নেতৃত্বে ইউনাইটেড কিংডম সুইজারল্যাণ্ড এবং জাপান ছিল তারা 1970-এর দশকের প্রথমদিকে পরিবর্তনশীল বিনিময় হার চালু করে। 1976 সালে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডারের ধারার সংশোধনের ফলে দেশগুলো পছন্দ করার সুযোগ পেয়েছিল যে, তাদের মুদ্রাকে নমনীয় রাখবে নাকি আবদ্ধ বিনিময়ের আওতায় নিয়ে আসবে (একটি মুদ্রার সাথে, একগুচ্ছ মুদ্রার সাথে অথবা SDR-এর সাথে আবদ্ধ থাকবে)। আবদ্ধ বিনিময় হারকে পরিচালনার জন্য কোনো নিয়ম ছিল না এবং নমনীয় বিনিময় হার দেখাশোনার জন্য কার্যত কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

বর্তমান চালচিত্র : ইদানিংকালে অনেক দেশ মুদ্রা বিনিময় হারে সংশোধন করেছে। 1999 সালের জানুয়ারি মাসে ইউরোপীয়ান মনিটারি ইউনিয়ন গঠন করা হয়। ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন সদস্য দেশগুলোর মুদ্রার বিনিময় হার স্থায়ীভাবে স্থির করে এই আর্থিক সংস্থা এবং ইউরোপীয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় 2002 সালে জানুয়ারি মাসে এক নতুন সাধারণ মুদ্রা, ইউরো, চালু করে। ইউরোর নতুন নোট ও কয়েন বাজারে ছাড়া হয়। এখন পর্যন্ত ই ইউ-র 25টি সদস্য দেশের মধ্যে 12টি দেশ ইউরো গ্রহণ করেছে।

ফ্রান্সের মুদ্রা ফ্রাঙ্ক-এর সাথে কয়েকটি দেশ তাদের মুদ্রাকে আবদ্ধ করে। এই দেশগুলোর মধ্যে অধিকাংশ দেশই আফ্রিকা মহাদেশে অবস্থিত এবং দেশগুলো অতীতে ফরাসী উপনিবেশ ছিল। অন্যান্য দেশগুলো একগুচ্ছ মুদ্রার সাথে সম্পর্কে আবদ্ধ হয় পরস্পরের সাথে বাণিজ্যিক লেনদেনের ভারযুক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে। প্রায়শই, ছোটো দেশগুলো অনুরূপভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদারী দেশের মুদ্রার সাথে বিনিময় হার স্থির করত। উদাহরণস্বরূপ, 1991 সালে **কারেন্সি বোর্ড** সিস্টেম গ্রহণ করেছিল। এই সিস্টেম বা ব্যবস্থা অনুযায়ী স্থানীয় মুদ্রার (পেসো) এবং ডলারের মধ্যে বিনিময় হার আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়। এখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভাঁড়ারে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা জমা থাকে যা ব্যাংক দ্বারা জারি করা সকল মুদ্রা এবং সঞ্চয়কে পৃষ্ঠপোষকতা করে। এই ব্যবস্থায় দেশটি ইচ্ছানুসারে অর্থের যোগান বাড়াতে পারে না। একইসাথে, যদি দেশীয় ব্যাংক ব্যবস্থায় সংকট দেখা দেয় (যখন ব্যাংকগুলোর দেশীয় মুদ্রা ঋণ করার প্রয়োজন হয়) তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংকগুলোর ঋণের শেষ অবলম্বনের ভূমিকা পালন করতে পারে না। পরবর্তী সময়ে আর্জেন্টিনিয়াতে সংকট দেখা দেওয়ায় কারেন্সি বোর্ড ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং 2002 সালের জানুয়ারি মাসে বাজার নির্ভর মুদ্রা বিনিময় হার চালু করা হয়।

2000 সালে ইকুয়েডর অপর এক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। ডলারিকরণের এই ব্যবস্থায় দেশটি দেশীয় মুদ্রাকে বাতিল করে এবং মার্কিন ডলারকে গ্রহণ করে। সকল পণ্যদ্রব্যের দাম ডলারে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং স্থানীয় মুদ্রাকে লেনদেনে ব্যবহার করা হচ্ছিল না। এভাবে অনিশ্চিয়তা ও ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব হয়েছিল। ইকুয়েডরের অর্থের যোগানের নিয়ন্ত্রণটা আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক- দ্যা ফেডারেল রিজার্ভ-এর উপর ন্যাস্ত করা হয়েছিল যেখানে আমেরিকার অর্থনীতির অবস্থার উপর নির্ভর করবে দেশটিতে অর্থের যোগান।

সামগ্রিকভাবে, আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে বহু মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিনিময় হার দিন দিন অল্পস্বল্প পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাজারের শক্তি সাধারণত মুখ্য ভূমিকা পালন করছে এবং পরিবর্তনের মৌলিক প্রবণতার প্রকৃতি নির্ধারণ করছে। এমনকি যারা বিনিময় হারকে দৃঢ়ভাবে অপরিবর্তনীয় রাখার পক্ষে সওয়াল করে তারাও কিন্তু বিনিময় হারকে সরকার যাতে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখে সেই কথাই বলে। তারা কখনোই আক্ষরিক অর্থে স্থির রাখার কথা বলে না। এখন স্বর্ণের ভূমিকাও বাদ দেওয়া হয়েছে। এর পরিবর্তে, এখন স্বর্ণের মুক্ত বাজার রয়েছে যেখানে স্বর্ণের দাম তার চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। স্বর্ণের চাহিদা মূলত নির্ভর করে জুয়েলারী শিল্পক্ষেত্রে, দন্ত চিকিৎসার কাজে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে যারা স্বর্ণকে মূল্যের ভাণ্ডার হিসেবে দেখে ইত্যাদির উপর।

সারসংক্ষেপ

1. দ্রব্য ও অর্থের বাজার উন্মুক্ত করা হলে দেশীয় ও বিদেশী দ্রব্য সামগ্রী এবং দেশি ও বিদেশী সম্পদের মধ্যে পছন্দ করার সুযোগ মিলে।
2. BoP বা ব্যালেন্স অব পেমেন্ট হল একটি দেশের সাথে অবশিষ্ট বিশ্বের দেশগুলোর লেনদেনের রেকর্ড।
3. চলতি খাতে ব্যালেন্স হল পণ্যদ্রব্য ও পরিষেবা বাণিজ্যের ব্যালেন্সের সাথে অবশিষ্ট বিশ্ব থেকে প্রাপ্ত নিট হস্তান্তরের যোগফল। মূলধনী খাতে ব্যালেন্স হল, অবশিষ্ট বিশ্ব থেকে আসা মূলধনের প্রবাহ থেকে অবশিষ্ট বিশ্বের দেশগুলোতে যে মূলধনের বহির্গমন হয় তার বিয়োগফল।
4. চলতি খাতে ঘাটতি দেখা দিলে অবশিষ্ট বিশ্বের দেশগুলো থেকে প্রাপ্ত নিট মূলধন প্রবাহের সাহায্যে অর্থের সংস্থান করা হয়, অর্থাৎ মূলধনী খাতের উদ্বৃত্ত দ্বারা অর্থের সংস্থান হয়।
5. আর্থিক বিনিময় হার হল দেশীয় মুদ্রার নিরিখে বিদেশী মুদ্রার এক এককের দাম (price)।
6. প্রকৃত বিনিময় হার হল, দেশীয় দ্রব্যের নিরিখে বিদেশী দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম। আর্থিক বিনিময় হার ও বৈদেশিক দামস্তরের গুণফলকে দেশীয় দামস্তর দিয়ে ভাগ করলে তা প্রকৃত বিনিময় হারের সমান হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোনো দেশের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতার পরিমাপ করে প্রকৃত বিনিময় হার। প্রকৃত বিনিময় হার একের সমান হলে দুটি দেশের ক্রয়ক্ষমতা সমান হবে।
7. স্থির বিনিময় হার ব্যবস্থায় মুদ্রার বিনিময় হার স্বর্ণমান ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট থাকে। এই ব্যবস্থায় প্রতিটি অংশগ্রহণকারী দেশ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় যে তাদের মুদ্রাকে স্থির দামে সহজে স্বর্ণে রূপান্তরিত করবে। আবদ্ধ বিনিময় হার প্রয়োজনমত বদলানো যায় এবং সরকারের হস্তক্ষেপে এই বিনিময় হারে পরিবর্তন ঘটে (অবমূল্যায়ণ বা ডিভ্যালুয়েশান)।
8. স্বচ্ছ (clean) বিনিময় হারের অধীনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ ছাড়াই বাজারী ব্যবস্থায় বিনিময় হার নির্ধারিত হয়।
9. মুক্ত অর্থব্যবস্থায় দ্রব্য সামগ্রীর অন্তর্দেশীয় চাহিদার (ভোগ, বিনিয়োগ এবং সরকারি ব্যয়) সাথে আমদানি থেকে রপ্তানির বিয়োগফলকে যোগ করলে তা দেশীয় দ্রব্যের চাহিদার সমান হয়।
10. মুক্ত অর্থব্যবস্থার গুণক, বন্ধ অর্থব্যবস্থার গুণক থেকে ছোটো হয়, কারণ অন্তর্দেশীয় চাহিদার একটি অংশ হল বিদেশী দ্রব্য। স্বয়ম্ভূত চাহিদা বৃদ্ধির ফলে বন্ধ অর্থব্যবস্থার তুলনায়, মুক্ত অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন স্বল্প পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বাণিজ্য ব্যালেন্সের হাল আরো খারাপ হয়।
11. বৈদেশিক আয় বাড়লে রপ্তানি বাড়ে এবং দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এর প্রভাবে বাণিজ্য উদ্বৃত্তের উন্নতি হয়।
12. বাণিজ্য ঘাটতি ভয়ঙ্কর হয় না যদি দেশটির ধারে নেওয়া পুঁজির বিনিয়োগে উপার্জন বৃদ্ধি সুদের হার অপেক্ষা অধিক হয়।

মূল ধারণা

মুক্ত অর্থব্যবস্থা
চলতিখাতে ঘাটতি
স্বয়ম্ভূত ও সমতাকারক লেনদেন
ক্রয়ক্ষমতার সমতা
অবচয়
স্থির বিনিময় হার
নিয়ন্ত্রণাধীন ভাসমানতা
প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা
মুক্ত অর্থনীতি গুণক
লেনদেন উদ্বৃত্ত
কর্তৃত্ব প্রসূত (Official) সংরক্ষিত লেনদেন
আর্থিক ও প্রকৃত বিনিময় হার
নমনীয় বা পরিবর্তনশীল বিনিময় হার
পৃথকীকৃত সুদের হার
অবমূল্যায়ণ
দেশীয় দ্রব্যের চাহিদা
নিট রপ্তানি

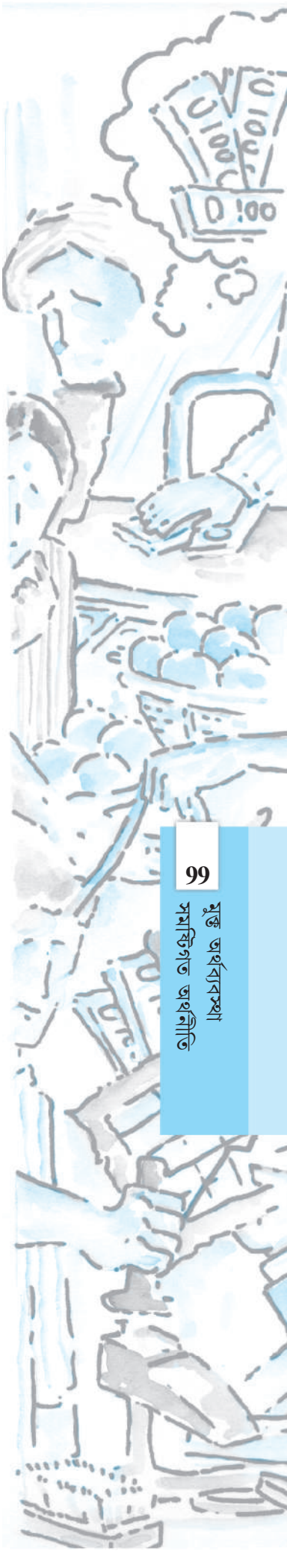

বাক্স 6.3: মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থা : ভারতীয় অভিজ্ঞতা

ভারতের মুদ্রা বিনিময় নীতির রূপান্তর ঘটেছে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় স্তরে পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে। স্বাধীনতার পর ব্রেটন উডস্ ব্যবস্থার চালু নিয়ম অনুসারে ভারতীয় টাকার বিশেষ বিনিময় হার স্থির করা হয়েছিল পাউণ্ড-স্টার্লিং-এর সাথে। ব্রিটেনের সাথে ভারতের ঐতিহাসিক যোগসূত্রের কারণে পাউণ্ড-স্টার্লিং এর সাথে টাকার বিনিময় হার স্থির করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে 1966 সালের জুন মাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে টাকার 36.5 শতাংশ অবমূল্যায়ণ করা হয়েছিল। এর কিছুদিন পরে, ব্রেটন উডস্ ব্যবস্থার পতনের জন্য এবং ইউ.কে.-এর সাথে ভারতের বাণিজ্যের অংশীদারি কমতে থাকায় 1975 সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাউন্স-স্টালিং থেকে টাকাকে বিযুক্ত করা হয়েছিল। 1975 সাল থেকে 1992 সালের মধ্যবর্তী সময়কালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারিভাবে টাকার বিনিময় মূল্য নির্ধারণ করে। সে সময় শীর্ষ ব্যাংক ভারতের সাথে বাণিজ্য সম্পর্কে আবদ্ধ প্রধান দেশগুলোর মুদ্রার 5 শতাংশ যোগ অথবা বিয়োগ করে নমিন্যাল ব্যান্ডের মধ্যে টাকার বিনিময় মূল্য নির্ধারণ করত। রিজার্ভ ব্যাংক দৈনন্দিন ভিত্তিতে, বিনিময় হারে হস্তক্ষেপ করত যার পরিণতিতে রিজার্ভের আকারের ব্যাপক পরিবর্তন হত। এই সময়ের বিনিময় হারের জমানাকে বলা হয় পুনর্বিন্যস্ত আর্থিক বিনিময় হার যার একটি ব্যান্ড বা সীমা থাকে (adjustable nominal peg with a band)।

1990-এর দশকের শুরুতে তেলের দামের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং গাল্‌ফভুক্ত দেশগুলোতে সংকটের কারণে গাল্‌ফ ক্ষেত্র থেকে অর্থ প্রেরণ বন্ধ হয়ে যায়। এই কারণ সহ অন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার অভিঘাতে ভারতের ব্যালেন্স অব পেমেন্টের সমস্যা গুরুতর হয়ে উঠে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ঋণ দেওয়ার সামর্থ হারিয়ে ফেলে এবং সরকারের চলতি খাতে ঘাটতি মোকাবিলায় স্বল্প মেয়াদি অর্থের সংস্থান করা কষ্টকর হয়ে উঠে। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার মজুত আগস্ট 1990-এ 3.1 বিলিয়ন ডলার থেকে হুড়মুড় করে কমে 12 জুলাই 1991-এ 975 মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার হয়। (আমরা এই অবস্থাকে বর্তমানের সাথে তুলনা করতে পারি; 2006 সালের 27 জানুয়ারি ভারতে বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারের পরিমাণ ছিল 139.2 বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই বিপর্যয়কে সামাল দিতে বিদেশে স্বর্ণ পাঠানোর মতো ব্যবস্থা বাদেও, অনাবশ্যক আমদানি ছাটাই করা, আই.এম.এফ. এবং বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক ঋণের উৎসসমূহের দারস্থ হওয়া, স্থিতিশীলতা রক্ষাকারী ব্যবস্থা চালু ও অর্থনীতির কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচী নেওয়া হয়। এছাড়াও, 1991 সালের জুলাই- 1 ও 3 তারিখে দুই ধাপে টাকার 18–19 শতাংশ অবমূল্যায়ণ করা হয়)। 1992 সালের মার্চ মাসে উদারীকৃত বিনিময় হার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Liberalised Exchange Rate Management System, সংক্ষেপে LERMS) রূপায়ণ করা হয় যার মাধ্যমে দ্বৈত বিনিময় হার চালু করা হয়। এই ব্যবস্থায় এক্সচেঞ্জ বা বিনিময় আয়ের 40 শতাংশ রিজার্ভ ব্যাংকের নির্ধারিত সরকারি হারে জমা করতে হবে এবং অবশিষ্ট 60 শতাংশ বাজার নির্ধারিত হারে রূপান্তর করা হবে। 1993 সালের 1 মার্চে এই দ্বৈত-হারকে একটি হারে নিয়ে আসা হয়। চলতি খাতের রূপান্তর যোগ্যতার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল যা সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছিল 1994-এর আগস্ট মাসে। আই.এম.এফ.-এর আর্টিক্যাল অব অগ্রিমেন্টে-এর আর্টিক্যাল VIII কে মেনে নেওয়ার মধ্য দিয়ে)। এইভাবে টাকার বিনিময় হার বাজার দ্বারা নির্ধারিত হতে থাকে এবং মুদ্রার ক্রয় ও বিক্রয় করে রিজার্ভ ব্যাংক বিদেশী মুদ্রার বাজারের সাম্যাবস্থা বজায় রাখে।

অনুশীলনী

1. বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ও চলতি খাতে উদ্বৃত্তের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো।
2. সরকারি সংরক্ষিত লেনদেনগুলো কী? লেনদেন উদ্বৃত্তে তাদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।
3. আর্থিক বিনিময় হার ও প্রকৃত বিনিময় হারের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। যদি তুমি দেশীয় দ্রব্য বা বিদেশী দ্রব্যের মধ্যে কোনো একটি কেনার সিদ্ধান্ত নাও তখন কোন্ বিনিময় হার বেশি প্রাসঙ্গিক হবে? ব্যাখ্যা করো।
4. ধরো, যদি 1.2 ইয়েন লাগে 1 রূপী ক্রয় করতে এবং জাপানে দামস্তর 3 হল এবং ভারতে 1.21, ভারত ও জাপানের মধ্যে প্রকৃত বিনিময় হার হিসেব করো। (ভারতীয় দ্রব্যের নিরিখে জাপানি দ্রব্যের দাম)।

   (**সংকেত :** প্রথমে টাকার ভিত্তিতে ইয়েনের আর্থিক বিনিময় হার হিসেব করে)।
5. স্বর্ণমানের অধীনে লেনদেন উদ্বৃত্তে ভারসাম্য অর্জনের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করো।
6. পরিবর্তনীয় বিনিময় হারের বিদ্যমান ব্যবস্থায় কীভাবে বিনিময় হার নির্ধারিত হয়?
7. অবমূল্যায়ণ ও অবচয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করো।
8. নিয়ন্ত্রিত পরিবর্তনীয় মুদ্রা ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন আছে? কেন আছে তা ব্যাখ্যা করো।
9. দেশীয় দ্রব্যের চাহিদা ও দ্রব্যের জন্য অন্তঃদেশীয় চাহিদা — এই দুটি ধারণা কি এক?
10. যখন $M = 60 + 0.06Y$, তখন প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা কী হবে? প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা এবং সামগ্রিক চাহিদা অপেক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক কী?
11. বন্ধ অর্থব্যবস্থার তুলনায় মুক্ত অর্থ ব্যবস্থায় স্বয়ম্ভূত ব্যয় গুণক ছোটো হয় কেন?
12. পাঠ্যবইয়ে ধরে নেওয়া এককালীন নির্দিষ্ট পরিমাণ কর বা লাম্পসাম ট্যাক্স-এর পরিবর্তে সমানুপাতিক কর $T = tY$-এর সাহায্যে মুক্ত অর্থ ব্যবস্থার গুণক গণনা করো।
13. ধরো, $C = 40 + 0.8YD$, $T = 50$, $I = 60$, $G = 40$, $X = 90$, $M = 50 + 0.05Y$ (a) ভারসাম্য আয় নির্ণয় করো। (b) ভারসাম্য আয়ে নিট রপ্তানি উদ্বৃত্ত নির্ণয় করো। (c) যখন সরকারি ক্রয় 40 থেকে বেড়ে 50 হয় তখন ভারসাম্য আয় এবং নিট রপ্তানি উদ্বৃত্তে কী পরিবর্তন ঘটবে?
14. উপরের উদাহরণে, যদি রপ্তানি পরিবর্তিত হয়ে $X = 100$ হয়, তাহলে ভারসাম্য আয় এবং নিট রপ্তানি উদ্বৃত্তের পরিবর্তন নির্ণয় করো।
15. ধরো 2010 সালে রূপী ও ডলারের বিনিময় হার ছিল Rs. 30=1$। ধরো, ভারতে বিগত 20 বছরে দাম দ্বিগুণ হয়েছে, যেখানে আমেরিকাতে দাম অপরিবর্তিত ছিল। ক্রয় ক্ষমতার সমতা (পিপিপি) তত্ত্ব অনুসারে, 2030 সালে ডলার ও রূপীর বিনিময় হার কী হবে?
16. যদি B দেশের তুলনায় A দেশের মুদ্রাস্ফীতি বেশি হয় এবং দুটি দেশের বিনিময় হার স্থির হয় তবে দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য উদ্বৃত্তে কী ঘটবে?
17. চলতি খাতে ঘাটতি কি বিপদের কারণ হয়? ব্যাখ্যা করো।
18. ধরো, $C = 100 + 0.75YD$, $I = 500$, $G = 750$, কর হল আয়ের 20 শতাংশ, $X = 150$, $M = 100 + 0.2Y$ হয় তবে ভারসাম্য আয়, বাজেট ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত এবং বাণিজ্য ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত নির্ণয় করো।
19. কয়েকটি বিনিময় হার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করো যেগুলোতে বিভিন্ন দেশ নিজেদের বাহ্যিক খাতে স্থায়িত্ব আনার জন্য প্রবেশ করেছে।

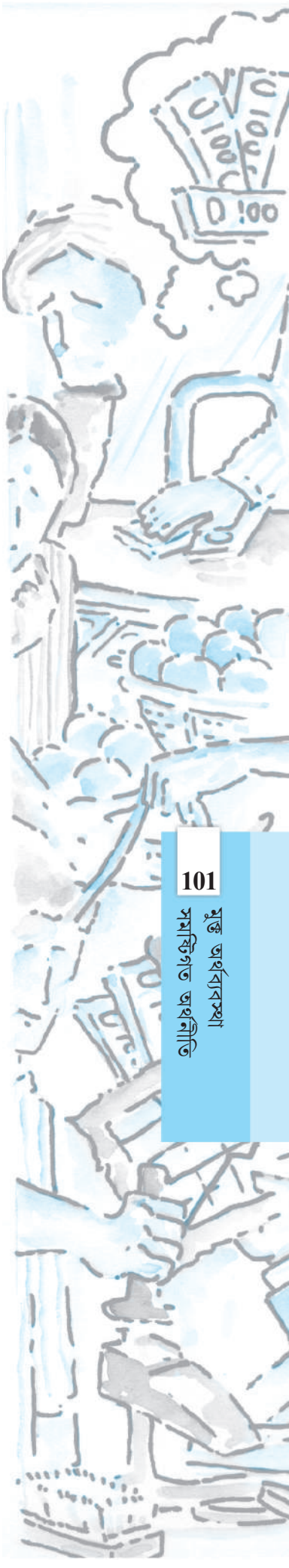

Suggested Readings

1. Dornbusch, R. and S. Fischer, 1994. *Macroeconomics*, sixth edition, McGraw-Hill, Paris.
2. *Economic Survey*, Government of India, 2006-07.
3. Krugman, P.R. and M. Obstfeld, 2000. *International Economics, Theory and Policy*, fifth edition, Pearson Education.

পরিশিষ্ট 6.1

মুক্ত অর্থ ব্যবস্থায় ভারসাম্য আয় নির্ধারণ

ভোক্তা ও ফার্মগুলোর কাছে এখন দেশে উৎপাদিত দ্রব্য এবং বিদেশে উৎপাদিত দ্রব্য ক্রয় করার সুযোগ আছে। এজন্য এখন আমাদের দ্রব্যের অন্তর্দেশীয় চাহিদা এবং অন্তর্দেশীয় দ্রব্যের চাহিদার মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন।

কোনো একটি মুক্ত অর্থব্যবস্থায় জাতীয় আয়ের অভেদ

একটি বন্ধ অর্থ ব্যবস্থায় অন্তর্দেশীয় দ্রব্যের চাহিদার তিনটি উৎস রয়েছে — ভোগ (C), সরকারি ব্যয় (G) এবং অন্তর্দেশীয় বিনিয়োগ (I)। এখন আমরা লিখতে পারি

$$Y = C + I + G \tag{6.1}$$

মুক্ত অর্থ ব্যবস্থায় রপ্তানি (X) দেশীয় দ্রব্য ও সেবার অতিরিক্ত চাহিদা গঠন করে, যা বিদেশ থেকে আসে এবং এই কারণে একে সামগ্রিক চাহিদায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমদানি (M) দেশীয় বাজারে ঘাটতি পূরণ করে এবং দেশীয় চাহিদার সেই ঘাটতি অংশটুকু বৈদেশিক দ্রব্য ও সেবার দ্বারা পূর্ণ হয়। সুতরাং, মুক্ত অর্থ ব্যবস্থায় জাতীয় আয় অভেদটি হবে,

$$Y + M = C + I + G + X \tag{6.2}$$

অভেদটি পুনর্বিন্যস্ত করে পাই,

$$Y = C + I + G + X - \mathrm{M} \tag{6.3}$$

বা,

$$Y = C + I + G + NX \tag{6.4}$$

যেখানে, NX হল **নিট রপ্তানি** (রপ্তানি-আমদানি) একটি ধনাত্মক NX (আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি বেশি হলে) বাণিজ্য উদ্বৃত্ত নির্দেশ করে এবং ঋণাত্মক NX (আমদানি রপ্তানি অপেক্ষা বেশি হলে) বাণিজ্য ঘাটতিকে নির্দেশ করে।

একটি মুক্ত অর্থ ব্যবস্থায় ভারসাম্য আয়ে আমদানি ও রপ্তানির ভূমিকা নির্ধারণ করতে আমরা একই প্রক্রিয়াকে গ্রহণ করি, যা আমরা বন্ধ অর্থ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে করেছি। এখানে আমরা বিনিয়োগ ও সরকারি ব্যয়কে স্বয়ম্ভূত হিসাবে ধরে নিয়েছি। এছাড়াও আমাদের আমদানি ও রপ্তানির নির্ধারকগুলোকে উল্লেখ করতে হবে। আমদানির চাহিদা নির্ভর করে অন্তঃদেশীয় আয় (Y) এবং প্রকৃত বিনিময় হারের (R) উপর। অধিক আয় বেশি আমদানিতে উৎসাহ যোগায়। স্মরণ করে দেখো যে, প্রকৃত বিনিময় হারকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে দেশীয় দ্রব্যের নিরিখে বৈদেশিক দ্রব্যের দামের পরিপ্রেক্ষিতে। প্রকৃত বিনিময় হার (R) বেশি হলে বৈদেশিক দ্রব্য তুলনামূলকভাবে বেশি দামী হয়। পরিণতিতে আমদানির পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে। সুতরাং, আমদানি ধনাত্মকভাবে Y-এর উপর নির্ভর করে এবং ঋণাত্মকভাবে R-এর উপর নির্ভর করে। সংজ্ঞা অনুসারে, কোনো একটি দেশের রপ্তানি হল অন্য দেশের জন্য আমদানি। তাই আমাদের রপ্তানি হবে বিদেশের জন্য আমদানি। এইটি নির্ভর করে বৈদেশিক আয় Y_f এবং R-এর উপর। Y_f এর বৃদ্ধি হলে বিদেশে আমাদের দেশের দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে। ফলস্বরূপ রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। অপরদিকে, R-এর বৃদ্ধি দেশীয় দ্রব্যকে সস্তা করে তোলে এবং আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। রপ্তানি বৈদেশিক আয় ও প্রকৃত বিনিময় হারের সাথে ধনাত্মক সম্পর্কে আবদ্ধ। সুতরাং, রপ্তানি ও আমদানির পরিমাণ নির্ভর করে দেশীয় আয়, বৈদেশিক আয় এবং

প্রকৃত বিনিময় হারের উপর। আমরা ধরে নিই যে, দামস্তর এবং আর্থিক বিনিময় হার ধ্রুবক, অতএব R স্থির থাকবে। আমাদের দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে, বৈদেশিক আয় এবং এইজন্য রপ্তানিকেও বিবেচনা করা হয় বহির্ভূত (এক্সোজেনাস) ($X = \bar{X}$) রূপে।

অতএব, আমদানির চাহিদাকে ধরা হয় আয়ের উপর নির্ভরশীল একটি স্বয়ম্ভূত উপাদান হিসেবে,

$M = \bar{M} + mY$, যেখানে $\bar{M} > 0$ হল স্বয়ম্ভূত উপাদান, $0 < m < 1$ । (6.5)

এখানে m হল **প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা,** বাড়তি টাকা আয়ের যে ভগ্নাংশ আমদানিতে খরচ করা হয়। এই ধারণাটি প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার অনুরূপ।

এক্ষেত্রে ভারসাম্য আয় হবে

$$Y = \bar{C} + c(Y - T) + \bar{I} + \bar{G} + \bar{X} - \bar{M} - mY \quad (6.6)$$

সমস্ত স্বয়ম্ভূত উপাদানগুলোকে একত্রে $\bar{A}$ ধরে আমরা পাই

$$Y = \bar{A} + cY - mY \quad (6.7)$$

বা, $$(1 - c + m)Y = \bar{A} \quad (6.8)$$

বা, $$Y^* = \frac{1}{1-c+m}\bar{A} \quad (6.9)$$

আয়-ব্যয়ের কাঠামোতে বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্তির প্রভাব পরীক্ষা করার জন্য, আমাদের তুলনা করতে হবে (6.10) সমীকরণকে, বন্ধ অর্থ ব্যবস্থার ভারসাম্য আয়ের সমতুল্য রাশি প্রকাশের সাথে। উভয় সমীকরণেই, ভারসাম্য আয়কে প্রকাশ করা হয় স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ গুণক এবং স্বয়ম্ভূত ব্যয় স্তর এই দুটি পদের গুণফল আকারে। এখন আমরা বিবেচনা করি মুক্ত অর্থ ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে কীভাবে প্রত্যেকটির পরিবর্তন হচ্ছে।

যেহেতু প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা (m) শূন্য থেকে বড়ো তাই আমরা মুক্ত অর্থ ব্যবস্থায় ছোটো গুণক পাই। এটি দেখানো যায়,

$$\text{মুক্ত অর্থ ব্যবস্থা গুণক} = \frac{\Delta Y}{\Delta \bar{A}} = \frac{1}{1-c+m} \quad (6.10)$$

উদাহরণ 6.2

যদি $c = 0.8$ এবং $m = 0.3$, হয় তাহলে মুক্ত অর্থব্যবস্থা ও বন্ধ অর্থব্যবস্থার গুণক আমরা পাব, যা হবে যথাক্রমে

$$\frac{1}{1-c} = \frac{1}{1-0.8} = \frac{1}{0.2} = 5 \quad (6.11)$$

এবং

$$\frac{1}{1-c+m} = \frac{1}{1-0.8+0.3} = \frac{1}{0.5} = 2 \quad (6.12)$$

যদি দেশীয় স্বয়ম্ভূত চাহিদা 100 বাড়ে, তাহলে বন্ধ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন 500 বাড়বে, যেখানে উৎপাদন মুক্ত অর্থ ব্যবস্থায় 200 বাড়বে।

অর্থ ব্যবস্থাকে উন্মুক্ত করা হলে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ গুণকের মান হ্রাসের বিষয়টি আমরা পূর্বে উল্লেখিত গুণক প্রক্রিয়ার আলোচনার সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারি (অধ্যায় -4)। স্বয়ম্ভূত ব্যয় এর পরিবর্তন, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় সরকারি ব্যয়ের পরিবর্তন, আয়কে সরাসরি প্রভাবিত করে এবং ভোগের উপর প্রভাব আরোপ করে, ফলে পুনরায় আয় প্রভাবিত হয়। MPC শূন্য থেকে বেশি হলে ভোগের উপর এর প্রণোদিত প্রভাবের কিছু অংশ কার্যকরী হবে বিদেশী দ্রব্যে, যা দেশীয় দ্রব্যে হবে না। সুতরাং, দেশীয় দ্রব্যের চাহিদায় এবং ফলস্বরূপ দেশীয় আয়ে এই প্রণোদিত প্রভাব কম হবে। প্রতি একক আয় বৃদ্ধিতে আমদানির বৃদ্ধি দেশীয় আয়ের চক্রাকার প্রবাহে বাড়তি নির্গমন ঘটাবে যা গুণক প্রক্রিয়ার প্রতি রাউন্ডেই ঘটবে এবং এই প্রক্রিয়ার ফলে স্বয়ম্ভূত ব্যয় গুণকের মান হ্রাস পাবে।

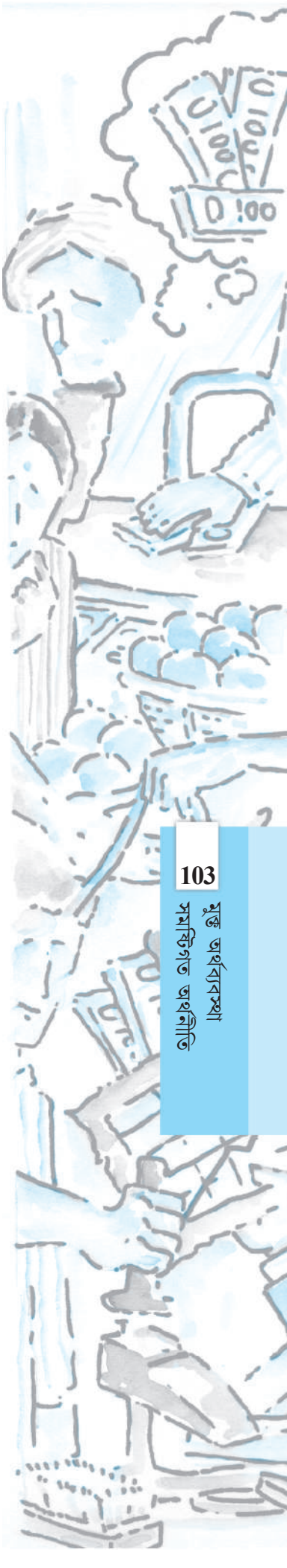

শব্দকোষ

Adam Smith (1723 – 1790) (অ্যাডাম স্মিথ) আধুনিক ধ্রুপদি অর্থনীতির জনক হলেন অ্যাডাম স্মিথ। তাঁর বিখ্যাত বইটি হল '*ওয়েলথ অব নেশনস্*'।

Aggregate monetary resources (মোট আর্থিক সম্পদ) ডাকঘর সংস্থার সঞ্চয়ে সময় আমানত বা স্থায়ী আমানত ব্যতীত ব্যাপক অর্থ (M3)।

Automatic stabilisers (স্বয়ংক্রিয়/স্বয়ংচালিত স্থিতিকারক) যখন অর্থনীতির হাল খারাপ হয় তখন নির্দিষ্ট খরচের এবং করের নিয়মের অধীনে ব্যয় যা, স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৃদ্ধি পায় অথবা কর যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে হ্রাস পায় এবং অর্থনীতিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থিতাবস্থায় পৌঁছে দেয়।

Autonomous change (স্বয়ম্ভূত পরিবর্তন) বহিঃস্থ উপাদানের প্রভাবে কোনো একটি সামষ্টিক অর্থনীতির মডেলের চলকের মানের পরিবর্তনকে স্বয়ম্ভূত পরিবর্তন বলে।

Autonomous expenditure multiplier (স্বয়ম্ভূত ব্যয়গুণক) সম্মিলিত উৎপাদন অথবা আয়ের বৃদ্ধির (অথবা হ্রাসের) ফলে স্বয়ম্ভূত ব্যয়ের বৃদ্ধির (অথবা হ্রাসের) অনুপাত।

Balance of payments (লেনদেন উদ্বৃত্ত) একটি দেশের সাথে বিশ্বের অন্য সকল দেশের লেনদেনের ধারাবাহিক হিসেবের সমষ্টি।

Balanced budget (ভারসাম্য বাজেট) যে বাজেটে সরকারের সংগৃহীত কর সরকারি ব্যয়ের সমান হয়।

Balanced budget multiplier (ভারসাম্য বাজেট গুণক) কর ও সরকারি ব্যয় উভয়ের এক একক বৃদ্ধি অথবা হ্রাসের ফলে ভারসাম্য উৎপাদনে যে পরিবর্তন হয়।

Bank rate (ব্যাংক রেইট/ব্যাঙ্ক হার) সম্পদের অভাব দেখা দিলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণে যে হারে সুদ প্রদান করে।

Barter exchange (সরাসরি পণ্য বিনিময় / পণ্য ভিত্তিক বিনিময়) মুদ্রার মধ্যস্ততা ছাড়া পণ্য দ্রব্যের বিনিময়।

Base year (ভিত্তি বছর) প্রকৃত জিডিপি-র হিসাবে যে বছরে মূল্য সমূহ ব্যবহৃত হয়।

Bonds (বণ্ড/ঋণপত্র/বন্ধকপত্র) একটি কাগজ যার মধ্যে একটি নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ভবিষ্যতে আর্থিক প্রতিদান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকে। জনগণ থেকে ঋণ সংগ্রহে ফার্ম বা সরকারের পক্ষ থেকে বণ্ড ছাড়া হয়।

Broad money (ব্যাপক অর্থ) বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ ও ডাকঘর সঞ্চয় সংস্থায় রাখা মেয়াদি আমানত।

Capital (মূলধন) ক্যাপিটাল বা মূলধন হল উৎপাদনের একটি উপকরণ যা নিজেই উৎপাদিত হয় এবং যা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সাধারণত সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ হয় না।

Capital gain/loss (মূলধনী লাভ/ক্ষতি) বণ্ডের বাজারে বণ্ড বা ঋণপত্রের মূল্য বৃদ্ধি অথবা হ্রাসের কারণে একজন ঋণপত্র অধিকারীর সম্পদের মূল্যের বৃদ্ধি অথবা হ্রাস।

Capital goods (মূলধনী দ্রব্য) দ্রব্যসামগ্রী যেগুলো ভোক্তার তাৎক্ষণিক প্রয়োজন পূরণের জন্য ক্রয় করা হয় না বরং এগুলো অন্য দ্রব্যাদি উৎপাদন করে।

Capitalist country or economy (পুঁজিবাদী/ধনতান্ত্রিক দেশ বা অর্থনীতি) একটি দেশ যেখানে অধিকাংশ উৎপাদন পুঁজিবাদী ফার্ম দ্বারা সংঘটিত হয়।

Capitalist firms (পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রতিষ্ঠান) এই সকল ফার্মে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো বর্তমান - (a) উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা (b) বাজারের প্রয়োজনে উৎপাদন (c) শ্রমের ক্রয় ও বিক্রয় একটি দামে হয় যাকে মজুরি হার বলে (d) পুঁজির ধারাবাহিক পুঞ্জীকরণ।

Cash Reserve Ratio (CRR) (নগদ জমা অনুপাত, সি.আর.আর.) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের জমার যে ক্ষুদ্র অংশ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে জমা রাখে।

Circular flow of income (আয়ের বৃত্তাকার প্রবাহ) এই ধারণাটি হল যে, অর্থনীতিতে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার সামগ্রিক মূল্য বৃত্তাকার প্রবাহে আবর্তিত হয়। উপকরণের মূল্য বাবদ খরচ অথবা দ্রব্য ও সেবার জন্য ব্যয়ে কিংবা উৎপাদনের সামগ্রিক মূল্যে এই প্রবাহ ঘটে।

Consumer durables (ভোক্তার স্থায়ী দ্রব্য) যেসব ভোগ্য দ্রব্য ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হয়ে যায় না বরং দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহার হতে থাকে তাদেরকে ভোক্তার স্থায়ী দ্রব্য বলে।

Consumer Price Index (CPI) (ভোক্তার দাম সূচক, সি পি আই) ভারযুক্ত গড় দামস্তরের শতকরা পরিবর্তন। এক্ষেত্রে আমরা ভোগদ্রব্যের প্রদেয় বাস্কেটের দামকে নিই।

Consumption goods (ভোগ দ্রব্য) যেসব দ্রব্য ভোক্তার ভোগ মিটায় অথবা সরাসরি ভোক্তার অভাব পূরণ করে তাকে ভোগ্য দ্রব্য বলে। এর মধ্যে সেবা ও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

Corporate tax (কোম্পানি কর) কোম্পানির (অথবা বেসরকারি মালিকানাধীন ফার্মের) আয়ের উপর আরোপিত কর।

Currency deposit ratio (মুদ্রা জমা অনুপাত) জনগণের হাতে রক্ষিত অর্থের যে অংশ বাণিজ্যিক ব্যাংকে গচ্ছিত রাখা হয় তার অনুপাতকে বলে মুদ্রা জমা অনুপাত।

Deficit financing through central bank borrowing (কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ঘাটতি ব্যয়) সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে বাজেটের ঘাটতি ব্যয় করে। এর মাধ্যমে অর্থব্যবস্থায় অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায় এবং তার প্রভাবে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে।

Depreciation (বহির্বিনিময় হারের হ্রাস) পরিবর্তনীয় বিনিময় হারের অধীন বৈদেশিক মুদ্রার সাপেক্ষে দেশীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাস। এই পরিবর্তনটি বিনিময় হার বাড়ার অনুরূপ হয়।

Depreciation (অবচয়) ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে কোনো মূলধনী স্টকের মূল্য হ্রাস।

Devaluation (অবমূল্যায়ণ) আবদ্ধ মুদ্রা বিনিময় হারের অধীনে সরকারি কাজকর্মের ফলে দেশীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাস।

Double coincidence of wants (অভাবের দ্বৈত সমাপতন) এইটি এমন এক অবস্থা যেখানে দুইজন আর্থিক প্রতিনিধির পরিপূরক চাহিদা থাকে, প্রত্যেকের অপরজনের অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য।

Economic agents or units (আর্থিক এজেন্ট বা একক) আর্থিক একক বা আর্থিক এজেন্ট হল সেই সকল ব্যক্তি সমূহ বা প্রতিষ্ঠানসমূহ যারা অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

Effective demand principle (কার্যকরী চাহিদার নীতি) যদি অনুমান করা হয় যে, স্বল্পকালে চূড়ান্ত দ্রব্যের যোগান স্থির দামে অসীম স্থিতিস্থাপক, তবে সামগ্রিক উৎপাদন শুধুমাত্র সামগ্রিক চাহিদার পরিমাণের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। একে কার্যকরী চাহিদার নীতি বলা হয়।

Entrepreneurship (উদ্যোগী) উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সংগঠিত করা, সমন্বয় সাধন ও ঝুঁকি নেওয়ার কাজ।

Ex ante consumption (পরিকল্পিত ভোগ) পরিকল্পিত ভোগের মূল্য।

Ex ante investment (পরিকল্পিত বিনিয়োগ) পরিকল্পিত বিনিয়োগ মূল্য।

Ex ante(পরিকল্পিত) একটি প্রকৃত মূল্যের বিপরীতে চলকের পরিকল্পিত মূল্য।

Ex post (বাস্তব/প্রকৃত) একটি চলকের পরিকল্পিত মূল্যের বিপরীতে প্রকৃত বা প্রাপ্ত মূল্য।

Expenditure method of calculating national income (জাতীয় আয় পরিমাপের ব্যয় পদ্ধতি) একটি অর্থনীতিতে একটি সময়কালে দ্রব্য ও সেবার উৎপাদনে যে চূড়ান্ত ব্যয় হয় তার হিসেব রক্ষার পদ্ধতি হল জাতীয় আয় পরিমাপের ব্যয় পদ্ধতি।

Exports (রপ্তানি) দেশের দ্রব্য ও সেবার অবশিষ্ট বিশ্বের দেশগুলোতে বিক্রয়।

External sector (বহির্দেশীয় ক্ষেত্র) একটি দেশের সাথে বিশ্বের অন্যান্য দেশের আর্থিক লেনদেনকে বুঝায়।

Externalities (বাহ্যিকতা / বহিঃস্থ প্রভাব সমূহ) কোনো অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রভাবে যখন বাইরের কোনো সংস্থা বা গোষ্ঠী বা লোক উপকৃত বা অপকৃত হয় এবং ওই উপকারের জন্য তাদের কোনো দাম দিতে হয় না অথবা অপকারের জন্যেও কোনো ক্ষতিপূরণ পায় না। পারিপার্শ্বিকের উপর এই জাতীয় প্রভাবকেই বাহ্যিকতা বলে।

Fiat money (আদর্শ নির্ভর অর্থ বা ফিয়েট অর্থ) অন্তর্নিহিত মূল্যহীন অর্থ।

Final goods (চূড়ান্ত দ্রব্য) ওই সমস্ত দ্রব্য যেগুলোর উৎপাদন প্রক্রিয়াতে পুনরায় রূপান্তর হয় না।

Firms (ফার্ম বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান) অর্থনৈতিক একক যা উৎপাদনের উপকরণগুলো নিয়োজিত করে দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর উৎপাদন কার্য সংঘটিত করে।

Fiscal policy (রাজকোষ বা ফিসক্যাল নীতি) সরকারের নীতি যা সরকারি ব্যয়ের স্তর এবং হস্তান্তর এবং কর কাঠামো নিয়ে বিচার-বিবেচনা করে।

Fixed exchange rate (স্থির বিনিময় হার) দুই বা ততোধিক দেশের মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হার যা কোনো এক স্তর পর্যন্ত স্থির থাকে এবং মাঝে মাঝে পুনর্বিন্যাস করা হয়।

Flexible/floating exchange rate (নমনীয়/বাজার নির্ভর বিনিময় হার) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হস্তক্ষেপ ছাড়াই বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বাজারের চাহিদা ও যোগানের ঘাত প্রতিঘাতে বিনিময় হার নির্ধারিত হয়।

Flows (প্রবাহ) চলকসমূহ যা নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য নির্ধারণ করা হয়।

Foreign exchange (বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়) কোনো একটি দেশের বৈদেশিক মুদ্রা, দেশীয় মুদ্রা বাদে অন্য সকল মুদ্রাসমূহ।

Foreign exchange reserves (বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ভাণ্ডার) কোনো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রক্ষিত বৈদেশিক সম্পদ।

Four factors of production (উৎপাদনের চারটি উপাদান) জমি, শ্রমিক, মূলধন এবং উদ্যোগ এই উপকরণগুলো একত্রে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

GDP Deflator (জিডিপি ডিফ্লেটর) আর্থিক ও প্রকৃত জিডিপি-র অনুপাত।

Government expenditure multiplier (সরকারি ব্যয় গুণক) এই সংখ্যাসূচক সহগ দেখায় প্রত্যেক একক সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ।

Government (সরকার) যে প্রতিষ্ঠান দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করে, কর ও জরিমানা আরোপ করে। আইন কানুন তৈরি করে এবং জনগণের অর্থনৈতিক কল্যাণ বেগবান করে।

Great Depression (মহামন্দা) 1930-এর সময়কালে, (1929 সালে নিউইয়র্কের স্টক মার্কেটের ধস নামার পর থেকে শুরু হয়েছিল) উন্নত দেশগুলোতে উৎপাদন হ্রাস এবং অস্বাভাবিকভাবে বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল।

Gross Domestic Product (GDP) (মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন, জিডিপি) কোনো একটি দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে উৎপাদিত সম্পূর্ণ দ্রব্য ও সেবার মোট মূল্য। এখানে মূলধন স্টকের অবচয়ের প্রতিস্থাপনের বিনিয়োগও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

Gross fiscal deficit (মোট রাজকোষ/ফিসক্যাল ঘাটতি) রাজস্ব আয় ও ঋণ বহির্ভূত মূলধনী আয় অপেক্ষা ছাপিয়ে যাওয়া সরকারি ব্যয়।

Gross investment (মোট বিনিয়োগ) মূলধন ভাণ্ডারে নতুন সংযোজন যেখানে এছাড়াও অন্তর্ভুক্ত হয় মূলধনী মজুতের ক্ষয়ক্ষতি মেরামতির খরচ।

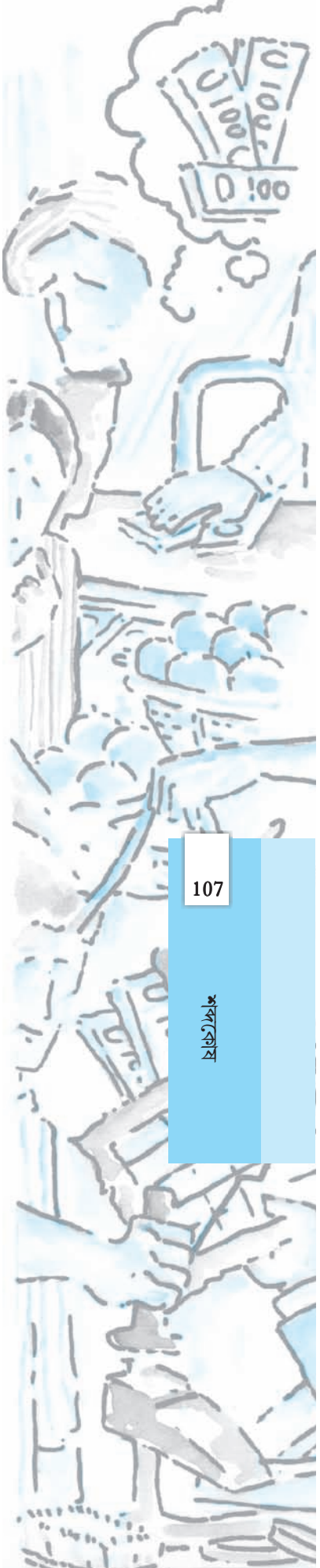

Gross National Product (GNP) (মোট জাতীয় উৎপন্ন, জিএনপি) মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP) + বিদেশ থেকে প্রাপ্ত উপকরণের নিট আয়। অন্যভাবে বলা যায়, মোট জাতীয় উৎপাদনে সমস্ত নাগরিকের আয় অন্তর্ভুক্ত হয়। অপরদিকে, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে দেশীয় অর্থব্যবস্থার মধ্যে বিদেশীদের প্রাপ্ত আয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে এবং বাদ দেওয়া হয় বিদেশের অর্থনীতিতে দেশীয় নাগরিকদের উপার্জিত আয়কে।

Gross primary deficit (মোট প্রাথমিক ঘাটতি) ফিসক্যাল ঘাটতি থেকে সুদ বাবদ দেনার বিয়োগ।

High powered money (উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অর্থ) আর্থিক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অর্থনীতিতে প্রবিষ্ট অর্থ। এটা মূলত টাকাকড়ি নিয়ে গঠিত।

Households (পরিবার) ব্যক্তি বা পরিবার সমূহ উৎপাদনের উপকরণের যোগান দেয় এবং ফার্মে উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা ক্রয় করে।

Imports (আমদানি) নিজ দেশ দ্বারা অবশিষ্ট বিশ্বের দেশগুলো থেকে দ্রব্য ও সেবার ক্রয়।

Income method of calculating national income (জাতীয় আয় পরিমাপে আয় পদ্ধতি) একটি অর্থনীতির একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জাতীয় আয় পরিমাপের একটি পদ্ধতি। এক্ষেত্রে চূড়ান্ত উপকরণে প্রদেয় মূল্যের (= আয়) সমষ্টি হিসেব করা হয়।

Interest (সুদ) মূলধন ব্যবহারের প্রতিদান হিসেবে উপার্জনের যে অংশ দিতে হয়।

Intermediate goods (অন্তর্বর্তী দ্রব্য) দ্রব্যাদি যেগুলো অন্যান্য দ্রব্য উৎপাদনের প্রক্রিয়াতে ব্যবহৃত হয়।

Inventories (মজুতভাণ্ডার / ইনভেনটরি) অবিক্রিত দ্রব্যসমূহ, অব্যবহৃত কাঁচামাল সমূহ অথবা অর্ধ-সম্পূর্ণ দ্রব্যাদি যা ফার্ম এক বছর থেকে পরবর্তী বছরে বহন করে নিয়ে যায়।

John Maynard Keynes (1883 – 1946) (জন মেনার্ড কেইন্স) পৃথকশাস্ত্র হিসাবে সামষ্টিক অর্থনীতির স্থপতি।

Labour (শ্রম) উৎপাদনে ব্যবহৃত মানুষের কায়িক প্রচেষ্টা।

Land (জমি/ভূমি) উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ।

Legal tender (আইন গ্রাহ্য মুদ্রা / বিহিত মুদ্রা) আর্থিক কর্তৃপক্ষ বা সরকার দ্বারা চালু মুদ্রা, যেটা গ্রহণ করতে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

Lender of last resort (ঋণের সর্বশেষ আশ্রয়দাতা) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর সম্পদের টানাটানির সময় তাদের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে একটি দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ। এটি আর্থিক কর্তৃপক্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

Liquidity trap (তারল্য ফাঁদ/নগদ স্পৃহার ফাঁদ) অর্থনীতির খুব নিম্ন সুদের হারের একটি অবস্থা যেখানে প্রতিটি অর্থনৈতিক এজেন্ট প্রত্যাশা করে যে, ভবিষ্যতে সুদের হার বাড়বে এবং সাথে সাথে বণ্ডের দাম পড়বে এবং এই পতনের ফলে মূলধনী ক্ষতি হবে। এই অবস্থায় প্রত্যেকে তার সম্পদকে অর্থরূপে ধরে রাখতে চায় এবং এই সময় অর্থের ফাটকা চাহিদা অসীম হয়।

Macroeconomic model (সামষ্টিক অর্থনৈতিক মডেল) সমষ্টিগত অর্থব্যবস্থার কার্যকলাপকে বিশ্লেষণাত্মক যুক্তির সাহায্যে, গাণিতিক পদ্ধতিতে, লেখচিত্রের মাধ্যমে সরলরূপে উপস্থাপন।

Managed floating (নমনীয় বা ভাসমান বিনিময় ব্যবস্থা) এইটি একটি পদ্ধতি যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাজারের শক্তির দ্বারা মুদ্রা বিনিময় হার নির্ধারণকে অনুমোদন করে। কিন্তু বিনিময় হারকে প্রভাবিত করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হস্তক্ষেপ করে।

Marginal propensity to consume (প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা) অতিরিক্ত ভোগ ও অতিরিক্ত আয়ের অনুপাত।

Medium of exchange (বিনিময়ের মাধ্যম) দ্রব্য বিনিময়কে সহজতর করার জন্য অর্থের প্রধান কাজ।

Money multiplier (অর্থ গুণক) কোনো অর্থব্যবস্থায় মোট অর্থের যোগান ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অর্থের মজুতের অনুপাত।

Narrow money (সংকীর্ণ অর্থ) কাগজিমুদ্রা, ধাতব মুদ্রা ও চাহিদা আমানত যা জনসাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোতে রাখে।

National disposable income (জাতীয় ব্যয়যোগ্য আয়) বাজার দামে নিট জাতীয় উৎপাদন + চলতি বা বর্তমান সময়ে বহির্বিশ্ব থেকে প্রাপ্ত হস্তান্তর।

Net Domestic Product (NDP) (নিট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন) কোনো দেশের ভূখণ্ডের মধ্যে উৎপাদিত সমস্ত দ্রব্য ও সেবার মোট মূল্য। এখানে মূলধনী স্টকের অবচয় অন্তর্ভুক্ত হয় না।

Net interest payments made by households (পরিবার কর্তৃক নিট সুদ প্রদান) পরিবারগুলোর ফার্মকে প্রদেয় নিট সুদ - সুদ বাবদ অর্থ বা পরিবারগুলোর কাছে আসে।

Net investment (নিট বিনিয়োগ) মূলধনী স্টকের বা মজুতের সংযুক্তি : এটি মোট বিনিয়োগের মতো নয়। যা মূলধনী স্টকের ক্ষয়ক্ষতির পুনস্থাপনজনিত বিনিয়োগকে অন্তর্ভুক্ত করে না।

Net National Product (NNP) (at market price) (বাজার দামে নিট জাতীয় উৎপাদন) মোট জাতীয় উৎপাদন — অবচয়।

NNP (at factor cost) or National Income (NI) (উপকরণ ব্যয়ে এন এন পি বা জাতীয় আয়) বাজার দামে নিট জাতীয় উৎপাদন - (পরোক্ষ কর - ভর্তুকি)

Nominal exchange rate (আর্থিক বিনিময় হার) এক একক বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ে যত সংখ্যক দেশীয় মুদ্রার একক কেউ পরিত্যাগ করে : দেশীয় মুদ্রার সাপেক্ষে বৈদেশিক মুদ্রার দাম।

Nominal (GDP) (আর্থিক জিডিপি) চলতি বাজার দামে জিডিপি নিরূপণ করা।

Non-tax payments (কর বহির্ভূত অর্থ প্রদান) পরিবারগুলো ফার্ম অথবা সরকারকে অ-কর বাধ্যবাধকতায় যে অর্থ প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ জরিমানা।

Open market operation (খোলা বাজারী কার্যকলাপ) বণ্ডের বাজারে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা সরকারি বণ্ডের কেনাবেচা। এই কেনাবেচার মাধ্যমে অর্থের যোগান বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়।

Paradox of thrift (মিতব্যয়িতার আপাত বিরোধিতা) জনসাধারণ যদি সঞ্চয়ের মাত্রা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বেশি মিতব্যয়ী হয় তাহলে অবশেষে সমষ্টিগত সঞ্চয়ের পরিমাণ কমবে বা একই থাকবে।

Parametric shift (স্থিতিমাপ/পরামিতিক স্থানান্তর) স্থিতিমাপ-এর মানের পরিবর্তনের ফলে সংগঠিত লেখচিত্রের স্থানান্তর।

Personal Disposable Income (PDI) (ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয়) ব্যক্তিগত আয় — ব্যক্তিগত কর প্রদান — অ-কর প্রদান।

Personal Income (PI) (ব্যক্তিগত আয়) জাতীয় আয় — অবণ্টিত মুনাফা — পরিবারের নিট সুদ প্রদান — কর্পোরেট কর + সরকার ও ফার্ম হতে পরিবারে প্রাপ্ত হস্তান্তর পাওনা।

Personal tax payments (ব্যক্তিগত কর প্রদান) করসমূহ যেগুলো ব্যক্তির উপর চাপানো হয়, যেমন আয়কর।

Planned change in inventories (পরিকল্পিত মজুতের পরিবর্তন) মজুত ভাণ্ডারের পরিবর্তন যা পরিকল্পিত উপায়ে ঘটে।

Present value (of a bond) (বণ্ডের বর্তমান মূল্য) সেই পরিমাণ অর্থ যা বণ্ডের প্রতিশ্রুতি মতো মেয়াদপূর্তির সময় সৃষ্ট আয়ের সমান হবে, যদি এই অর্থকে একটি সুদ উপার্জনকারী প্রকল্পে রাখা হয়।

Private income (বেসরকারী আয়) প্রাইভেট সেক্টরে নিট অন্তঃদেশীয় উৎপাদনের ফ্যাক্টর আয় + জাতীয় ঋণের সুদ + বিদেশ থেকে প্রাপ্ত নিট ফ্যাক্টর আয় + চলতি সরকারি হস্তান্তর + অবশিষ্ট বিশ্বের দেশগুলোর অন্যান্য নিট হস্তান্তর।

Product method of calculating national income (জাতীয় আয় পরিমাপে উৎপাদন পদ্ধতি) একটি নির্দিষ্ট সময়কালে অর্থনীতিতে উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্যের সমষ্টির হিসেব কষার পদ্ধতি।

Profit (মুনাফা) উদ্যোগীরা পরিষেবা প্রদানের বিনিময়ে যা উপার্জন করে।

Public good (সরকারি দ্রব্য) সম্মিলিতভাবে ভোগ করা হয় এমন দ্রব্য ও সেবা। কোনো ব্যক্তিকেই এর সুফল ভোগ করা থেকে বিরত করা যায় না।

Purchasing power parity (ক্রয় ক্ষমতার সমতা) এটি আন্তর্জাতিক বিনিময়ের একটি তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে বিভিন্ন দেশে অনুরূপ দ্রব্যসামগ্রীর দাম এক হয়।

Real exchange rate (প্রকৃত বিনিময় হার) দেশীয় দ্রব্যের তুলনায় বৈদেশিক দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম।

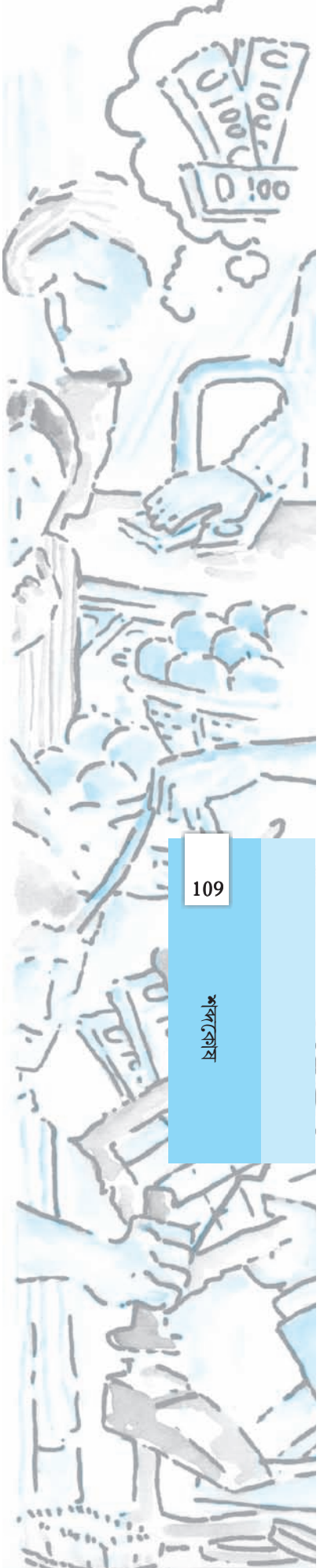

Real GDP (প্রকৃত জিডিপি) স্থির দামের সেটের ভিত্তিতে নিরূপণকৃত প্রকৃত জিডিপি।

Rent (খাজনা) জমি (প্রাকৃতিক সম্পদ) ব্যবহারের বিনিময়ে প্রদেয় অর্থ।

Reserve deposit ratio (সংরক্ষিত জমা অনুপাত) মোট আমানতের যে অংশটুকু বাণিজ্যিক ব্যাংক মজুত রাখে।

Revaluation (পুনর্মূল্যায়ণ) আবদ্ধ মুদ্রা বিনিময় হার ব্যবস্থায় বিনিময় হার হ্রাস পেলে তা বৈদেশিক মুদ্রাকে দেশীয় মুদ্রার সাপেক্ষে সস্তা করে।

Revenue deficit (রাজস্ব ঘাটতি) রাজস্ব আয়কে ছাপিয়ে যায় রাজস্ব ব্যয়।

Ricardian equivalence (রিকার্ডোর সমতুল্যতা) এই তত্ত্ব অনুসারে ভোক্তারা ভবিষ্যত দ্রষ্টা এবং তারা পূর্বানুমান করতে পারে যে, বাড়তি ঋণ গ্রহণের জন্য ভবিষ্যতে সুদের দেয় অর্থ সংগ্রহ করতে সরকার তাদের উপর নতুন করের বোঝা আরোপ করবে এবং ভোগকে সেইভাবে মানিয়ে নিতে হবে যাতে অর্থনীতিতে এখন কর বৃদ্ধি ঘটালেও সম প্রভাব পড়বে।

Speculative demand (ফাটকা চাহিদা) সম্পদের ভাণ্ডার হিসাবে অর্থের চাহিদা।

Statutory Liquidity Ratio (SLR) (বিধিবদ্ধ তারল্য অনুপাত) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মোট আমানত এবং মেয়াদি আমানতের একটি ভগ্নাংশ তরল সম্পদরূপে বিনিয়োগ করে।

Sterilisation (নিষ্ক্রিয়ন) একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক লেনদেনের হিসেবে উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি দেখা দিলে স্বদেশীয় মুদ্রা সরবরাহের উপর তার যেন কোনো প্রভাব না পড়ে তার জন্য অর্থের বাজারে হস্তক্ষেপ করে।

Stocks (মজুত) একটি নির্দিষ্ট সময়ে সেই সমস্ত চিহ্নিত করা চলক সমূহ।

Store of value (মূল্যাধার বা মূল্যের ভাণ্ডার) সম্পদকে অর্থরূপে সঞ্চিত রাখা হয় ভবিষ্যত ব্যবহারের জন্য। অর্থের এই কাজকে মূল্যের ভাণ্ডার হিসেবে অভিহিত করা হয়।

Transaction demand (লেনদেন চাহিদা) লেনদেন কার্যকলাপের জন্য অর্থের চাহিদা।

Transfer payments to households from the government and firms (সরকার এবং উৎপাদন প্রতিষ্ঠান থেকে পরিবারে হস্তান্তর পাওনা) হস্তান্তর প্রদান হল সেই সকল প্রদানসমূহ যেগুলো সেবার প্রতিদান ব্যতীতই প্রাপক গ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ, উপহার ছাত্র-বৃত্তি, পেনশন ইত্যাদি।

Undistributed profits (অবণ্টিত মুনাফা) সরকারি এবং বেসরকারি মালিকাধীন ফার্মের মুনাফার সেই অংশ যা উৎপাদনের উপকরণগুলোর মধ্যে বণ্টন করা হয় না।

Unemployment rate (বেকারত্বের হার) যে মানুষেরা কাজ পায় না (যদিও তারা কাজ খোঁজে চলছে) তার সাথে মোট জনসংখ্যার সেই অংশ যারা কাজ চাইছে, তার অনুপাত।

Unit of account (হিসাবের মানদণ্ড) বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যের পরিমাপ করতে এবং তুলনা করতে মাপদণ্ড হিসাবে অর্থ কাজ করে।

Unplanned change in inventories (মজুতের অপরিকল্পিত পরিবর্তন) অপ্রত্যাশিতভাবে ইনভেনটরি স্টকের পরিবর্তন ঘটা।

Value added (মূল্য সংযোজন) উৎপাদন প্রক্রিয়াতে ফার্মের নিট অবদান সৃষ্টি। একে উৎপাদনের মূল্য হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় — মধ্যবর্তী দ্রব্য যেগুলো ব্যবহৃত হয় তার মূল্য।

Wage (মজুরি) শ্রমিক তার শ্রমের বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক পায়।

Wholesale Price Index (WPI) (পাইকারি দাম সূচক) ভারযুক্ত গড় দামস্তরের শতকরা পরিবর্তন। এই হিসেব করার সময় আমরা একগুচ্ছ দ্রব্যের দামকে নিই যেগুলো বিশাল পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয় হয়।

NOTE

NOTE

সমীকরণ (6.10) -এর দ্বিতীয় অংশ দেখায় যে, মুক্ত অর্থনীতির স্বয়ম্ভূত ব্যয়ের ক্ষেত্রে বন্ধ অর্থনীতির উপাদানগুলোর সাথে বাড়তিরূপে অন্তর্ভুক্ত হয় রপ্তানির স্তর ও আমদানির স্বয়ম্ভূত উপাদান। এভাবে রপ্তানি স্তরের পরিবর্তনগুলো আকস্মিক বাড়তি আঘাতরূপে কাজ করে যা ভারসাম্য আয়ে পরিবর্তন ঘটায়। সমীকরণ (6.10) হতে আমরা $\bar{X}$ এবং $\bar{M}$ -এ পরিবর্তনের গুণকীয় প্রভাবকে গণনা করতে পারি।

$$\frac{\Delta Y^*}{\Delta \bar{X}} = \frac{1}{1-c+m} \qquad (6.13)$$

$$\frac{\Delta Y^*}{\Delta \bar{M}} = \frac{-1}{1-c+m} \qquad (6.14)$$

আমাদের দেশের রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে দেশে তৈরি উৎপাদনের সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং চাহিদার বৃদ্ধি হবে অনেকটা সরকারি ব্যয়ের বৃদ্ধির অনুরূপ অথবা বিনিয়োগের স্বয়ম্ভূত বৃদ্ধির ন্যায়। বিপরীতে, আমদানি চাহিদার স্বয়ম্ভূত বৃদ্ধির ফলে দেশীয় উৎপাদনের চাহিদা কমবে এবং এর ফলে ভারসাম্য আয় হ্রাস পাবে।